প্রাচ্যবাণীমন্দির

সার্ব্বজনীন গ্রন্থমালা

চতুর্থ পুষ্প

বেদান্ত ও সুফী দর্শন

ডক্টর রমা চৌধুরী, এম-এ, ডি-ফিল্ (অক্সন্)

অধ্যাপিকা, লেডী ব্রেবোর্ণ কলেজ ও

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

মূল্য—দুই টাকা

কলিকাতা, ১৯৪৪

ভূমিকা

ইস্‌লামীয় দর্শনভুক্ত স্ফীমতবাদ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মতবাদ। অন্যান্য মতবাদের ন্যায় স্ফী মতবাদেরও দুইটী দিক—দর্শন ও মরমিয়াবাদ। দর্শনে ঈশ্বরের স্বরূপ, সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও প্রক্রিয়া, মুক্তির স্বরূপ প্রভৃতি তত্ত্বালোচনা আছে। মরমিয়াবাদে ঈশ্বরের সহিত একত্বোপলব্ধির স্বরূপ ও উপায় আলোচিত হইয়াছে। বর্ত্তমান গ্রন্থে স্ফীমতবাদের দর্শনের দিকই প্রধানতঃ আলোচিত হইয়াছে এবং বেদান্তদর্শনের সহিত স্ফীদর্শনের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থে ব্যবহৃত দার্শনিক নাম ও শব্দের বাংলা পরিভাষা গ্রন্থশেষে সংযোজিত করা হইল।

বর্ত্তমান্ যুদ্ধের পরিস্থিতিতে মুদ্রাযন্ত্রের বহুল অসুবিধা নিবন্ধন এ গ্রন্থের প্রকাশে সাতিশয় বিলম্ব ঘটিল। এই গ্রন্থ দ্বারা প্রাচ্য বাণীমন্দিরের সার্ব্বজনীন গ্রন্থমালার উদ্দেশ্য কিঞ্চিৎ পরিমাণে সাধিত হইলেও আমার সমস্ত শ্রম সার্থক হইবে।

প্রাচ্যবাণীমন্দির

ডিসেম্বর, ১৯৪৪

রমা চৌধুরী

সূচীপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রথম পরিচ্ছেদ

"সূফী" শব্দের অর্থ

"সূফী" শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। অধিকাংশ সূফীর মতে, "সূফী" শব্দটী আরবী শব্দ **"সফা"** হইতে উৎপন্ন। "সফা" শব্দের অর্থ "পবিত্রতা"। অতএব যিনি কায়মনোবাক্যে পবিত্র, তিনিই একমাত্র "সূফী" নাম বাচ্য। মতভেদে, **"সফা"** শব্দের অর্থ "অকপটতা", এবং যিনি অকপট ভাবে ঈশ্বর-বিশ্বাসী, তিনিই "সূফী"। কেহ কেহ ইহাও বলেন যে, ঈদৃশ "অকপটতা" মানব ও ঈশ্বর উভয়ের দিক হইতেই গ্রহণীয়। অর্থাৎ, যিনি স্বয়ং অকপট ভাবে ঈশ্বর-বিশ্বাসী, এবং যাহার প্রতি ঈশ্বরও অকপট ভাবে স্নেহশীল, তিনিই "সূফী"। পুনরায় কাহারও কাহারও মতে, **"সফ্"** শব্দ হইতেই "সূফী" শব্দের উৎপত্তি। **"সফ্"** শব্দের অর্থ "প্রথম শ্রেণী"। এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে, "সূফী"গণ ঈশ্বরের সম্মুখে প্রথম শ্রেণীতে দণ্ডায়মান আছেন, অর্থাৎ, তাঁহারা ঈশ্বরের বিশেষ প্রিয়পাত্র। অন্যমতে, "সূফী" শব্দটী **"সূফ্ফা"** শব্দ হইতে জাত। **"সূফ্ফা"** শব্দের অর্থ "কাষ্ঠাসন" (বেঞ্চ্)। হজরত মহম্মদের সহচরগণকে সাধারণতঃ "কাষ্ঠাসনাশ্রয়ী সাধু" (People of the Bench) নামে অভিহিত করা হইত, কারণ তাঁহারা মসজিদের প্রাঙ্গণে কাষ্ঠাসনে বসিয়া অধিকাংশ সময় ক্ষেপণ করিতেন। সূফীগণও মহম্মদের সহচরগণের ন্যায় ঈশ্বরভক্ত ও পবিত্রচেতা বলিয়া, তাঁহারাও ঐ নামে পরিচিত ছিলেন।

যাহা হউক, অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে, **"সূফ্"** শব্দ হইতেই প্রকৃতপক্ষে "সূফী" শব্দটীর উৎপত্তি হইয়াছে। "সূফ্" শব্দের অর্থ "পশম"। এই মতানুসারে, যিনি কর্কশ পশমের পরিচ্ছেদ পরিধান করেন তিনিই "সূফী"।

সূফীগণ স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য ও সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিতেন, এবং সকল প্রকার ভোগবিলাস বর্জ্জন করিয়া অতি অল্প মূল্যের কর্কশ পশমবস্ত্র পরিধান করিতেন। সেই জন্যই তাঁহাদিগকে "সূফী" অথবা "পশমবস্ত্রধারী" বলা হইত। ইহা সত্ত্বেও, পবিত্রতাবাচক "সফা" শব্দ হইতেই "সূফী" শব্দের উৎপত্তি—এইরূপ একটী যে সাধারণ ধারণা আছে, তাহার কারণ এই যে, সূফীগণ বাহ্যিক আচারানুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপ অপেক্ষা আন্তরিক পবিত্রতা ও অকপটতাকেই সমধিক প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন। বিখ্যাত সূফীগুরু বাগদাদ নিবাসী জুনাইদ্ বলিয়াছেন যে, পবিত্রতাই সূফীধর্ম্মের মূলভিত্তি,—যিনি সংসার ক্লেদ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত, তিনিই একমাত্র পবিত্রচেতা, তিনিই প্রকৃত সূফী। অতএব, আচারানুষ্ঠানের দিক হইতে সূফী মতবাদ সন্ন্যাসব্রত বিশেষ (Asceticism)। মানব মনের-বাসনাকামনার সম্পূর্ণ ধ্বংস, এবং জাগতিক সকল সুখের প্রতি বৈরাগ্য সৃষ্টিই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। আবুল হাসান নূরী বলিয়াছেন যে, সূফীগণ কেবল নির্ধন নহেন, তাঁহারা নিষ্কামও। তাঁহারা স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যব্রত বরণ করেন, এবং ঈশ্বর ব্যতীত তাঁহাদের অপর কোনও দ্রব্যে আসক্তি নাই।)

ধর্ম্মের দিক হইতে সূফী মতবাদ ঈশ্বরের সহিত পরিপূর্ণ, বাধাহীন মিলন মানবজীবনের একমাত্র কাম্য ও সার্থকতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। এই মিলন বুদ্ধিপ্রসূত নহে, সম্পূর্ণরূপে আবেগ সম্ভূত। প্রেমই মানব ও ঈশ্বরের মিলনসেতু, বিচারবুদ্ধি অথবা সাধারণ প্রমাণমূলক (প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি) জ্ঞান নহে। তজ্জন্য সূফীমতকে ইস্লামীয় অতীন্দ্রিয়বাদ বা মরমিয়াবাদ (Islamic Mysticism) বলা হয়।) বিখ্যাত সূফী আবুল হাসান নূরী জগতের প্রতি ঘৃণা ও ঈশ্বরের প্রতি প্রীতিকে সূফীধর্ম্মের মূলভিত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (জুনাইদ্ বলিয়াছেন, মানবের ক্ষুদ্র 'আমিত্বের' বিনাশ ও ঈশ্বরে পুনর্জীবন লাভই সূফীধর্ম্মের সারকথা।)

বিভিন্ন সূফীগণ সূফীধর্ম্মের বিভিন্ন বিবরণী ও সংজ্ঞা দিয়াছেন। তন্মধ্যে মারূফ্ আল্ কারখী দত্ত বাখ্যাই প্রাপ্ত বিবরণীর মধ্যে প্রাচীনতম। তাঁহার মতে সূফীমতবাদ "পারমার্থিক তত্ত্ববিষয়ক উপলব্ধি ও জাগতিক বস্তু বিষয়ক বৈরাগ্য" ভিন্ন অপর কিছুই নহে। সূফীগণকে "তত্ত্বানুগামী" অথবা "ঈশ্বরানুগামী" (আহল্ আল্ হাক্) বলিয়াও অভিহিত করা হয়। তাঁহাদের সমগ্র সত্তা ভগবদারাধনাতেই নিমগ্ন থাকে, অন্য কোনও বস্তু বা তত্ত্বে তাঁহাদের স্পৃহা ও প্রয়োজন নাই।

(সূফীদের বিশ্বাস যে তাঁহারা ঈশ্বরের বিশেষ প্রিয়পাত্র, এবং জগতে তাঁহারাই ঈশ্বরের দূত ও প্রচারক।) ইউসুফ্ ইব্‌ন্ হুসাইন্ বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক সমাজে একদল সাধু থাকেন যাঁহাদের স্বয়ং ভগবান্ স্বীয় দূতরূপে বরণ করেন, এবং যাঁহাদের সহায়তাতেই তিনি স্বীয় বাণী মানবসমাজে প্রচার করেন; ইস্‌লাম সম্প্রদায়ে সূফীগণই ঈদৃশ নির্ব্বাচিত ঈশ্বরপ্রেরিত ধর্ম্মপ্রচারক।] বহু সূফীর বিশ্বাস যে, মহম্মদ ঈশ্বরের নিকট হইতে দুই প্রকারের বাণী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—প্রথমটী কোরাণে এবং দ্বিতীয়টী মহম্মদের হৃদয়ে লিখিত আছে। প্রথমটীকে মহম্মদের 'গ্রন্থনিহিত জ্ঞান' (ইলম্ ই সফিনা) ও দ্বিতীয়টীকে তাঁহার 'হৃদয়নিহিত জ্ঞান' (ইলম্ ই সীনা) বলিয়া অভিহিত করা হয়। প্রথমটী সর্ব্বসাধারণের ও দ্বিতীয়টী নির্ব্বাচিত কয়েকজনের জন্য মাত্র। সূফীদের মতে, তাঁহারাই ঈদৃশ নির্ব্বাচিত সম্প্রদায় এবং (তাঁহারাই একমাত্র মহম্মদের প্রকৃত শিষ্য ও অনুগামী।) সনাতনপন্থী ইস্‌লামধর্ম্মিগণ অবশ্য উক্ত দুইপ্রকার বাণীর সত্যতা স্বীকার করেন না; তাঁহাদের মতে, মহম্মদ ভগবানের নিকট হইতে যে বাণী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা একমাত্র কোরাণেই লিপিবদ্ধ আছে, সূফীগণ অপর কোনও বিশেষ বাণী প্রাপ্ত হন্ নাই। যাহা হউক অন্যান্য ইস্‌লাম সম্প্রদায়ের ন্যায়, সূফী সম্প্রদায়ও মহম্মদের উপদেশাবলী হইতেই উদ্ভূত বলিয়া সূফীগণের বিশ্বাস, যদিও সনাতনপন্থী ইস্‌লাম সম্প্রদায়

সূফীমতকে ইস্‌লাম মতানুযায়ীরূপে গ্রহণ করেন নাই। প্রাচীন সূফীমতবাদ অপেক্ষা তৎপরবর্ত্তী মতবাদই প্রাচীনপন্থী ইস্‌লামের নিকট অধিকতর আপত্তিজনক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। বহু বিখ্যাত সূফীগণও তাঁহাদের মতবাদ যে কোরাণের মতবাদের বিরোধী নহে, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ প্রচেষ্টা করিয়াছেন।

সূফী সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

(১) পূর্ব যুগ

(প্রথম হিজিরাব্দের শেষার্দ্ধ ও দ্বিতীয় হিজিরাব্দে (১) সূফী মতবাদের প্রথম উদ্ভব দৃষ্ট হয়। প্রসিদ্ধ সূফী জামীর মতে, কুফানিবাসী আরব আবূ হাসিমকেই সর্ব্বপ্রথম "সূফী" নামে অভিহিত করা হয়।) ইনি প্যালেষ্টাইনে রমলা নামক স্থানে সূফীগণের জন্য একটী মঠ নির্ম্মাণ করেন, এবং অষ্টম খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে প্রাণত্যাগ করেন। দ্বিতীয় হিজিরাব্দ অথবা ৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই "সূফী" নামটী সমাজে প্রচলিত হইয়া যায়।] প্রাচীন সূফীমত দর্শনমূলক নহে, অর্থাৎ, ইহাতে ঈশ্বর, আত্মা, মুক্তির স্বরূপ প্রভৃতি দার্শনিক বিচার নাই। ইহাতে মরমিয়াবাদের মূল কথা, অর্থাৎ ঈশ্বর ও মানবের অদ্ভুত উন্মাদনাময় মিলনের বিষয়েও আলোচনা নাই। ইহাতে দর্শন ও মরমিয়াবাদের (Mysticism) পরিবর্ত্তে, নীতিতত্ত্ব (Ethics) আলোচনাই দৃষ্ট হয়। জুনাইদ বলিয়াছেন যে, উপবাস, সংসারত্যাগ, আত্মীয়-বন্ধু পরিত্যাগ ও সাংসারিক দ্রব্যে নির্লোভতা হইতেই সূফীমতের উৎপত্তি; তর্ক ও বিচার হইতে নহে। ইহা হইতেই প্রতিভাত হইবে যে, [প্রাচীন সূফীগণ সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্বে কালক্ষেপণ না করিয়া নীতিশাস্ত্রানুমোদিত কর্ম্মে রত হইতেন—চিন্তা অপেক্ষা কার্য্যই তাঁহাদের নিকট অধিক গুরুত্ব-সম্পন্ন ছিল।)

(১) ৬২২ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদের মক্কা হইতে মদিনা গমনের সময় হইতে মুসলমানগণ 'হিজিরা' বৎসর গণনা করে। প্রথম-দ্বিতীয় হিজিরাশতাব্দী খ্রীষ্টীয়াব্দ ৭১৮-৮১৫।

সন্ন্যাসবাদ (Asceticism) এবং নিষ্ক্রিয়াবাদ (Quietism) প্রাচীন সূফীমতের প্রধান বৈশিষ্ট্যদ্বয়। প্রাচীনপন্থী ইসলাম সম্প্রদায় সন্ন্যাস গ্রহণের বিরোধী ছিলেন, কারণ কোরাণে ইহার নিষেধ আছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও সেই সময়ে ইস্‌লাম সম্প্রদায়ে একদল সন্ন্যাসমার্গাবলম্বী সাধুর আবির্ভাব হয়। ইঁহাদের মধ্যে বসরানিবাসী হাসান প্রসিদ্ধতম। ইঁহার ৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু হয়। প্রাচীন সূফীগণ এই সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সহিত নিবিষ্টভাবে বিজড়িত ছিলেন, এবং হাসানকে স্বীয় সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া দাবীও করিতেন। কোরাণে পাপ, মৃত্যুর পরে পাপের বিচার, পাপের অবশ্যম্ভাবী ফল নরক, প্রভৃতি বিষয়ে যে উপদেশ আছে, সেই সকল বিষয়েই কেবল উক্ত সন্ন্যাসিগণ জোর দিতেন, এবং ফলে ঈশ্বরের ভীষণতা সম্বন্ধেই কেবল তাঁহারা আলোচনা করিতেন। তাঁহাদের নিকট ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্, কঠোর বিচারকর্ত্তা ও নির্দ্দয় দণ্ডবিধায়করূপেই কেবল প্রতিভাত হইতেন—তিনি যে সর্ব্বকরুণাময় এবং সকল কোমলতা ও মাধুর্য্যেরও আধার, সে কথা ইঁহারা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। ফলে, তাঁহারা পাপের অনিবার্য্য ফল নরকযন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন, এবং তজ্জন্য সর্ব্বপ্রকার পার্থিব ভোগ পরিত্যাগ করিয়া, সর্ব্বত্যাগী উদাসীনের ন্যায় জীবনযাপন করিতেন। তাঁহারা বিবাহ বিমুখ ছিলেন, এবং সংসারত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য বরণ করিতেন। এই সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের ন্যায় প্রাচীন সূফীগণও সংসারত্যাগী ও ভোগ-সুখ-বিমুখ ছিলেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও, সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সহিত সূফীগণের প্রভেদও অল্প ছিল না। সূফীগণ কেবল সন্ন্যাসব্রতাবলম্বীই ছিলেন না, তাঁহাদের অপরাপর বৈশিষ্ট্যও বহু ছিল, যাহা সাধারণ সন্ন্যাসিগণের মধ্যে দৃষ্ট হইত না। প্রথমতঃ, সন্ন্যাসিগণ সন্ন্যাস ও দারিদ্র্যব্রতকে স্বার্থসিদ্ধির উপায়রূপেই পরিগণনা করিতেন। মৃত্যুর পরে, স্বর্গসুখ লাভের আশাতেই তাঁহারা পার্থিবসুখ পরিত্যাগ করিতেন, অপর কোনও উচ্চ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নহে। অতএব পারলৌকিক সুখই তাঁহাদের একমাত্র কাম্য ছিল।

কিন্তু সূফীগণের নিকট সন্ন্যাস ও দারিদ্র্য পারলৌকিক সুখলাভের উপায়-রূপে কদাপি পরিগণিত হইত না। সুখ তাঁহাদের নিকট তুচ্ছাতিতুচ্ছ ছিল, ঈশ্বরের সহিত সম্মেলনই ছিল তাঁহাদের একমাত্র কাম্যবস্তু। তাঁহারা মনে করিতেন যে, সংসারবিমুখতাই ঈশ্বরলাভের একমাত্র উপায়, এবং তজ্জন্যই তাঁহারা সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিতেন, পারলৌকিক সুখের জন্য নহে। কোনও কোনও পরবর্ত্তী সূফী ইহাও মনে করিতেন যে, যতদিন ঈশ্বরলাভ না হয়, ততদিনই কেবল সন্ন্যাসব্রতের প্রয়োজন, তাহার পরে নহে। আবু সাইদ্ আবী আল্ খয়্র্ নামক প্রসিদ্ধ সূফী প্রচারক ধর্ম্মমার্গের উচ্চস্তরে উন্নীত হইবার পরে সন্ন্যাসব্রত পরিত্যাগ করেন। তাঁহার মতে, ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভেই কেবল নানাবিধ কঠোর নিয়ম, শৃঙ্খলার প্রয়োজন, পরে নহে। দ্বিতীয়তঃ, সূফীগণ সর্ব্বদাই ব্যাহ্যিক অনুষ্ঠান অপেক্ষা আন্তরিক উদ্দেশ্য ও ইচ্ছার উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করিতেন। তাঁহাদের মতে বাহ্যিক ধন ও দ্রব্যাদির অভাবই দারিদ্র্য নহে, আন্তরিক ধনকামনার অভাব ও নির্লোভতাই প্রকৃত দারিদ্র্য। তিনিই প্রকৃত দরিদ্র যাঁহার ধনও নাই, ধনকামনাও নাই; তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী যিনি সংসারবন্ধন এবং তৎসঙ্গে ভোগবাসনারূপ শৃঙ্খলও ছিন্ন করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ, সূফীগণ কেবল অনুষ্ঠানী সন্ন্যাসীই ছিলেন না, মরমী ভক্তও ছিলেন। ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও প্রেমই ছিল তাঁহাদের সাধনার প্রাণ। প্রাচীন সূফীগণের 'নিষ্ক্রিয়াবাদ'ও এই ভক্তিরই ফল। প্রগাঢ় ঈশ্বরভক্তি ও অনবরত ঈশ্বরধ্যান, এবং তৎসঙ্গে তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও তাঁহার ইচ্ছার নিকট স্বীয় স্বতন্ত্র ইচ্ছার সম্পূর্ণ পরিবর্জনই 'নিষ্ক্রিয়াবাদে'র মূল কথা। ভক্ত সূফীগণ সাংসারিক সকল কর্ম্মে বিমুখ হইয়া ভগবদারাধনাতেই সর্ব্বদা নিমগ্ন থাকিতেন। ভগবানের প্রত্যক্ষ দর্শন ও তাঁহার সহিত মিলনই তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। এইরূপে সূফীগণ সন্ন্যাসী ও দারিদ্র্যব্রতাবলম্বী সাধুগণ হইতে পৃথক্ ছিলেন। সুরায়ার্দ্দী

বলিয়াছেন যে, "সূফীধর্ম্ম দারিদ্র্যও (ফাকর্) নহে, সন্ন্যাসও (জুহদ্) নহে, কিন্তু ইহা ব্যতীতও অপর আরও কিছু। এই সকল বিশেষ গুণ না থাকিলে, কেহ 'সন্ন্যাসী' (জাহিদ্) ও 'ফকির' হইলেও 'সূফী' পদবাচ্য হইতে পারে না।")

প্রাচীন সূফীগণ মতবাদ ও কার্য্যকলাপ উভয় দিক হইতেই সনাতন ইসলাম সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। মতবাদের দিক হইতে তাঁহারা কোরাণ ও সুন্নার (১) প্রামাণিকতা অকাট্য বলিয়া গ্রহণ করিতেন, যদিও তাঁহারা উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের উপদেশাবলীর অংশ বিশেষের প্রতি অপরাপর অংশ অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। আচারানুষ্ঠানের দিক হইতেও তাঁহারা ইস্‌লাম ধর্ম্মের অবশ্য করণীয় রীতিনীতি পালনে পরাঙ্মুখ হইতেন না।

(প্রাচীন সূফীগণের মধ্যে প্রসিদ্ধতম পাঁচজনের সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। ইঁহারা সকলেই দ্বিতীয় হিজিরাব্দের মধ্য ও অন্তভাগে (৭৬৭—৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ) মহাপ্রয়াণ করেন। যথা, **ইব্রাহিম বিন্ আদ্‌হাম্** (মৃত্যু ১৬২ হিজিরাব্দে), **আবু আলি সাকীক্**, **তায়ী নিবাসী দাউদ্** (১৬৫ হিজিরাব্দ), **ফুদায়ল্ লিয়াদ্** (মৃত্যু ১৮৮ হিজিরাব্দে), এবং **রাবীয়া** (৯৬—৯৯ হিজিরাব্দ অথবা ৭১৭—৮০১ খ্রীষ্টাব্দ))

(**ইব্রাহিম** বাল্‌খ্ রাজপরিবারভুক্ত ছিলেন।) পূর্ব্বজীবনে তিনি অত্যন্ত বিলাসী ও আরামপ্রিয় ছিলেন। একদা মৃগয়া কালে তিনি দৈববাণী শুনিতে পান, এবং তদনুসারে রাজ্য ও ধনৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করেন। ইব্রাহিম ষড়ঙ্গ ধর্ম্ম সাধনমার্গ প্রপঞ্চিত করেন; (তাঁহার মতে সুখ, সম্মান, আরাম, নিদ্রা, ধন ও জীবনের ইচ্ছা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যথাক্রমে দুঃখ, অপমান, যন্ত্রণা, নিদ্রাহীনতা, দারিদ্র্য ও মৃত্যু বরণ করিতে হইবে।)

---

(১) 'সুন্না' অথবা 'হাডিথ্' শব্দের অর্থ—মহম্মদ ও তাঁহার অনুচরগণের বাক্যাবলী, কার্য্যাবলী প্রভৃতির লিখিত বিবরণ।

(**সাকীক্**ও বাল্‌খ্‌ নিবাসী ছিলেন। তিনি চরম নিষ্ক্রিয়াবাদী ছিলেন। তাঁহার মতে, ঈশ্বরে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণই মানবের একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম, অপর কোনও কর্ত্তব্য তাহার নাই। প্রকৃত ভক্ত স্বীয় জীবিকা সংস্থানের জন্যও চেষ্টা করিবেন না।) তিনি বলিয়াছেন যে, মানবসঙ্গ পরিত্যাগ প্রকৃত ভক্তির দশ ভাগের নয় ভাগ; মৌনব্রত অবশিষ্ট এক ভাগ।

(**দাউদ্‌** কঠোর দারিদ্র্য বরণ করেন। প্রবাদ আছে যে, তাঁহার একটী মাদুর, ইঁট ও জলের বোতল ভিন্ন অপর কিছুই ছিল না।

(**ফুদায়িল্‌** দস্যুনেতা ছিলেন। ঘটনাচক্রে তিনি কোরাণ-পাঠ শ্রবণ করেন, এবং অনুতপ্ত হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।) তিনিও ইব্রাহিমের ন্যায় নিষ্ক্রিয়াবাদী ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে, মানবের অনুরোধে কার্য্যে প্রবৃত্ত না হওয়া ভণ্ডামি মাত্র, কিন্তু কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া পৌত্তলিকতারই ন্যায় ভয়াবহ ও অন্যায্য।)

(**রাবীয়া** আডি সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন বলিয়া তিনি রাবীয়া আডায়িয়া নামে সুপরিচিতা ছিলেন। তিনি বসরা দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম **বসরীও** ছিল) রাবীয়া অতি দরিদ্র বংশে জন্মগ্রহণ করেন, এবং অতি অল্প বয়সে মাতৃপিতৃহীন হন। তৎপরে এক ধনী ব্যক্তি তাঁহাকে ক্রীতদাসী রূপে ক্রয় করেন। কিন্তু কঠোর পরিশ্রমের মধ্যেও রাবীয়া উপবাস ও উপাসনা ত্যাগ করেন নাই। এক রাত্রিতে রাবীয়া যখন উপাসনায় মগ্ন ছিলেন, তাঁহার প্রভু রাবীয়ার মস্তকোপরি একটী উজ্জ্বল আলোক দেখিতে পাইলেন। তিনি ভীত হইয়া রাবীয়াকে মুক্তি প্রদান করেন। (রাবীয়ার মতেও ঈশ্বরে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীলতাই মানবের একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম) তিনি স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যব্রত বরণ করেন, এবং ভক্ত ও বন্ধুবান্ধবগণের নিকট হইতে আর্থিক সাহায্য গ্রহণে অস্বীকৃত হন। রাবীয়া উপাসনাকে স্বার্থ-সিদ্ধির উপায়রূপে পরিগণনা করিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছেন। (উপাসনা, ধ্যান, উপবাস, দারিদ্র্য, সন্ন্যাস প্রভৃতি ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ক্রিয়াকলাপ ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ মিলনের উপায় মাত্র, পারলৌকিক সুখের নহে।)

রাবীয়া বলিয়াছেন "হে প্রভু, যদি আমি নরকযন্ত্রণা হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই কেবল তোমার উপাসনা করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমাকে নরকেই দগ্ধ কর। যদি আমি স্বর্গসুখ লাভের আশাতেই কেবল তোমার উপাসনা করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমাকে স্বর্গ হইতে বঞ্চিত কর। কিন্তু আমি যদি তোমার জন্যই কেবল তোমার উপাসনা করি, তাহা হইলে আমার নিকট তোমার শাশ্বত সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য প্রকটিত কর।") রাবীয়ার মতবাদে প্রাচীন সূফীগণের সন্ন্যাসবাদ ও নিষ্ক্রিয়াবাদ ব্যতীত পরবর্ত্তী সূফীগণের দর্শন ও ভক্তিবাদও কিয়দংশে দৃষ্ট হয়। তাঁহার যে সকল প্রার্থনা বিভিন্ন সূফীগ্রন্থে লিখিত আছে, তাহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, (ঈশ্বর তাঁহার নিকট কেবল ভয়ের বস্তুই ছিলেন না, যেরূপ প্রাচীন সূফীগণ ও সন্ন্যাসী সম্প্রদায় মনে করিতেন। উপরন্তু, রাবীয়া ঈশ্বর ও মানবের সম্বন্ধকে প্রেম ও প্রীতিমূলক, সুমধুর, উন্মাদনাময় সম্বন্ধ বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। ঈদৃশ সুমধুর সম্বন্ধই মরমিয়াবাদের প্রথম কথা। এইরূপে, রাবীয়ার সময় হইতেই সূফী মতবাদের একটী নূতন যুগের সূচনা হয়।)

(২) উত্তর যুগ

(সূফী মতবাদের দ্বিতীয় যুগ দ্বিতীয় হিজিরাব্দের শেষার্দ্ধ (খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রথম চতুর্থাংশ) হইতে আরম্ভ হয়। এই যুগকে সূফীমতের "নবযুগ" বলিয়া অভিহিত করা হয়, কারণ এই যুগের "নব সূফীমত" প্রাচীন সূফীমত হইতে উদ্ভূত হয় নাই, অপরাপর ইস্‌লাম বহির্ভূত মতবাদ দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল।) ইয়োরোপীয় প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে[১] নব সূফী মতবাদ ভারতীয় দর্শন, বিশেষভাবে বৌদ্ধ ও বেদান্তদর্শন, খ্রীষ্টীয় মতবাদ, নিও-প্লেটোনিক দর্শন (প্লোটিনাস্ প্রভৃতির মতবাদ), নষ্টিক্ মতবাদ এবং পারসিক ভাবধারা দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। কোনও

(১) "Brown's Literary History of Persia" vol. I, P. 4 8.

কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে, নব সূফী মতবাদের উদ্ভব তৎকালীন ইস্‌লাম সমাজ ও ধর্ম্মের দোষ ও অসম্পূর্ণতা হইতেই। যথা, নিকলসনের মতে (১), উমাইয়াহ্‌ যুগের রাষ্ট্রীয় বিপ্লব ও বিশৃঙ্খলা, আব্বাসীয় যুগের সন্দেহবাদ (Scepticism) এবং বিশেষভাবে ইস্‌লাম ধর্ম্মের শুষ্ক ও শূন্যগর্ভ আচারানুষ্ঠানপ্রিয়তাই, নিষ্ক্রিয়াবাদ, ঈশ্বরবাদ (Theism) এবং আবেগপ্রধান ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতি বিরুদ্ধ মতবাদের সৃষ্টি করে। ইঁহাদের মতে, যদিও কোরাণে ঈশ্বরের দয়া, অনুগ্রহ প্রভৃতি বিষয়ে বর্ণনা আছে, তথাপি কোরাণোপদিষ্ট ধর্ম্ম প্রধানতঃ ভয়মূলক। অর্থাৎ ইহাতে ঈশ্বরকে প্রধানতঃ সর্ব্বশক্তিমান্‌ প্রভু ও কঠোর দণ্ডদাতারূপেই চিত্রিত করা হইয়াছে, এবং ঈশ্বর ও মানবের সম্পর্ককে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক রূপেই বর্ণনা করা হইয়াছে। ঈদৃশ ভয়জ প্রভু-দাসের সম্পর্কের প্রতিবাদ স্বরূপই সূফীগণ সুমধুর প্রেমজ প্রেমিক-প্রেমিকার সম্বন্ধের অবতারণা করেন। সনাতনপন্থী ইস্‌লামধর্ম্মিগণ অবশ্য পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের উপরি উক্ত মত স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে, নব সূফীধর্ম্ম সনাতন ইস্‌লাম ধর্ম্মের ত্রুটী ও অপূর্ণতা দূরীকরণের জন্যই যে উদ্ভূত হইয়াছিল, এই মত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। তাঁহারা বলেন যে, প্রাচীন সূফীমতই কেবল কোরাণানুমোদিত; কিন্তু নব সূফীমত ইস্‌লামবহির্ভূত মতবাদের সমষ্টিমাত্র এবং ইস্‌লামধর্ম্মানুমোদিত নহে। যাহা হউক, নব সূফীমতের উদ্ভবের কারণ সম্বন্ধে বাগ্‌বিতণ্ডা বর্ত্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্যবহির্ভূত। ইহার উদ্ভবের কারণ যাহাই হউক্‌ না কেন, ইহা সর্ব্বজন স্বীকৃত সত্য যে, ইস্‌লাম বহির্ভূত মতের দ্বারা পরবর্ত্তী সূফী মত বহুলাংশে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল।

পরবর্ত্তী সূফীমত ও প্রাচীন সূফীমতে পার্থক্য এই যে, প্রাচীন সূফীমত দর্শনমূলক নহে, কিন্তু নব সূফীমতে দর্শনালোচনা ও মরমিয়াবাদই প্রাচীন সন্ন্যাসবাদ ও নিষ্ক্রিয়াবাদ অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। নব সূফীগণ কেবল সন্ন্যাসব্রতাবলম্বীই (জাহিদ্‌) নহে, মরমী ভক্তও (আরিফ্‌)

(১) Nicholson's Literary History of Arabs. P. 385. 1941.

—তাঁহারা কেবল সংসারই ত্যাগ করেন নাই, ঈশ্বরকেও পূর্ণ লাভ করিয়াছেন—বিচার বুদ্ধির সাহায্যে নহে, প্রেমের প্রগাঢ়তায়।)

(এই নব সূফীমতের প্রধান প্রচারকত্রয় **মারূফ্ আল্ কারখী** (মৃত্যু ৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে), **আবু সুলেমান আল্ দারাণী** (মৃত্যু ৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে) এবং **ধুল্ নূন্ আল্ মিশ্রী** (মৃত্যু ৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে)।)

(**মারূফ আল্ কারখী** মেসোপোটামিয়া নিবাসী ও **ফুদায়াল্ বিন্-লিয়াদের** সমসাময়িক ছিলেন। তিনি হারূন্ অল্ রসিদের রাজত্বকালে বাগদাদে করখ্ অঞ্চলে বাস করিতেন এবং মহাপুরুষ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম সূফীমতে মরমিয়াবাদের প্রবর্ত্তন করেন এবং তজ্জন্য তাঁহাকে নব সূফীমতের প্রবর্ত্তক বলা চলে।) পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, মারূফ্ প্রদত্ত সূফী মতবাদের লক্ষণই (definition) প্রাপ্ত লক্ষণগুলির মধ্যে প্রাচীনতম। তিনি ঈশ্বরের সাক্ষাৎপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া দাবী করিতেন। তাঁহার মনে এই বিশ্বাস ছিল যে তিনি ঈশ্বরের বিশেষ প্রিয়পাত্র, এবং তজ্জন্য তিনি স্বীয় শিষ্যদের বলিয়াছিলেন: "যদি ঈশ্বরের কাছে তোমাদের কিছু প্রার্থনা থাকে তাহা হইলে আমার নাম করিও।" (মারূফ্ ভগবদ্‌ভক্ত সাধুর তিনটী লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন—যথা তাঁহার চিন্তা, আশ্রয় ও কার্য্য সকলই ঈশ্বরময়।)

(**আবু সুলেমান্ আল্ দারাণী**ও মেসোপোটেমিয়া নিবাসী ছিলেন, কিন্তু পরে ড্যামাস্‌কাসের নিকটবর্ত্তী দারায় নামক স্থানে গমন করেন। সুলেমানও মরমিয়া বাদের প্রপঞ্চনা করেন। তাঁহার মতেও ঈশ্বর বুদ্ধি-গোচর নহেন—তর্ক বিচার ও ন্যায়শাস্ত্রের দ্বারা ঈশ্বরলাভ অসম্ভব।) কিন্তু নিষ্ফল বিচার বুদ্ধির আড়ম্বর পরিত্যাগ করিলে ভগবৎপ্রসাদে আমাদের তৃতীয় নয়ন উন্মীলিত হয়, এবং প্রেমের অঞ্জনে রঞ্জিত সেই তৃতীয় নয়ন দ্বারাই আমাদের অপরোক্ষ ঈশ্বরজ্ঞান জন্মে, অন্য উপায়ে নহে। (সুলেমান বলিয়াছেন যে, মরমী ভক্তের আধ্যাত্মিক চক্ষু উন্মীলিত হইলে তাঁহার

পার্থিব চক্ষু মুদিত হইয়া যায়, এবং তজ্জন্য তিনি ঈশ্বর ভিন্ন অপর কিছুই আর দর্শন করেন না, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার নিকট ঈশ্বরময় রূপে প্রতিভাত হয়।)

(**ধুল্ নূন আল্ মিস্ত্রী** মিশর দেশ নিবাসী। তিনি স্বনামখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন।) সাধারণের বিশ্বাস ছিল যে, ঈশ্বরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল ও কথোপকথন হইত, এবং অলৌকিক ঘটনাও তাঁহার আয়ত্তীভূত ছিল। তিনি সনাতনধর্ম্ম বিরোধী বলিয়া কারারুদ্ধ, কিন্তু পরে মুক্তি প্রাপ্ত হন। মৃত্যুর পরে সাধুগণের নামের তালিকায় তাঁহার নামও গ্রথিত করা হয়। (প্রাচীন যুগে যাঁহারা বিধিবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল ভাবে সুফী মতবাদ প্রপঞ্চনা করেন, ধুল্ নূন তাঁহাদের অন্যতম। বস্তুতঃ সুফীগণ তাঁহাকে স্বসম্প্রদায়ের আদি গুরু বলিতেও পশ্চাৎপদ্ নহেন। ধুল্ নূনের প্রসঙ্গে বিখ্যাত সুফী জামী বলিয়াছেন "তিনিই আমাদের সম্প্রদায়ের আদি প্রবর্ত্তক। অন্যান্য সুফীগণ তাঁহারই বংশধর, তাঁহারই আত্মীয়মাত্র।")

(**আবু ইয়াজিদ্ তায়ফুর্** অথবা **বায়াজিদ আল্ বিস্তামী** (৮৭৪-৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু) প্রখ্যাত সুফী ছিলেন।) বায়াজিদ্ সমগ্র বিশ্ব-চরাচরকে এক অখণ্ড ঈশ্বর সত্তাময় বলিয়া প্রচার করেন। তজ্জন্য জন-সাধারণের ধারণা ছিল যে, তিনি ঈশ্বর ও বিশ্বের একত্ব (Pantheism) স্থাপনা করিয়াছিলেন। অর্থাৎ, তাঁহার মতে, বিশ্বই শুধু ঈশ্বরময় নহে, ঈশ্বরও সম্পূর্ণ বিশ্বলীন, বিশ্ববহির্ভূত নহেন; অথবা ঈশ্বর ও বিশ্ব সমব্যাপী ও অভিন্ন। কিন্তু, এই মত ভ্রান্ত, কারণ বায়াজিদ্ ঈশ্বরের জগদতিরিক্ততাও স্বীকার করিতেন।

(বাগ্দাদ্ নিবাসী **অল্ জুনাইদ্** (মৃত্যু ৩৩৫ খ্রীষ্টাব্দে) ধুল্ নূনের উপদেশাবলী সুশৃঙ্খলভাবে লিপিবদ্ধ করেন এবং জুনাইদের শিষ্য কুরাসান নিবাসী **আস্ সিব্লী** (মৃত্যু ৩৩৫ হিজিরাব্দে) তাহা প্রচার করেন।

জুনাইদ তৎকালীন সূফীগণের মধ্যে প্রসিদ্ধতম ছিলেন, কিন্তু তিনি সর্ব্বদাই সনাতন ইস্‌লাম ধর্ম্মের সহিত সূফীমতের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে সচেষ্ট ছিলেন।

যে সকল সূফী বিশ্বের সহিত ঈশ্বরের অভেদত্ব স্থাপনের প্রচেষ্টা করেন বলিয়া জনসাধারণের বিশ্বাস ছিল, তন্মধ্যে প্রসিদ্ধতম ছিলেন **আবুল্ মুগ্‌হিথ্ অল্ হুসেইন্ বি মান্‌সুর আল্ হাল্লাজ** (মৃত্যু ৩০৯ হিজিরাব্দ অথবা ৯২২ খ্রীষ্টাব্দে)। হাল্লাজ্ পারস্যদেশীয় পশম ব্যবসায়ী ছিলেন, এবং জুনাইদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। সনাতন ইস্‌লাম্ ধর্ম্মিগণ হাল্লাজকে কূটবুদ্ধি বিধর্ম্মী বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন, কিন্তু সূফীগণ তাঁহাকে প্রগাঢ় ভক্তি ও সম্মানের পাত্র বলিয়া মনে করিতেন, কারণ হাল্লাজ, স্বীয় মতের জন্য প্রাণ দণ্ডও নির্ভয়ে বরণ করিয়াছিলেন। হাল্লাজের সুবিখ্যাত বাণী "আমিই ঈশ্বর" (আনাল্ হাক্) তাঁহার মৃত্যুর কারণ হয়। তৎকালীন ধর্ম্মযাজকগণ ক্ষুদ্র মানবের সহিত ঈশ্বরের অভেদত্ব প্রচার চরম স্পর্দ্ধার বিষয় বলিয়া মনে করিতেন। তজ্জন্য হাল্লাজকে ঈশ্বরনিন্দুকরূপে প্রথমে কারারুদ্ধ, পরে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়।

এই যুগের সূফীগণ ঈশ্বর ও বিশ্বের একত্ব সগর্ব্বে প্রচার করিতেন, এবং ইস্‌লামধর্ম্মের বাহ্যিক আচারানুষ্ঠানও যথাযথ পালন করিতেন না। তজ্জন্য সনাতনপন্থী ইস্‌লামধর্ম্মিগণ নব সূফী-ধর্ম্মের বিরোধী ছিলেন, এবং সূফীগণকে স্বধর্ম্মত্যাগী পাপিষ্ঠ বলিয়া গণনা করিতেন।

(২) সনাতন ইস্‌লামধর্ম্মের সহিত সূফীমতের সামঞ্জস্য সংস্থাপন।

সূফী মতবাদ যে সনাতন ইস্‌লাম মতবাদের বিরোধী নহে, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য বহু সূফী সচেষ্ট ছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ **আবদুল্লা আল্ তুস্তারীর** নামোল্লেখ করা যায়। আবদুল্লা সূফীধর্ম্মের ছয়টী বিধির উল্লেখ

করেন—যথা, কোরাণে পূর্ণ বিশ্বাসস্থাপন, মহম্মদের অনুকরণ, ধর্ম্মানুমোদিত দ্রব্যভক্ষণ, পরহিংসা বর্জ্জন, নিষিদ্ধ বস্তু পরিত্যাগ এবং কর্ত্তব্যপালন। বলা বাহুল্য, এই সকল বিধিতে সনাতন পন্থীদের আপত্তিজনক কিছুই নাই।)

জুনাইদ্‌ও সূফী মতবাদের সহিত সনাতন ইস্‌লাম মতবাদের সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেন। সূফীগণ সাধারণতঃ প্রেমোন্মাদনায় অধীর হইয়া কোরাণ বহির্ভূত তত্ত্বাদি (যথা—ঈশ্বরের সহিত মানবের অভেদত্ব প্রভৃতি) বিশ্বাস, ও কোরাণোপদিষ্ট আচারানুষ্ঠান (যথা—নামাজ প্রভৃতি) অবহেলা করিতেন। কিন্তু জুনাইদ্ উক্ত প্রেমোন্মত্ত অবস্থা অপেক্ষা স্থির ধীর অবস্থাই সূফীগণের অধিকতর কাম্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

(এই প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ সূফী গ্রন্থকার আবূ বকর্ আল্ **কালাবাধীর** (মৃত্যু ৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দে) নামও উল্লেখযোগ্য। তিনি "সূফী মতবাদের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয়" নামক বিখ্যাত গ্রন্থে সূফী মতবাদ যে সনাতন ইস্‌লামমত বিরোধী নহে, তাহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।)

(**হুজয়িরির** (১০৭২—১০৭৬ খ্রীষ্টাব্দে) নামও উল্লেখযোগ্য। তিনি "রহস্য নির্ণয়" (কাসফ্ আল মাহ্‌জুব্) নামক গ্রন্থে সূফী মতবাদের সহিত সনাতন ইস্‌লাম ধর্ম্মের সামঞ্জস্য প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থ ফার্সী ভাষায় লিখিত সূফী গ্রন্থসমূহের মধ্যে প্রাচীনতম বলিয়া বিশ্বাস) এই গ্রন্থে হুজ্‌য়িরি স্বলিখিত অপর নয়টী গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন।

(বিখ্যাত ধর্ম্মগুরু আবূ হামিদ মহম্মদ আল্ **গাজালী** (মৃত্যু ১১১১ খ্রীষ্টাব্দে) অবশেষে সূফী ধর্ম্মের সহিত সনাতন ইস্‌লামধর্ম্মের মিলন সংঘটন করেন, এবং তাঁহারই প্রচেষ্টার ফলে সূফীমতবাদ সনাতন ইস্‌লামধর্ম্মে স্থানলাভ করে।) (গাজালী ইস্‌লামের শ্রেষ্ঠধর্ম্মতত্ত্ববিদ্ ও ধর্ম্মোপদেষ্টা ছিলেন। তজ্জন্য তাঁহাকে "ইস্‌লামধর্ম্মের প্রমাণস্বরূপ" নামে অভিহিত করা হইত) অতি অল্প বয়সে মাতৃপিতৃ হীন হইয়া গাজালী জনৈক সূফী ধর্ম্মাবলম্বী পিতৃবন্ধুর

দ্বারা লালিত পালিত হন্। পরে তিনি সূফীমত পরিত্যাগ করেন, কিন্তু পুনরায় তাহা গ্রহণ করেন, এবং সনাতন ইস্‌লামসম্মত এবং সেই হেতু যথাযথভাবে পরিবর্ত্তিত সূফী মতবাদ প্রচার করেন।

(৪) স্পেনীয় সূফীমতবাদ

(**ইব্‌ন্ আরবী** (১১৬৫-১২৪০ খ্রীষ্টাব্দ) স্পেনদেশীয় বিখ্যাত সূফী ছিলেন।) "পূর্ণ মানববাদ" (ইন্‌সানুল কামিল) তাঁহার মতবাদের প্রধান কথা। (তাঁহার মতে, সমগ্র জগৎ ঈশ্বরের অভিব্যক্তি, কিন্তু একমাত্র মানবেই তাঁহার পূর্ণ প্রকাশ।) উত্তরকালে **নাসাফী** (মৃত্যু ১২৬৩ খ্রীষ্টাব্দে) ও **জীলী** এই মতবাদ প্রপঞ্চিত করেন। আরবী বিশ্বের সহিত ঈশ্বরের অভেদত্ব (Pantheism) প্রচার করেন, এবং তাঁহার প্রভাবের ফলেই উক্ত অভেদবাদ সূফী সম্প্রদায়ে প্রচলিত হয়।

ইব্‌ন্ সাবিনও (মৃত্যু ৬৬৭ হিজিরাব্দে) খ্যাতনামা স্পেনীয় সূফী ছিলেন।

(৫) পারসিক সূফীমতবাদ

(খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী সূফীমতবাদের সুবর্ণ যুগ।) এই সময়ে তিনজন শ্রেষ্ঠ ফার্সী সূফী কবি ধরাধাম ধন্য করেন। তাঁহাদের নাম ফরিদুদ্দীন **আৎতার্**, জালাউদ্দীন **রূমী** ও শেখ্ **সাদী**)

ফরিদুদ্দীন **আৎতার** ঔষধ ব্যবসায়ী ছিলেন। পরে তিনি সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। জামীর মতে তিনি ১২২৭—৩০ খ্রীষ্টাব্দে চেঙ্গিস্ খানের সৈন্যদল কর্ত্তৃক নিহত হন। আৎতার্ বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, এবং প্রসিদ্ধি আছে যে কোরাণে যত সংখ্যক সূরা (পরিচ্ছেদ) আছে, তিনিও সমসংখ্যক অর্থাৎ, একশত চৌদ্দটী গ্রন্থরচনা করেন। যাহা হউক, মাত্র ত্রিশটীর কথাই জানা যায়। ইহাদের মধ্যে "নীতিপুস্তক"

(পন্দ্‌নাম) এবং "পাখীর ভাষা" (মন্‌টিকুটটের) নামক গ্রন্থদ্বয়ই সমধিক পরিচিত। প্রথমটীতে নীতিমূলক বিধি সম্বন্ধে আলোচনা আছে। দ্বিতীয়টি, মরমিয়াবাদমূলক রূপক বিশেষ।

জালাউদ্দীন মহম্মদ (১২০৭—১২৭৩ খ্রীষ্টাব্দ) "মৌলানা" অথবা জালাউদ্দীন **রূমী** নামেই সমধিক পরিচিত। তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফার্সী সূফী কবি, এবং তজ্জন্য জনসাধারণ তাঁহাকে "মৌলানা" অথবা "আমাদের প্রভু" বলিত। তিনি রূমে (এশিয়া মাইনরে) দীর্ঘকাল বাস করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম রূমী হইয়াছিল। রূমীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনপ্রিয় কাব্যগ্রন্থ "মস্‌নবী"। "ইহা ফার্সী কোরাণ" নামে সুপরিচিত, কারণ কোরাণের ন্যায় ইহাও অতি শ্রদ্ধার সহিত পঠিত হয়। রূমীর "দিওয়ান্‌"ও অতি উচ্চাঙ্গের কবিতা গ্রন্থ। রূমী "মৌলাইয়া" নামক সূফীসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। এই সম্প্রদায় "নৃত্যশীল দরবেশ" সম্প্রদায় নামে সমধিক পরিচিত। তত্ত্বের দিক্‌ হইতে ধুল্‌নুন্‌ আল্‌ মিশ্রীর সময় হইতে সূফীতত্ত্বের যে নবযুগের আরম্ভ হয়, রূমীর সঙ্গে তাহা প্রায় সমাপ্ত হইয়া যায়। পরবর্ত্তী সূফীগণ তত্ত্বের দিক হইতে বিশেষ কিছু নূতন পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন সাধন করিতে পারেন নাই।

সিরাজ নিবাসী **সাদী** (১১৮৪—১২৯১ খ্রীষ্টাব্দ) এই যুগের তৃতীয় শ্রেষ্ঠ সূফী কবি। কেবল পারস্যদেশে নহে, সমগ্র পৃথিবীতেই তিনি যশোভাজন হইয়াছিলেন। "গুলিস্তান" (গোলাপ-বাগান) ও "বূস্তান" (ফলের বাগান) তাঁহার সর্ব্ব প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। তাঁহার "গজল"ও সর্ব্বজনপ্রিয়। আত্তার্‌ ও রূমীর সহিত সাদার প্রভেদ এই যে, পূর্ব্বোক্ত কবিদ্বয়ের কবিতায় ভক্তিমূলক মরমিয়াবাদই সুপরিস্ফুট; কিন্তু সাদীর কবিতায় সাংসারিক ও বৈষয়িক বুদ্ধিই অধিকতর সুপ্রকট। ফার্সী ভাষায় লিখিত চাণক্যনীতিমূলক গ্রন্থসমূহের মধ্যে তাঁহার "গুলিস্তান" অন্যতম বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

সাদুদ্দীন মামুদ **সাবিস্তরি** (১২৫০ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম) সুবিখ্যাত সূফীগ্রন্থ "গুল্‌সান্‌ ই রাজ্‌" (দুর্ব্বিজ্ঞেয় গোলাপ-বাগান) নামক গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি ১৩১৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহা রচনা করেন।

সামসুদ্দীন **হাফিজ** (মৃত্যু ১৩৮৯ খ্রীষ্টাব্দে) প্রখ্যাতনামা সূফী কবি ছিলেন। তাঁহার "দেওয়ান্ ই হাফিজ্" জগৎবিখ্যাত কবিতাগুচ্ছ।

আবদুল করিম ইবন্ আল্ **জীলী** (১৩৬৫-১৪০৬ খ্রীষ্টাব্দ) বিখ্যাত সূফী লেখকগণের অন্যতম। তাঁহার গ্রন্থরাজির মধ্যে বিশটী পাওয়া গিয়াছে। তিনি আরবী প্রবর্ত্তিত "পূর্ণমানববাদ" সম্বন্ধে একটী গ্রন্থ রচনা করেন।

নুরুদ্দীন আবদুর রহমান্ **জামীও** (১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম) বিখ্যাত ফার্সী সূফী লেখক ও কবি ছিলেন। তিনি অতি সুপণ্ডিত ছিলেন, এবং নানাবিধ বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেন—মরমিয়াবাদ, ধর্ম্মতত্ত্ব, আরবী ব্যাকরণ ও অলঙ্কারশাস্ত্র, সঙ্গীত শাস্ত্র প্রভৃতি। তাঁহার রচিত সাধুগণের জীবনী অতীব প্রয়োজনীয় ও প্রামাণিক গ্রন্থ। জামী বিখ্যাত সূফীতত্ত্ববিদ্ ছিলেন, এবং তাঁহার রচিত গ্রন্থাদি প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সূফী মতবাদ

ঈশ্বর

ঈশ্বরের স্বরূপ

সূফী দর্শনের মূল কথা ঈশ্বরের একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্ব। "এককেই দেখ, একের কথাই বল, এককেই জান"(১)—ইহাই সূফী ভক্তবৃন্দের মর্ম্মোত্থ বাণী। ঈশ্বর এক, শ্রেষ্ঠ, অনাদি ও অনন্ত, তাঁহার সমকক্ষ অথবা উচ্চতর ও বৃহত্তর কেহই নাই। ঈশ্বর জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ। 'প্রেম' আনন্দের অপর নাম। সুতরাং আনন্দস্বরূপ ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ। হাল্লাজ বলিয়াছেন যে, প্রেম বা আনন্দই ঈশ্বরের স্বরূপের স্বরূপ—প্রেম বা আনন্দই জ্ঞানের মূলভিত্তি। অতএব জ্ঞানস্বরূপের স্বরূপ প্রেম বা আনন্দ। ("সৃষ্টির উদ্দেশ্য" দেখুন)।

(১) সাবিস্তরির "গুল্‌সান্ ই রাজ"

ঈশ্বর জগদ্‌বহির্ভূত (transcendent) অথবা জগল্লীন (immanent) —এই সম্বন্ধে সূফীগণ একমত নহেন। এই সম্বন্ধে যে পঞ্চবিধ মতবাদ সম্ভব সূফী মতে সে সকলই দৃষ্ট হয়।

(১) অধিকাংশ সূফীর মতে, ঈশ্বর জগদতিরিক্ত হইলেও জগল্লীন। তিনি অনন্ত, অসীম ও সর্ব্বব্যাপী, তজ্জন্য তিনি পৃথিবীর প্রতি ধূলি কণায়, প্রতি অণু পরমাণুতে নিহিত হইয়া আছেন। সূফী কবি বলিয়াছেন—"প্রতি অণুপরমাণুর অবগুণ্ঠনের অন্তরালে লুক্কায়িত হইয়া আছে প্রিয়তমের হৃদয়বিমোহন বদন সৌন্দর্য্য।"(২) এইরূপে, ঈশ্বর সমগ্র বিশ্বচরাচরে ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন; আপাতদৃষ্টিতে ঈশ্বর হইতে ভিন্ন প্রতীয়মান হইলেও প্রকৃত পক্ষে সমগ্র বিশ্বই ঈশ্বরসত্তাময়। সুতরাং ঈশ্বর জগল্লীন, জগতের অভ্যন্তরে বর্ত্তমান।

কিন্তু ঈশ্বর জগতের অভ্যন্তরে বর্ত্তমান থাকিলেও, জগতেই তাঁহার শেষ নয়,—তিনি জগতের বাহিরেও সমভাবে বিদ্যমান। একটী ক্ষুদ্র জগতে ঈশ্বরের পূর্ণ অভিব্যক্তি সম্ভবপর নহে। সুতরাং, ঈশ্বর জগল্লীন হইলেও জগদতিরিক্ত। অনন্ত, অসীম ঈশ্বর ক্ষুদ্র সসীম জগতকে পরিপূর্ণভাবে ব্যাপ্ত করিয়াও জগতের বহির্ভূত। তজ্জন্য সূফীভক্ত বলিয়াছেন "পৃথিবী তোমার দ্বারাই পূর্ণ, কিন্তু তুমি পৃথিবীতে নাই। সকলই তোমাতেই লীন, কিন্তু তুমি তাহাদের মধ্যে নাই।" (আৎতার)

অতএব সাধারণতঃ সূফীগণ জগতের সহিত ঈশ্বরের অভেদত্ব স্বীকার করেন না। জগৎ ও ঈশ্বরের অভেদত্বকে "বিশ্বাত্মবাদ" (Pantheism) বলা হয়; বিশ্বাত্মবাদ মতে, জগৎ ঈশ্বরময়; ঈশ্বরও জগল্লীন মাত্র, জগদ্‌ব্যতীত, জগদতিরিক্ত নহেন। অতএব ঈশ্বর ও জগৎ এক, অভিন্ন, সমপরিমাণ—সমগ্র জগৎ ঈশ্বরই, সমগ্র ঈশ্বরই জগৎ। কিন্তু ইহা ব্যতীত অপর একটী মতবাদও দৃষ্ট হয়। ইহার নাম "ঈশ্বরাধিকত্ববাদ" (Panen-

(২) "গুল্‌সান্ ই রাজ্"।

theism)। এই মতে, ঈশ্বর জগতে এবং জগৎ ঈশ্বরে অবস্থিত সত্য; কিন্তু ঈশ্বর জগৎ হইতে অধিক, জগতের অতিরিক্ত, জগতের বহির্ভূতও বটে। সুতরাং, ঈশ্বর জগল্লীন হইয়াও জগদতিরিক্ত—সমগ্র জগৎ ঈশ্বরই, কিন্তু সমগ্র ঈশ্বর জগৎ নহেন। সূফীমত সাধারণতঃ বিশ্বাত্মবাদ নহে, ঈশ্বরাধিকত্ববাদ মাত্র। এই মতে, সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর জগতে সমগ্রভাবে লীন থাকিতে পারেন না। তজ্জন্য তাঁহার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশমাত্রই জগতে লীন হইয়া আছে, অপরাপর অংশ জগদতিরিক্ত। সুতরাং জগৎ পরিপূর্ণভাবে ঈশ্বর হইলেও, পরিপূর্ণ ঈশ্বর জগৎ নহেন। উদাহরণ স্বরূপ, সমুদ্র ও বস্ত্রখণ্ডের উল্লেখ করা যাইতে পারে। সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র বস্ত্রখণ্ড জলময় হইলেও, সমুদ্র স্বয়ং বস্ত্রময় নহে, কারণ সমুদ্র সমগ্র বস্ত্রখণ্ডকে ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত করিয়াও তাহার বহির্ভাগে চতুর্দ্দিকে অনন্তপ্রসারী। সুতরাং সমগ্র বস্ত্রখণ্ড সমুদ্রলীন হইলেও সমগ্র সমুদ্র বস্ত্রলীন নহে। অতএব সমুদ্র বস্ত্রলীন হইলেও বস্ত্রাতিরিক্ত। একই প্রকারে ঈশ্বর জগল্লীন হইলেও জগদতিরিক্ত।

ঈশ্বরকে জগল্লীন বলিয়া স্বীকার করিলে আপত্তি হইতে পারে যে, ঈশ্বরও তাহা হইলে জগতের দ্বারা সীমাবদ্ধ, জগতেরই ন্যায় অশুদ্ধ হইয়া পড়িবেন, যেরূপ কর্দ্দমাক্ত পাত্রে ন্যস্ত শুভ্র নির্ম্মল কুসুমও কর্দ্দমাক্ত হইয়া পড়ে। এই আপত্তির খণ্ডনার্থ কোনও কোনও সূফী (যথা, নাসাফী) দেহ ও আত্মার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন। যে স্থলে সূক্ষ্ম বস্তুবিশেষ অপর একটী স্থূল বস্তুকে পরিব্যাপ্ত করে, সে স্থলে প্রথমটী দ্বিতীয়টীর দ্বারা সীমাবদ্ধ বা অশুদ্ধ হইয়া পড়েনা। স্থূল দেহ সীমাবদ্ধ ও অশুদ্ধ বলিয়া, দেহস্থিত সূক্ষ্ম আত্মা সীমাবদ্ধ ও অশুদ্ধ হয় না। যদি দেহস্থিত হস্ত, পাদ প্রভৃতি অংশ কর্ত্তন করিয়া ফেলা হয়, তাহা হইলে দেহ আয়তনে ক্ষুদ্রতর হইয়া যায় সত্য, কিন্তু আত্মার কিছুই হয় না। ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, দেহের সীমা ও আয়তন এবং আত্মার সীমা ও আয়তন সম্পূর্ণ পৃথক্; এবং দেহাবদ্ধ ও দেহলীন হইলেও আত্মা দেহের

দ্বারা সীমাবদ্ধ হইতে পারে না। পুনরায়, দেহ ঘর্ম্মাক্ত বা ক্লেদাক্ত হইলে, আত্মা ঘর্ম্মাক্ত বা ক্লেদাক্ত কদাপি হয় না। ইহা হইতেও প্রমাণিত হয় যে, দেহের অশুচিতা আত্মাকে স্পর্শমাত্রও করিতে পারে না। এইরূপে, সূক্ষ্ম ঈশ্বর স্থূল জগতে নিহিত থাকিলেও তদ্দ্বারা সীমাবদ্ধ বা অশুচি হইয়া পড়েন না।

ঈশ্বরের জগল্লীনত্ব সুবোধ্য করিবার নিমিত্ত, নাসাফী মৃত্তিকা, জল, বায়ু এবং অগ্নিরও উদাহরণ প্রদান করিয়াছেন। মৃত্তিকা স্থূলস্বভাব; মৃত্তিকা অপেক্ষা জল সূক্ষ্মতর; জল অপেক্ষা বায়ু সূক্ষ্মতর; বায়ু অপেক্ষা অগ্নি সূক্ষ্মতর। নিয়ম এই যে, সূক্ষ্মবস্তুই স্থূলবস্তুকে পরিব্যাপ্ত করিতে পারে। অতএব, জল মৃত্তিকাকে, বায়ু জলকে, এবং অগ্নি বায়ুকেও পরিব্যাপ্ত করিতে সমর্থ। যথা, একটী পাত্র মৃত্তিকা দ্বারা সম্পূর্ণ পূর্ণ করিলে, তাহাতে মৃত্তিকার আর স্থান না থাকিলেও জলের স্থান আছে; উহা জলের দ্বারা পরিপূর্ণভাবে পূর্ণ হইলে তাহাতে জলের আর স্থান না থাকিলেও বায়ুর স্থান থাকে; পরিশেষে, ঐ পাত্র বায়ুর দ্বারা ওতপ্রোত-ভাবে পূর্ণ হইলে, বায়ুর তাহাতে আর স্থান না থাকিলেও অগ্নির স্থান থাকে। এস্থলে, প্রথমতঃ, মৃত্তিকাপূর্ণ পাত্রে অপর মৃত্তিকার স্থান না থাকিলেও জলের স্থান আছে। অর্থাৎ, মৃত্তিকা সমস্থূল মৃত্তিকাতে প্রবেশ করিয়া লীন হইতে পারে না, কিন্তু সূক্ষ্মতর জল স্থূলতর মৃত্তিকাতে অনায়াসে প্রবেশ করিয়া পরিব্যাপ্ত হইতে পারে। একই প্রকারে জল-পূর্ণ পাত্রে অপর জলের স্থান না থাকিলেও বায়ুর স্থানের অভাব নাই। অর্থাৎ, জল সমস্থূল জলে প্রবেশ করিতে অসমর্থ হইলেও সূক্ষ্মতর বায়ু স্থূলতর জলে প্রবেশ ও তাহাকে পরিব্যাপ্ত করিতে পারে। সমভাবে বায়ু-পরিপূর্ণ পাত্রে অপর বায়ুর প্রবেশাধিকার না থাকিলেও অগ্নির আছে। অর্থাৎ, বায়ু সমস্থূল বায়ুতে লীন হইতে না পারিলেও, সূক্ষ্মতর অগ্নি স্থূলতর বায়ুকে পরিব্যাপ্ত করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, জলপরিব্যাপ্ত

মৃত্তিকা, বায়ুপরিব্যাপ্ত জল ও অগ্নিপরিব্যাপ্ত বায়ু যথাক্রমে ওতপ্রোত-ভাবে জলময়, বায়ুময় ও অগ্নিময় হইলেও, স্বয়ং জল মৃত্তিকাদূষিত, স্বয়ং বায়ু জলসংস্পৃষ্ট, অথবা স্বয়ং অগ্নি বায়ুস্পৃষ্ট হয় না। এইরূপে, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ঈশ্বর জগতের অন্তরাত্মরূপে জগতে অনুপ্রবিষ্ট হইলে, সমগ্র জগৎই ঈশ্বরপরিব্যাপ্ত হয়; কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বর সীমাবদ্ধ বা জগতের ন্যায় দোষদুষ্ট হন না।

(২) কোনও কোনও সূফীসম্প্রদায়ের মতে সমগ্র ঈশ্বরই জগতে লীন হইয়া আছেন। অর্থাৎ, ঈশ্বর জগল্লীন মাত্র, জগদতিরিক্ত নহেন; এবং সমগ্র ঈশ্বর ও জগৎ এক ও অভিন্ন। জগৎ ঈশ্বরের বাহিরে নাই, ঈশ্বরও জগতের বাহিরে নাই, উভয়ে সম্পূর্ণ সমপরিমাণ—সমগ্র ঈশ্বরই জগৎ মাত্র, সমগ্র জগৎ ঈশ্বরমাত্র। এই সম্প্রদায়কেই কেবল বিশ্বাত্মবাদী (Pantheist) বলা চলে, সকল সূফী সম্প্রদায়কে নহে। বিখ্যাত সূফী ইব্নুল আরবীই সূফী বিশ্বাত্মবাদের প্রধান প্রবর্ত্তক ও প্রচারক। আরবী সম্প্রদায়ের মতে, ঈশ্বর ত্রিরূপবিশিষ্ট—শুদ্ধস্বরূপ মাত্র, জগদ্রূপ ও 'পূর্ণমানবরূপ'। 'পূর্ণ-মানব' ঈশ্বর ও জগতের মিলন সেতু। 'পূর্ণমানব'ই ঈশ্বরের সৃষ্টির শেষ সীমা ও প্রকৃত উদ্দেশ্য, এবং 'পূর্ণমানবে'ই ঈশ্বরের সমগ্র স্বরূপের পরিপূর্ণ অভি-ব্যক্তি, ঈশ্বরের সমগ্র গুণাবলীর পরিপূর্ণ সমাহার। অতএব ঈশ্বর ও বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পরস্পর অভিন্ন, এবং ঈশ্বরের স্বতন্ত্র, অতিরিক্ত সত্তা আর কিছুই নাই।

(৩) উক্ত সম্প্রদায়ের কোনও কোনও সূফীর মতে, ঈশ্বর জগল্লীন নহেন, কারণ তিনি স্বয়ংই বিশ্ব। জীলী বলিয়াছেন যে ঈশ্বর সম্পূর্ণভাবে জগল্লীন; ইহা বলিলে এই সূচিত হয় যে, ঈশ্বর ও জগৎ দুই ভিন্ন পদার্থ, একে অপরে নিহিত আছে মাত্র। যথা, জল মৃত্তিকায় লীন হইয়া আছে বললে এই অর্থই হয় যে, জল ও মৃত্তিকা পরস্পর ভিন্ন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, ঈশ্বর ও জগৎ অভিন্ন। ঈশ্বর স্বয়ংই জগৎ, জগতে লীন মাত্র নহেন। অতএব

"বিশ্বাত্মবাদ" (আত্মা বিশ্বে লীন) অপেক্ষা "একাত্মবাদই" (এক আত্মাই স্বয়ং বিশ্ব) অধিক সমীচীন।

(৪) কোনও কোনও সূফীর মতে, ঈশ্বর সম্পূর্ণভাবে জগদ্‌বহির্ভূত, জগল্লীন একেবারেই নহেন। এই মতবাদকে "ঈশ্বরবহির্ভূতত্ববাদ" (Transcendentalism or Deism) বলা হয়। যে সকল সূফী সম্প্রদায় সনাতন ইস্‌লাম সম্প্রদায়ের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা ও বিরোধ পরিহারে উৎসুক ছিলেন, তাঁহারাই প্রধানতঃ ঈশ্বরবহির্ভূতত্ববাদী ছিলেন। এই মতানুসারে, ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা এবং শাসক; কিন্তু তিনি জগতের বহির্ভাগে অবস্থিত এবং জগৎ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। জগৎ ঈশ্বরে নাই, ঈশ্বরও জগতে নাই, উভয়ে পরস্পর বিরোধী, পরস্পর ভিন্ন, ও পরস্পর বহির্ভূত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, কুম্ভকার ও ঘট, শিক্ষক ও ছাত্রের উল্লেখ করা যাইতে পারে। কুম্ভকার ঘটের স্রষ্টা, কিন্তু কুম্ভকার ঘটের সম্পূর্ণ বহিঃস্থিত, ঘটও তাহাই। এতদ্রূপে, ঈশ্বর জগৎস্রষ্টা হইলেও জগতের বহিঃস্থিত কারণ মাত্র, অন্তর্লীন আত্মা নহেন। পুনরায়, শিক্ষক ছাত্রের শাসক, এবং বহিঃস্থিত শাসকমাত্র। ঈশ্বরও জগতের প্রভু, শাসক, দণ্ডদাতা, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে জগদ্‌ব্যতিরিক্ত।

সনাতন ইস্‌লামপন্থী সূফী কালাবাধী বলিয়াছেন: "সৃষ্ট জগতের সহিত তাঁহার কোনও বিষয়েই সাদৃশ্য নাই; তাঁহার গুণাবলীর সহিতও সৃষ্ট প্রাণিগণের গুণাবলীর কোনই সাদৃশ্য নাই।" বিখ্যাত সূফী "হুজয়িরিও বলিয়াছেন" তিনি কোনও বস্তুতে লীন হন্ না, কারণ তাহা হইলে তিনি সেই সকল বস্তুর সমজাতীয় হইয়া পড়িবেন। তিনি কোনও বস্তুর সহিত সংযুক্তও নহেন, কারণ তাহা হইলে সেই বস্তু তাঁহার অংশ হইয়া পড়িবে।" ইঁহাদের মতে, এক বস্তু যদি অপর একটী বস্তুতে লীন হয়, তাহা হইলে উভয় বস্তুকে সমজাতীয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে,— এক ভিন্ন বস্তু অপর এক সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তুতে প্রবেশপূর্ব্বক তাহাকে পরিব্যাপ্ত

করিতে পারে না। অতএব, ঈশ্বর জগৎ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নস্বভাব বলিয়া জগল্লীন হইতেই পারেন না। পুনরায়, এক বস্তু যদি অপর বস্তুর সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে, তাহা হইলে উভয়ে পরস্পরের অংশ হইয়া পড়ে। কিন্তু ঈশ্বর অংশবিহীন, তজ্জন্য জগৎ ঈশ্বরের সম্পূর্ণ বহির্ভূত, ঈশ্বরের সহিত সংযুক্ত নহে। অতএব, উক্ত সুফীগণের মতে, প্রথমতঃ, ঈশ্বর জগল্লীন নহেন বলিয়া ঈশ্বর ও জগতের মধ্যে কোনরূপ আন্তর সম্বন্ধ (internal relation) নাই—ঈশ্বর ও জগৎ সম্পূর্ণভাবে পরস্পর বহির্ভূত। দ্বিতীয়তঃ, ঈশ্বর নিরংশ বলিয়া, ঈদৃশ পরস্পর বহির্ভূত ঈশ্বর ও জগতের মধ্যেও কোনরূপ বাহ্যিক সংশ্লিষ্টতা (extermal conjunction) নাই—ঈশ্বর ও জগৎ পরস্পর বহির্ভূতই নহেন শুধু, উপরন্তু পরস্পর অসংযুক্তও।

অবশ্য, ঈশ্বর জগদ্‌বহির্ভূত ও জগতের সহিত অসংশ্লিষ্ট বলিয়া ইহা মনে করা চলিবে না যে, ঈশ্বর জগৎ হইতে বহু দূরবর্ত্তী। উপরন্তু ঈশ্বর জগতের অতি নিকটবর্ত্তী। গাজালীর মতে, ঈশ্বর জগৎ হইতে বহু উচ্চে বর্ত্তমান থাকিলেও তিনি ইহার অতি নিকটবর্ত্তীও বটে। 'নিকটবর্ত্তিত্ব' অর্থ অবশ্য 'জগল্লীনত্ব' নহে। ঈশ্বর জগতের অতি নিকটবর্ত্তী সন্দেহ নাই, কিন্তু জগতে প্রবিষ্ট, লীন ও পরিব্যাপ্ত নহেন। গাজালীও বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর কোনও বস্তুতে বর্ত্তমান নহেন, কোনো বস্তুও ঈশ্বরে অবস্থিত নহে। সুতরাং, ঈশ্বর জগতের অতি নিকটবর্ত্তী হইয়াও জগল্লীন নহেন, সম্পূর্ণ জগদ্‌বহির্ভূত। তৈল ও জল, এবং সুরা ও জলের উদাহরণ দ্বারা ইহা সুগম হইবে। তৈল ও জল উভয়কে একই পাত্রে ন্যস্ত করিলেও তাহারা পরস্পর নিকটবর্ত্তী হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু কদাপি পরস্পরের সহিত মিশ্রিত হয় না, অর্থাৎ, একে অপরের সহিত সংযুক্ত হয় না, একে অপরে লীন হয় না, একে অপরকে পরিব্যাপ্ত করিতে পারে না—বহিঃস্থিতই থাকে, কারণ তাহারা স্বভাবতঃই বিরুদ্ধধর্ম্মী। দুই বিরুদ্ধধর্ম্মী বস্তুর নিকটবর্ত্তিত্ব সম্ভব, কিন্তু পরস্পর সংমিশ্রণ, সংযোগ, অথবা একের অপরে লীনত্ব

অসম্ভব। অপরপক্ষে, একই পাত্রে ন্যস্ত সুরা ও জলের সংমিশ্রণ, সংযোগ, বা পরস্পর লীনত্বে কোনই বাধা নাই, কারণ ইহারা বিরুদ্ধধর্ম্মী নহে। এতদ্রূপে, ঈশ্বর ও জগৎ বিরুদ্ধধর্ম্মী বলিয়া, ঈশ্বর জগতের অতি নিকটবর্ত্তী হইয়াও জগতে প্রবিষ্ট, লীন, অথবা জগতের সহিত সংযুক্ত নহেন।

সংক্ষেপে, ঈশ্বর, প্রথমতঃ, সম্পূর্ণরূপে জগৎ হইতে বহির্ভূত ; দ্বিতীয়তঃ, সম্পূর্ণরূপে জগতের সহিত অসংযুক্ত ; তৃতীয়তঃ, ইহা সত্বেও জগতের অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী। এই মতে বিরুদ্ধ আপত্তি হইতে পারে যে, সর্ব্বব্যাপী, অনন্ত, অসীম পরমেশ্বরকে জগৎ হইতে সম্পূর্ণ বহিঃস্থিত বলিলে তিনি সসীম ও শান্ত হইয়া পড়েন। তিনি জগতের বহির্ভূত, জগদ্‌ব্যাপী নহেন, তাহা হইলে তাঁহাকে "সর্ব্বব্যাপী" বলা যায় কিরূপে? সে স্থলে তিনি জগতেরই ন্যায় সীমাবদ্ধ তত্ত্ব হইয়া পড়েন—জগদপেক্ষা লক্ষগুণে বৃহত্তর হইয়াও তিনি জগতের দ্বারাই সসীম হইতে বাধ্য। যাহা হউক, উক্ত সূফীগণ এই সকল ন্যায়সঙ্গত আপত্তি খণ্ডনের কোনই প্রচেষ্টা করেন নাই।

(৬) রূমী প্রমুখ (১) সূফীগণের মতে, ঈশ্বর সম্পূর্ণ জগল্লীনও নহেন, সম্পূর্ণ জগদ্‌বহির্ভূতও নহেন ; একইকালে জগল্লীন ও জগদ্‌বহির্ভূত উভয় প্রকারও নহেন ; অথবা জগল্লীনত্ব ও জগদ্‌বহির্ভূতত্ব এই অবস্থাদ্বয়ের মধ্যাবস্থও নহেন। বস্তুতঃ, "লীন", "বহির্ভূত" প্রভৃতি পদের দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ বর্ণনা অসম্ভব। এই সকল পদ পার্থিব বস্তুজাতেই প্রযোজ্য, পরমেশ্বরে নহে। দেশ, কাল, কারণ প্রভৃতি তত্ত্ব (category) কেবল জাগতিক বিষয় সম্বন্ধীয় মাত্র। আমরা অবশ্য পরমেশ্বরেও ইহাদের প্রয়োগ করিয়া থাকি, কিন্তু ইহারা যে তাঁহার স্বরূপের পূর্ণদ্যোতক নহে, তাহাও স্মরণে রাখা কর্ত্তব্য। ঈশ্বরের প্রকৃত ও পূর্ণ স্বরূপ জানিবার উপায় বুদ্ধিবিচারমূলক তত্ত্বাদি নহে, প্রেম ও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ মিলন।

---

(১) গাজালীকেও এই শ্রেণীর অন্তর্গত করা যায়, কারণ তাঁহার মতে ঈশ্বর জগতের বাহিরেও নহেন, ভিতরেও নহেন।

সংক্ষেপে সূফী মতবাদে, ঈশ্বরের জগল্লীনত্ব ও জগদ্‌বহির্ভূতত্ব সম্বন্ধে পঞ্চবিধ মতবাদ দৃষ্ট হয়ঃ—(১) ঈশ্বর জগল্লীন ও জগদতিরিক্ত উভয়ই। (২) তিনি কেবলমাত্র জগল্লীন, জগদতিরিক্ত নহেন। (৩) তিনি জগল্লীন নহেন, স্বয়ংই জগৎ। (৪) তিনি কেবলমাত্র জগদ্‌বহির্ভূত, জগল্লীন নহেন। (৫) তিনি জগল্লীন অথবা জগদ্‌বহির্ভূত কোনোটাই নহেন।

বৈদান্তিকগণের মতে, ব্রহ্ম জগল্লীন হইলেও জগদতিরিক্ত। ব্রহ্ম কারণ, জীবজগৎ কার্য্য। কার্য্য কারণসত্তাময়। তদ্রূপ, জীবজগৎও ব্রহ্ম-সত্তাময়। যেরূপ মৃত্তিকাকার্য্য মৃন্ময়ঘটে মৃত্তিকা ভিন্ন অপর কিছুই নাই, তদ্রূপ ব্রহ্মকার্য্য জগতে সকলই ব্রহ্ম। কিন্তু ব্রহ্ম জগতের প্রতি অণু পরমাণুতে পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকিলেও, তিনি জগদতিরিক্তও বটে, কারণ তাঁহার পূর্ণ বিকাশ একটী মাত্র ক্ষুদ্র জগতে সম্ভবপর নহে। অতএব ব্রহ্মের জগল্লীনত্ব ও জগদ্‌বহির্ভূতত্ব সম্বন্ধে উপরি উক্ত পঞ্চবিধ মতের মধ্যে প্রথমটীই বৈদান্তিকগণের মত।

ঈশ্বর কেবলমাত্র জগল্লীন, জগদতিরিক্ত নহেন, এই দ্বিতীয় সূফী মত কোনও বেদান্ত সম্প্রদায়েরই মত নহে। অর্থাৎ, বেদান্ত বিশ্বাত্মবাদ (Pantheism) নহে। অনেকের ধারণা যে, অদ্বৈতবাদিগণ বিশ্বাত্মবাদী। এই মত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। পারমার্থিক স্তরে, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জগৎই নাই, সুতরাং ব্রহ্মের জগল্লীনত্ব বা জগদ্‌বহির্ভূতত্ব সম্বন্ধে কোনো-রূপ প্রশ্নই উঠে না। সুতরাং এই স্তরে ব্রহ্মই জগৎ, ইহা মনে করা ভ্রমমাত্র,—পারমার্থিক স্তরে ব্রহ্ম ব্রহ্মই মাত্র, অপর কিছুই নহে। ব্যবহারিক স্তরে, ঈশ্বর জগল্লীন ও জগদ্‌বহির্ভূত উভয়ই। সুতরাং কোনো স্তরেই ব্রহ্ম সম্পূর্ণভাবে জগল্লীন নহেন।

ঈশ্বর জগল্লীন নহেন, কিন্তু স্বয়ংই জগৎ, এই তৃতীয় সূফীমত শুদ্ধাদ্বৈতবাদ প্রবর্ত্তক বল্লভের মতানুরূপ। বল্লভের মতেও, ব্রহ্ম স্বয়ং জীবজগদ্রূপে অভিব্যক্ত হন। সুতরাং জীবজগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। অতএব ব্রহ্মই

জগৎ, জগতে লীন মাত্র নহেন। অবশ্য বল্লভের সহিত সূফীমতের প্রভেদ এই যে, তাঁহার মতে ব্রহ্ম ও জীবজগৎ অভিন্ন হইলেও সমপরিমাণ নহেন, ব্রহ্ম জগদতিরিক্তও। কিন্তু উক্ত তৃতীয় সূফীমতকে অদ্বৈতমতানুরূপ বলিয়া গ্রহণ করিলে ভ্রম হইবে। শঙ্করের মতে ব্রহ্ম জগৎ নহে, কিন্তু জগৎই ব্রহ্ম, অর্থাৎ প্রত্যক্ষীকৃত জগৎ মিথ্যামাত্র, এবং ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। যথা, রজ্জু-সর্প ভ্রম কালে, রজ্জু সর্প নহে, কারণ ইহা কদাপি সর্পে পরিণত হয় না; কিন্তু সর্পই রজ্জু, অর্থাৎ প্রতীত সর্পটী মিথ্যা, রজ্জুই একমাত্র সত্য।

ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপে জগদ্‌বহির্ভূত, জগল্লীন নহেন,—এই চতুর্থ সূফীমত কোনও বেদান্ত সম্প্রদায়েরই মত নহে। দ্বৈতবাদী মধ্বের মতে অবশ্য জীবজগৎ ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও ব্রহ্ম জীবের অন্তর্য্যামীরূপে জগল্লীন।

পঞ্চম সূফীমত যে, ঈশ্বর জগল্লীন অথবা জগদ্‌বহির্ভূত কোনোটাই নহেন, তাহা সাধারণ ভাবে বৈদান্তিকগণের মত নহে। অবশ্য তাঁহারা স্বীকার করেন যে, সাধারণ পদ ও বাক্য দ্বারা ব্রহ্মের পূর্ণ স্বরূপ প্রকাশ অসম্ভব। তৎসত্ত্বেও দেশাতীত, কালাতীত, কারণাতীত ব্রহ্মও সম্পূর্ণরূপে চিন্তা ও বাক্যের অতীত নহেন। তজ্জন্য 'ব্রহ্ম জগল্লীন বা জগদতিরিক্ত কিছুই নহেন'—ইহা না বলিয়া বৈদান্তিকগণ বলেন 'তিনি জগল্লীন ও জগদতিরিক্ত উভয়ই।' বলদেব প্রমুখ অচিন্ত্যভেদাভেদবাদিগণ এস্থলে বলেন যে, একই কালে জগল্লীনত্ব ও জগদতিরিক্তত্ব রূপ বিরুদ্ধ গুণদ্বয় অনন্ত অচিন্ত্য শক্তিমান, ব্রহ্মের পক্ষেই কেবল সম্ভব।

ঈশ্বরের গুণাবলী

এ সম্বন্ধেও দুইটী প্রধান স্ফী মতবাদ দৃষ্ট হয়।

(১) হাল্লাজ, ইবনুল আরবী, জীলী, জামী প্রমুখ স্ফীগণের মতে ঈশ্বর দ্বিরূপ বিশিষ্ট :—(ক) শুদ্ধস্বরূপ অথবা সত্তামাত্র,—নির্গুণ এবং নির্ব্বিশেষ। ইহা ঈশ্বরের অপ্রপঞ্চিত, অনভিব্যক্ত রূপ, এবং এই রূপেই তিনি "কেবলাত্মা", "পরমাত্মা", "ব্রহ্ম" (The Absolute) প্রভৃতি পদবাচ্য। হাল্লাজের মতে, এই অবস্থায় পরমাত্মা "নিজেই নিজের সহিত এক অপূর্ব্ব, অবর্ণনীয় কথোপকথনে রত থাকেন, নিজেই স্বীয় স্বরূপ শোভা নিরীক্ষণ করেন" ; এবং তাঁহার সকল গুণাবলী তাঁহারই মধ্যে অনভিব্যক্ত অবস্থায় লুকায়িত হইয়া থাকে। (খ) সগুণ ও সবিশেষ স্বরূপ। ইহাই ঈশ্বরের প্রপঞ্চিত ও অভিব্যক্ত রূপ, এবং এই রূপেই তিনি "ঈশ্বর", "দেবতা" (The Divinity) প্রভৃতি পদ-বাচ্য।(১) এই অবস্থায় পরমাত্মা স্বীয় শুদ্ধ স্বরূপকে গুণাবলীরূপে প্রকটিত করেন। কোন্ উদ্দেশ্যে তিনি ইহা করেন, তাহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে। ("স্ষ্টিরহস্য" দেখুন)।

(২) কালাবাধি, হুজ্‌য়িরি প্রমুখ স্ফীগণের মতে, ঈশ্বর সর্ব্বপ্রথম হইতেই এবং সর্ব্বদাই সগুণ—অনন্ত, অসংখ্য, অপরিমেয় কল্যাণগুণবিমণ্ডিত কোনো কালে এবং কোনো অবস্থাতেই তিনি নির্গুণ নির্ব্বিশেষ, সত্তামাত্র নহেন। যদি বলা হয় যে, ঈশ্বর প্রথমে নির্গুণাবস্থায় থাকেন, তৎপরে কালক্রমে সগুণাবস্থা প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তিনি অসম্পূর্ণতা দোষে দুষ্ট ও পরিবর্ত্তনভাগী হইয়া পড়েন। অর্থাৎ, প্রথমে তাঁহার গুণাবলী বর্ত্তমান ছিল না বলিয়া তিনি তৎকালে অসম্পূর্ণ ছিলেন, এবং তৎপরে গুণের

(১) এস্থলে বুঝিবার সুবিধার জন্য "The Absolute" ও "The Divinity" —এই শব্দদ্বয়ের সাধারণ বাংলা প্রতিশব্দ দেওয়া হইল। জীলী এই সম্পর্কে যে শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা নিম্নে "সৃষ্টি রহস্য" শীর্ষক অংশে বিবৃত আছে।

অভিব্যক্তি হইলে সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হন—ইহাই অবশ্যস্বীকার্য্য। কিন্তু ঈশ্বর অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত পরিপূর্ণ, নিষ্কল, নিরঞ্জন অনবদ্য, অপরিবর্ত্তনীয়, শাশ্বত। কোনো প্রকার অসম্পূর্ণতা, দোষত্রুটি, ন্যূনতা অথবা পরিবর্ত্তনশীলতা ঈদৃশ মহান্ পরমেশ্বরের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। অতএব, পরমেশ্বর শাশ্বতভাবে প্রথম হইতেই সর্ব্বগুণবিমণ্ডিত ও সর্ব্ব-দোষশূন্য—ঈদৃশ সগুণ অবস্থাই তাঁহার নিত্য, অনাদি, অনন্ত স্বরূপ; এবং কোনো কালেই তিনি নির্গুণ সত্তামাত্র নহেন।

অতঃপর, প্রশ্ন উঠে, ঈশ্বরের সহিত তাঁহার গুণাবলীর সম্বন্ধ কি? এবং বিভিন্ন ঐশ্বরিক গুণাবলীর পরস্পর সম্বন্ধই বা কিরূপ? এস্থলেও দুইটী প্রধান সূফীমত দৃষ্ট হয়।

(১) হুজ্ য়িরি প্রভৃতি সূফীগণের মতে, ঈশ্বরের গুণাবলী ঈশ্বরের সহিত অভিন্নও নহে, ঈশ্বর হইতে ভিন্নও নহে। ইঁহারা এ সম্বন্ধে কোনো আলোচনা, বা উক্ত মতবাদের জন্য কোনোরূপ কারণ নির্দ্দেশ করেন নাই। সম্ভবতঃ, তাঁহারা নিম্নলিখিত উভয়সংকট (Dilemma) হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্যই উপরি উক্ত মতবাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ, যদি বলা হয় যে ঈশ্বরের গুণাবলী ঈশ্বর হইতে ভিন্ন বা পৃথক্, তাহা হইলে ঈশ্বর ব্যতীত দ্বিতীয় তত্ত্ব স্বীকার করা হয়—অর্থাৎ ঈশ্বর ও ঐশ্বরিক গুণাবলী, এই দুই পরস্পরভিন্ন তত্ত্ব। সুতরাং ঐশ্বরিক গুণাবলী ঈশ্বর হইতে ভিন্ন হইতে পারে না; কারণ তাহা হইলে একেশ্বরবাদ ও একতত্ত্ববাদের হানি হয়। দ্বিতীয়তঃ, যদি বলা হয় যে, ঈশ্বরের গুণাবলী ঈশ্বর হইতে অভিন্ন, তাহা হইলে গুণাবলী বহু সংখ্যক বলিয়া, ঈশ্বরও বহু হইয়া পড়েন, এবং তাঁহার একত্বের হানি হয়। এতদ্ব্যতীত, যদি, ঈশ্বরের গুণাবলী ঈশ্বর হইতে অভিন্ন হয়, তাহা হইলে 'ঈশ্বর' ও তাঁহার 'গুণ', এই দুইটী বিভিন্ন শব্দের আর প্রয়োজনীয়তা থাকে না, এবং 'গুণ' শব্দটীও অর্থহীন হইয়া পড়ে। যথা, 'ঈশ্বর করুণাময়' না বলিয়া 'ঈশ্বর ঈশ্বর' বলাই উচিত, যেহেতু

'করুণা' এই গুণটী ঈশ্বর হইতে অভিন্ন, অর্থাৎ স্বয়ং ঈশ্বর। সুতরাং, ঐশ্বরিক গুণাবলী ঈশ্বরের সহিত অভিন্নও হইতে পারে না; কারণ তাহা হইলে ঈশ্বরের একত্বের বিচ্যুতি ঘটে; এবং ঈশ্বর ও তাঁহার গুণের মধ্যে যে প্রভেদ তাহাও অসঙ্গত হইয়া পড়ে। অতএব, ভিন্নত্ব, অভিন্নত্ব উভয়পক্ষেই দোষের উদ্ভব হয় বলিয়া, ঐশ্বরিক গুণাবলী ঈশ্বর হইতে ভিন্নও নহে অভিন্নও নহে—ইহা স্বীকার করা ব্যতীত অন্য উপায় নাই।

ঐশ্বরিক গুণাবলীও পরস্পর ভিন্নও নহে, অভিন্নও নহে, কারণ এস্থলেও ভিন্নত্ব, অভিন্নত্ব উভয়পক্ষই দোষাবহ। যদি বিভিন্ন গুণসমূহ পরস্পরভিন্ন হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরের একত্বের হানি হয়, এবং বহুতত্ত্ববাদই স্বীকার করিতে হয়। পুনরায়, যদি তাহারা পরস্পর অভিন্ন হয়, তাহা হইলেও, 'করুণা', 'বল', 'মহত্ত্ব' প্রভৃতি গুণাবলীকে পৃথগ্‌ভাবে নির্দ্দিষ্ট করা নিরর্থক হইয়া পড়ে। অতএব গুণাবলীও পরস্পর ভিন্নও নহে, অভিন্নও নহে।

(২) দ্বিতীয় মতানুসারে, ঈশ্বর একমেবাদ্বিতীয়, ঈশ্বর ব্যতীত পৃথক্ সত্তা অপর কিছুই থাকিতে পারে না। অতএব, ঈশ্বরের গুণাবলী ঈশ্বর হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন। নতুবা তাহারা ঈশ্বর হইতে ভিন্ন হইলে, ঈশ্বর ব্যতিরিক্ত দ্বিতীয় তত্ত্বের অস্তিত্ব স্বীকার অনিবার্য্য; এবং সেস্থলে ঈশ্বরের একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্বের ব্যাহতি ঘটে। সুতরাং, দ্রব্য ও গুণ পরস্পর অভিন্ন—ইহা ইবনুল্ আরবী এবং তাঁহার মতানুসারী সুফীগণের (জীলী, নাসাফী, জামী প্রভৃতির) মত; এবং ইহা তাঁহাদের বিশ্বাত্মবাদেরই ন্যায়সঙ্গত ফল। পরমাত্মার শুদ্ধস্বরূপ অথবা নির্গুণ সত্তা তাঁহার গুণাবলীতে পরিণত এবং গুণাবলী দ্বারাই সেই প্রকারে অভিব্যক্ত হয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঈদৃশ ঐশ্বরিক গুণাবলীরই সমষ্টি মাত্র। সুতরাং, ঈশ্বর ও তাঁহার গুণাবলী অভিন্নস্বরূপ,—ঈশ্বরের সমগ্র স্বরূপ বা সত্তা তাঁহার গুণাবলীতেই প্রকটীকৃত হয়। অতএব, ব্রহ্ম সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদরহিতই কেবল নহেন, স্বগত-ভেদরহিতও নিশ্চয়।

বেদান্তবর্ণিত ত্রিবিধ ভেদের আলোচনা করিলে বিষয়টী সুস্পষ্ট হইবে। ভেদ তিন শ্রেণীর—সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত। একবস্তু হইতে অপর, এক সমজাতীয় বস্তুর যে ভেদ তাহার নাম 'সজাতীয় ভেদ'; যথা এক বৃক্ষ হইতে অপর এক বৃক্ষের ভেদ। এক বস্তু হইতে অপর এক ভিন্নজাতীয় বস্তুর যে ভেদ, তাহা 'বিজাতীয় ভেদ'; যথা বৃক্ষ হইতে মনুষ্য, পর্ব্বত প্রভৃতির ভেদ। একই সমগ্র বস্তু বা অংশীর বিভিন্ন অংশের যে পরস্পর ভেদ তাহা 'স্বগত ভেদ'; যথা একই বৃক্ষের মূল, কাণ্ড, শাখা, পত্র, পুষ্প প্রভৃতির পরস্পর ভেদ। ঈশ্বরপক্ষে স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ যে সম্ভবপর নহে, তাহা সাধারণতঃ সকল দার্শনিকগণই স্বীকার করেন। ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী বলিয়া তাঁহার বহির্দেশে কোনও সজাতীয় (অন্য ঈশ্বর, দেবতা প্রভৃতি) অথবা বিজাতীয় (দানব, রাক্ষস প্রভৃতি) বস্তু কিছুই থাকিতে পারে না। কিন্তু তাঁহার স্বগতভেদ আছে কি না, সে বিষয়ে মতভেদ আছে। যাঁহারা কেবলাদ্বৈতবাদী, অর্থাৎ যাঁহাদের মতে কেবল ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কিছুই নাই (যথা, শঙ্কর), তাঁহারা বলেন যে, ব্রহ্ম স্বগতভেদরহিত। তিনি পরিপূর্ণ সমগ্র সত্তা, কিন্তু সাংশ নহেন (concrete unity), নিরংশ (abstract unity)। তাঁহার স্বগত অথবা আন্তর ভেদ থাকিলেও তাঁহার একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্বের বিচ্যুতি ঘটে, যেহেতু এই সকল অংশ ব্রহ্মান্তর্গত হইলেও ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত 'দ্বিতীয়' তত্ত্ব নিশ্চয়ই। কিন্তু বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদ মতে ব্রহ্মের সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ না থাকিলেও স্বগতভেদ আছে—তাঁহার অসংখ্য গুণ ও শক্তিসমূহই তাঁহার স্বগতভেদ।

ইবনুল আরবী প্রমুখ বিশ্বাত্মবাদী স্ফীগণের মতেও ঈশ্বর স্বগত-ভেদবিহীন, নিরংশ সত্তা, অবশ্য ভিন্ন অর্থে (নিম্নে দেখুন)। ঈশ্বরের গুণাবলীকে তাঁহার স্বগতভেদ বলা চলে না, কারণ ঈশ্বরের সমগ্র সত্তা বা স্বরূপ তাঁহার গুণাবলীতেই পূর্ণ পরিণত ও প্রকটিত হয়। সুতরাং ঈশ্বরের

স্বরূপ ও গুণ সম্পূর্ণ অভিন্ন—ঈশ্বরই ঐশ্বরিক গুণসমূহ, ঐশ্বরিক গুণসমূহই ঈশ্বর, ইঁহাদের মধ্যে ভেদের লেশমাত্রও নাই। অথবা, ঈশ্বরই জগৎ, (জগৎ ঈশ্বরের গুণাবলীর সমষ্টিমাত্র), জগতই ঈশ্বর—উভয়ে অভিন্ন।

গুণসমূহের পরস্পর সম্বন্ধ সম্পর্কে বলা যায় যে, তাহারা পরস্পর ভিন্ন নিশ্চয়ই। ইহা সত্ত্বেও তাহারা একই সত্তার বিভিন্ন পরিণাম বলিয়া স্বরূপতঃ একই, এবং তজ্জন্য ঈশ্বরের একত্বের হানিকারকও নহে।

সূফীমতের সহিত বেদান্তমত তুলনা করিলে দেখা যায় যে, প্রথম সূফীমত অর্থাৎ ঈশ্বর পূর্ব্বে নির্গুণ, পরে সগুণ,—কোনও বেদান্তসম্প্রদায়েরই মত নহে। বৈদান্তিকগণের মতে, ব্রহ্ম সর্ব্বদাই নির্গুণ (অদ্বৈতবাদ), অথবা সর্ব্বদাই সগুণ (বৈষ্ণব বেদান্ত), কিন্তু পূর্ব্বে নির্গুণ, পরে সগুণ নহেন। উক্ত সূফীমতের সহিত আপাতদৃষ্টিতে অদ্বৈতবাদের সাদৃশ্য আছে বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ইহা সত্য সাদৃশ্য নহে। উক্ত সূফী মতানুসারে, নির্গুণ পরমাত্মা সত্যই গুণাবলীতে অভিব্যক্ত হইয়া সগুণত্ব প্রাপ্ত হন। কিন্তু অদ্বৈতমতে, নির্গুণ ব্রহ্ম সত্যই গুণমণ্ডিত হইয়া সগুণ ঈশ্বরে পরিণত হন না, পরিণত হইয়াছেন বলিয়া প্রতীয়মান হন মাত্র। পারমার্থিক স্তরে, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, সৃষ্টিও নাই, জগৎও নাই। ব্যবহারিক স্তরে, জগৎ সত্য বলিয়া জগৎস্রষ্টাও সত্য। ঈদৃশ জগৎস্রষ্টাই 'সগুণ ব্রহ্ম' বা ঈশ্বর। কিন্তু ব্যবহারিক স্তর পারমার্থিক স্তরের বাস্তব পরিণাম নহে, মিথ্যা (অর্থাৎ আপাততঃ সত্য, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অসত্য) বিবর্ত্ত বা সাময়িক প্রতীতিমাত্র। রজ্জু-সর্প ভ্রমকালে রজ্জু সত্যই সর্পে পরিণত হয় না, পরিণত হইয়াছে বলিয়া সাময়িকভাবে প্রতীত হয় মাত্র। তদ্রূপ নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম সত্যই জগৎস্রষ্টায় ও সৃষ্টজগতে পরিণত হন না, পরিণত হইয়াছেন বলিয়া প্রতীত হন মাত্র। পারমার্থিক স্তরে স্রষ্টা সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর ও সৃষ্ট জগৎ উভয়ই তুল্য মিথ্যা; নির্গুণ, নির্ব্বিকার, নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। অতএব সূফী মতে, ঈশ্বরের সমসত্য দ্বিরূপ—নির্গুণ-

রূপ ও সগুণ রূপ। কিন্তু অদ্বৈতমতে, ব্রহ্মের একই রূপ—নির্গুণরূপ; সগুণ-রূপ অপারমার্থিক ও মিথ্যা মাত্র।

দ্বিতীয় সুফী মত অর্থাৎ ঈশ্বর সর্ব্বদাই সগুণ, রামানুজপ্রমুখ বৈষ্ণব বৈদান্তিকগণেরও মত। ইঁহাদের মতে, ব্রহ্ম অসংখ্যকল্যাণ-গুণমণ্ডিত ও হেয়গুণ শূন্য; এবং তাঁহার গুণাবলী দ্বিবিধ—ভীষণ ও মধুর। সর্ব্বশক্তিমান্ জগৎস্রষ্টা, শাসক ও ধ্বংসকর্তৃরূপে তিনি ভীষণ, আনন্দময়, অশেষসৌন্দর্য্য-মণ্ডিত, ও ভক্তবৎসলরূপে তিনি মধুর।

ঈশ্বরের সহিত তাঁহার গুণাবলীর সম্বন্ধ সম্বন্ধে, সুফীগণের ন্যায় বৈদান্তিক-গণও ভিন্নমত। ঐশ্বরিক গুণাবলী ঈশ্বর হইতে ভিন্নও নহে, অভিন্নও নহে, সুফীগণের এই প্রথম মত বেদান্তানুমোদিত নহে। উপরন্তু শঙ্কর, (১) রামানুজ, নিম্বার্ক প্রভৃতির মতে, দ্রব্য ও গুণ ভিন্নাভিন্ন। যথা, নীলোৎপল ও তাহার নীলত্ব গুণ। প্রথমতঃ, নীলত্ব উৎপলাশ্রয়ী রূপে দ্রব্য হইতে অভিন্ন; কিন্তু তৎসত্ত্বেও নীলত্ব ও উৎপলত্ব ভিন্ন, এবং উৎপল কেবল নীলত্ব নহে, পেলবতা প্রভৃতি অন্য বহুগুণেরও আশ্রয়।

ঈশ্বর ও ঐশ্বরিক গুণাবলী অভিন্ন, এই দ্বিতীয় সুফী মত অচিন্ত্য ভেদা-ভেদবাদী বলদেবের মতানুরূপ। বলদেবের মতেও ব্রহ্মের গুণ ও শক্তি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, কারণ দ্রব্য ও গুণ, ধর্ম্মী ও ধর্ম্ম, শক্তিমান্ বা শক্তি প্রকৃত পক্ষে অভিন্ন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহাদের মধ্যে কোনোরূপ ভেদ না থাকিলেও, লৌকিক দিক্ হইতে উহাদের ভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করা হয়। ঈদৃশ লৌকিক ভেদের ন্যায় "বিশেষ"। অতএব ব্রহ্ম এবং তাঁহার গুণ ও শক্তির মধ্যে "ভেদ" নাই, "বিশেষ" আছে মাত্র। অতএব ইবন আরবী প্রভৃতির ন্যায়, বলদেবের মতেও ব্রহ্ম স্বগতভেদশূন্য।

শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বল্লভের মতেও জীবজগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, অতএব ব্রহ্মের স্বগতভেদ নাই।

---

(১) অবশ্য ব্যবহারিক স্তরে। পারমার্থিক স্তরে ব্রহ্ম নির্গুণ বলিয়া এই প্রশ্নই উঠে না।

শঙ্করের মতেও ব্রহ্ম স্বগতভেদহীন, কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে। ইবন্ আরবী, বলদেব ও বল্লভের মতে ব্রহ্মের অসংখ্য গুণ ও শক্তি সত্যই বিদ্যমান, কিন্তু তাহা ঈশ্বর হইতে অভিন্ন বলিয়া তিনি স্বগতভেদহীন। কিন্তু শঙ্করের মতে, ব্রহ্ম নিগুর্ণ, চিৎ ও অচিৎ তাঁহার অন্তর্ভুক্ত গুণ বা শক্তি নহে বলিয়াই তিনি স্বগতভেদহীন।

ঐশ্বরিক গুণাবলীর শ্রেণীভেদ:—ঈশ্বরের গুণাবলী বিভিন্নভাবে শ্রেণীভুক্ত করা যায়।

(১) প্রথমতঃ নাসাফী প্রভৃতির মতানুযায়ী ঐশ্বরিক গুণাবলীকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়:—(ক) সদর্থক অথবা ভাববোধক (Positive) গুণাবলী। ইহারা ঈশ্বরের শাশ্বত স্বরূপদ্যোতক—যথা প্রাণ, নিত্যতা, সর্ব্ব-শক্তিমত্ব ও ঈশিত্ব অথবা প্রভুত্ব। ইহাদের "ঈশ্বর সত্তার স্তম্ভ চতুষ্টয়" নামে অভিহিত করা হয়। (খ) নঞর্থক অথবা অভাববোধক (Negative) গুণাবলী। ইহারা ঈশ্বরের অসম্পূর্ণতা ও দোষ ক্রটীর অভাবদ্যোতক—যথা, পবিত্রতা, স্বাধীনতা প্রভৃতি। (গ) আপেক্ষিক অথবা সম্বন্ধবোধক (Relative) গুণাবলী। ইহারা ঈশ্বরের সহিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সম্বন্ধমূলক—যথা, মানবের জীবনদান ও মৃত্যু সংঘটনের শক্তি, ভক্তকে সাহায্য অথবা বাধা প্রদানের শক্তি প্রভৃতি।

(২) দ্বিতীয়তঃ, জীলী প্রভৃতির মতানুযায়ী, ঐশ্বরিক গুণাবলীকে চারিটী শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়:—(ক) স্বরূপমূলক গুণাবলী, যথা, একত্ব, নিত্যত্ব, সত্যত্ব। (খ) সৌন্দর্য্যমূলক অথবা মাধুর্য্যপ্রধানা গুণাবলী (জামাল্) যথা, ক্ষমা, দয়া, সুপথে পরিচালনা, ভক্তকে সাহায্য দান ইত্যাদি। (গ) শক্তিমূলক অথবা ঐশ্বর্য্যপ্রধানা গুণাবলী (জামাল্) যথা, সর্ব্বশক্তিমত্ব, প্রতি-হিংসা, বিপথে চালনা প্রভৃতি। (ঘ) পরমোৎকর্ষমূলক গুণাবলী (কামাল্) যথা, জ্ঞান, উন্নতাবস্থা, অনাদিত্ব, অনন্তত্ব, সর্ব্বব্যাপিত্ব প্রভৃতি।

(৩) তৃতীয়তঃ, সাধারণ সূফীদের মতানুযায়ী, ঐশ্বরিক গুণাবলী সাতটী শ্রেণীতেও বিভক্ত করা যায়,—যথা প্রাণ, জ্ঞান, সংকল্প, বল, বাক্য, শ্রবণ ও

দর্শন। (ক) 'প্রাণ' শক্তি প্রভাবেই জীবের উদ্ভব ও স্থিতি। প্রাণ দ্বিবিধ—পূর্ণ ও আংশিক। স্বাধীন, স্বতন্ত্র সত্তাই পূর্ণ প্রাণের লক্ষণ। একমাত্র ঈশ্বরই পূর্ণ প্রাণবান্। পরাধীন, পরতন্ত্র সত্তা আংশিক প্রাণের লক্ষণ। জাগতিক সকল জীবই ঈশ্বরাশ্রিত বলিয়া আংশিক প্রাণবান্ মাত্র। প্রাণ এক অখণ্ড সমগ্র সত্তা—ইহার বিভাগ নাই, হ্রাসও নাই। তজ্জন্য ঈশ্বরের প্রাণই পার্থিব প্রাণিসমূহের প্রাণ হইলেও এবং তজ্জন্য প্রত্যেক প্রাণীতে অবস্থিত থাকিলেও, তাহা বিভক্ত অথবা হ্রাস প্রাপ্ত হয় না—যেরূপ সূর্য্যালোক অসংখ্য গবাক্ষান্তর্ভূত হইলেও অবিভক্ত ও পরিপূর্ণ স্বরূপই থাকে।

(খ) 'জ্ঞান' প্রাণের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযুক্ত। কোনও কোনও সূফীর মতে জ্ঞান প্রাণের নিত্য সহচর। অর্থাৎ, প্রাণবান্ জীব জ্ঞানবান্ও; অবশ্য ইহাদের মধ্যে পরিমাণগত বিভিন্ন স্তর আছে। (নিম্নে "জগতের সজীবত্ব" দেখুন)। কেহ অধিক জ্ঞানী, কেহ অল্প। ঈশ্বরেই জ্ঞানের চরমোৎকর্ষ, তজ্জন্য তিনি সর্ব্বজ্ঞ। যে সকল সূফীর মতে জগৎ ব্রহ্মের বহির্ভূত তাঁহারা বলেন যে, ঈশ্বরের 'সর্ব্বজ্ঞত্ব' অর্থ:—তিনি স্বীয় সত্তাকে পরিপূর্ণ ভাবে জানিতেছেন, এবং বহিঃস্থিত সমগ্র বিশ্বচরাচরকেও সমভাবে জানিতে-ছেন। অর্থাৎ, তাঁহার জ্ঞেয় বস্তু দুইটী—স্বীয় সত্তা ও জগৎ; এবং উক্ত বস্তুদ্বয় তিনি পৃথগ্‌ভাবে জানিতেছেন। কিন্তু যাঁহারা বলেন যে জগৎ ঈশ্বরান্তর্গত তাঁহাদের মতে, ঈশ্বরের 'সর্ব্বজ্ঞত্ব' অর্থ তিনি স্বীয় সত্তাকে জানিয়াই সর্ব্ব-চরাচরকে জানিতেছেন। অর্থাৎ, তাঁহার জ্ঞেয় বস্তু একটীই, স্বীয় সত্তামাত্র, এবং বিশ্বচরাচর তাঁহার চিন্তাবিশেষ (Idea) বা জ্ঞানমাত্র (নিম্নে "সৃষ্টিরহস্য" দেখুন)। (গ) 'সংকল্প' শক্তি উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায়। যাহা পূর্ব্বে কল্পনা অথবা মানসিক চিন্তামাত্র ছিল তাহাই বাস্তব কার্য্যে পরিণত করাই সংকল্পের কার্য্য। যথা, গ্রামান্তরে গমন পূর্ব্বে কল্পনামাত্র ছিল, পরে সংকল্পের সাহায্যে তাহা প্রকৃতই কার্য্যে পরিণত হয়। ঈদৃশ উদ্দেশ্য সিদ্ধি অবশ্য মানবের পক্ষে বহুস্থলেই সম্ভবপর নহে, বহুস্থলেই চিন্তা চিন্তাই থাকিয়া

যায়, কার্য্যে পরিণত হয় না। কিন্তু ঈশ্বরের সংকল্প অবাধিতস্বরূপ, স্বাধীন, কারণহীন। সংকল্পমাত্রেই তাঁহার সকল ইচ্ছার পূরণ হয়। (ঘ) 'বল' অবিদ্যমান বস্তুর উদ্ভবের হেতু। সাধারণতঃ সূফীগণের মত এই যে, ঈশ্বর মাত্র সংকল্প বলে অবিদ্যমান জগৎকে শূন্য হইতে সৃষ্টি করেন। জগৎ প্রথমে সম্পূর্ণ অসৎ, অস্তিত্বশূন্য, অবিদ্যমান ছিল; পরে হঠাৎ শূন্য হইতে ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট হয়। কিন্তু ইবনুল্ আরবীর মতে পূর্ব্বেও জগৎ সম্পূর্ণ অস্তিত্বশূন্য ছিল না, ঈশ্বরের চিন্তারূপে বিদ্যমান ছিল, পরে পূর্ণ অভিব্যক্ত হয় (নিম্নে দেখুন)। (ঙ) 'বাক্য' দ্বারা ঈশ্বর আজ্ঞাপ্রদান, নিষেধ, প্রতিজ্ঞা, ভয়প্রদর্শন প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করেন। ঈশ্বরের বাক্য অবশ্য মানবের বাক্যের ন্যায় জিহ্বা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়নিষ্পাদ্য নহে। কোরাণ ঈশ্বরেরই বাক্য, এবং সেই হেতু অনাদি ও অনন্ত। (চ) 'শ্রবণ' দ্বারা ঈশ্বর জীবের প্রার্থনা শ্রবণ করেন, যদিও ইহাও কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়জ নহে। (ছ) 'দর্শন' দ্বারা ঈশ্বর চক্ষু ব্যতীতই বিশ্বচরাচর প্রত্যক্ষ করেন।

ঈশ্বরের কার্য্যাবলী

উপরি লিখিত বিবরণ হইতেই স্পষ্ট বোধগম্য হয় যে ঈশ্বরের গুণাবলী ও কার্য্যাবলীর মধ্যে কোনও পার্থক্য সূফীগণ করেন নাই। সাধারণতঃ, মহত্ত্ব, করুণা, সৌন্দর্য্য, কোমলতা প্রভৃতিকে ঈশ্বরের 'গুণ'; এবং বিশ্বসৃষ্টি, পাপের বিচার, পুণ্যের পুরস্কার প্রদান, মুক্তিদান প্রভৃতিকে ঈশ্বরের 'কার্য্য' বলিয়া বিবেচনা করা হয়। কিন্তু সূফীগণ সাধারণতঃ, সৃষ্টি, ন্যায়বিচার, দণ্ডপ্রদান, দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতিকেও ঈশ্বরের 'গুণ' নামেই অভিহিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ উক্ত সূফীগণের মতে, ঈশ্বরের গুণাবলী দুই শ্রেণীর— যাহা কার্য্য নহে, যথা, মহত্ত্ব, সত্য, সৌন্দর্য্য, প্রভৃতি; !এবং যাহা কার্য্য-বিশেষ, যথা, বচন, শ্রবণ, দর্শন, সর্জন, পালন, দণ্ডপ্রদান, ক্ষমাকরণ, প্রভৃতি।

কালাবাধী প্রমুখ সূফীগণের মতে, ঈশ্বর প্রথম হইতেই ও সর্ব্বদাই সগুণ বলিয়া, তাঁহার গুণাবলীও তাঁহার স্বরূপেরই ন্যায় নিত্য ও শাশ্বত। অতএব তাঁহার কার্য্যাবলীও গুণাবলীভুক্ত বলিয়া সমভাবে নিত্য ও শাশ্বত। তজ্জন্য ঈশ্বর যেরূপ নিত্যমহান্, নিত্যসত্য, নিত্যসুন্দর প্রভৃতি, তদ্রূপ তিনি সমভাবে নিত্যস্রষ্টা, নিত্যপালক প্রভৃতিও। এস্থলে আপত্তি হইতে পারে যে,—যে সকল গুণাবলী কার্য্যবিশেষ নহে, (সত্য, সৌন্দর্য্য প্রভৃতি) তাহাদের অবশ্য জগতের সহিত কোনোরূপ সম্পর্ক নাই, এবং তজ্জন্য জগৎ নিত্য না হইলেও তাহাদের নিত্য হইতে কোনই বাধা নাই। কিন্তু যে সকল গুণাবলী কার্য্যবিশেষ (সৃষ্টি, দণ্ডপ্রদান প্রভৃতি) তাহা জগতের সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ—জগৎ না থাকিলে তাহাদেরও অস্তিত্ব সম্ভবপরই নহে। যথা, **'সৃষ্টি'** অর্থ **'জগৎ'** সৃষ্টি; **'দণ্ড প্রদান'** অর্থ **জাগতিক** প্রাণীকে দণ্ডিত করা। অতএব সৃষ্টি কার্য্যটী নিত্য হইলে সৃষ্ট জগৎকেও নিত্য হইতে হইবে। কিন্তু সূফীগণ জগতের নিত্যতা স্বীকার করেন না। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, সূফীগণের মতে জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে সম্পূর্ণ অসৎ ছিল, পরে শূন্য হইতে সৃষ্ট হয়—অর্থাৎ জগৎ অনিত্য। অথচ উক্ত সূফীগণ বলেন যে, ঈশ্বর নিত্য জগৎস্রষ্টা; কিন্তু জগৎ নিত্য নহে; ঈশ্বর নিত্য দণ্ডদাতা, কিন্তু দণ্ডযোগ্য জীব অনিত্য; ঈশ্বর নিত্যই জগৎকে জানিতেছেন, কিন্তু জ্ঞেয় জগৎ অনিত্য। যদি জগৎ সৃষ্টই না হয়, তাহ'লে সৃষ্টিকার্য্যটীও অসম্ভব; এবং যদি সৃষ্টিকার্য্যটী নিত্য হয়, তাহা হইলে জগৎও নিত্য সৃষ্ট। পুনরায় দণ্ডার্হ জীব না থাকিলে দণ্ডপ্রদান অসম্ভব; এবং দণ্ডপ্রদান কার্য্যটী নিত্য হইলে দণ্ডার্হ জীবও নিত্য। অতএব হয় বলিতে হয় যে, ঈশ্বরের সৃষ্টি, দণ্ডপ্রদান প্রভৃতি কার্য্য অনিত্য; না হয় বলিতে হয় যে, জগৎ ও জীব নিত্য। কার্য্যের নিত্যতা কিন্তু কার্য্যসাপেক্ষ বস্তুর অনিত্যতা—এই উভয়পক্ষ একত্রে সম্ভবপর নহে (নিম্নে দেখুন)। যাহা হউক উক্ত সূফীগণের মতে, ঈশ্বরের সৃষ্ট্যাদি কার্য্যাবলী তাঁহার অন্যান্য গুণাবলীরই

ন্যায় নিত্য, অথচ জীব ও জগৎ অনিত্য। এই মতবাদের ন্যায়মূলক অসঙ্গতি বিষয়ে তাঁহারা কোনোরূপ আলোচনা করেন নাই।

আরবী প্রমুখ স্থফীগণের মতে পূর্ব্বে পরমাত্মা নির্গুণ অনভিব্যক্তস্বরূপ রূপে অবস্থান করেন, পরে সগুণাবস্থা প্রাপ্ত হইলে জগৎ সৃষ্টি হয়। অতএব, এই সকল স্থফীগণের মতে, জগৎসৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্য নিত্য নহে।

বেদান্তের মতে, ব্রহ্মের দুইটী প্রধান কার্য্য—সংসার সৃষ্টি ও মোক্ষ-প্রদান। শঙ্করের মতে অবশ্য পারমার্থিক স্তরে এই সকলের প্রশ্নই উঠে না। ব্রহ্ম জীবের কর্ম্মানুসারে জগৎ সৃষ্টি করেন, এবং তাহার সাধন প্রচেষ্টায় প্রীত হইয়া তাহাকে সংসার হইতে মুক্তিপ্রদানও করেন। কিন্তু সৃষ্টি কার্য্যটী নিত্য নহে। সৃষ্টির পরে প্রলয়, প্রলয়ের পরে পুনঃ সৃষ্টি—ইহাই সংসার-ক্রম। ধীবর যেরূপ ক্রমাগত জাল ফেলে ও গুটাইয়া লয়, সেইরূপ ঈশ্বরও চিৎ ও অচিৎ শক্তির বিক্ষেপ ও সঙ্কোচ দ্বারা বিশ্বচরাচর সৃষ্টি ও ধ্বংস করিতেছেন। অবশ্য প্রলয় কালেও জীবজগতের সম্পূর্ণ বিলয় হয় না, কারণ তাহারা ব্রহ্মের সূক্ষ্ম শক্তিরূপে ব্রহ্মেই অবস্থান করে।

ঈশ্বরের নামাবলী

ঈশ্বরের নামসমূহ তাঁহার স্বরূপ ও গুণাবলীরই ন্যায় শাশ্বত। কোনও কোনও স্থফীর মতে (যথা, কালাবাধী), ঐশ্বরিক গুণাবলীর ন্যায় ঐশ্বরিক নামসমূহও ঈশ্বর হইতে ভিন্নও নহে, অভিন্নও নহে। অপরাপর স্থফীর মতে, (যথা, জীলী), ঈশ্বরের নাম ঈশ্বর হইতে অভিন্ন। 'নামে'র সাহায্যে বস্তুস্বরূপ কল্পনা, তাহার অর্থবোধ এবং তাহা স্মরণে রাখা সম্ভব হয়। যথা, 'পুষ্প' এই নামটীর সাহায্যে পুষ্পের স্বরূপ কল্পনা সহজ হয়, এবং তাহা সহজবোধ্য ও মানস পটে গভীরভাবে অঙ্কিত হয়। বস্তুতঃ, নাম বস্তুর বাহ্যিক রূপ, বস্তু নামের অন্তঃস্বরূপ, এবং এই অর্থে উভয়ে অভিন্ন। অতএব, ঐশ্বরিক নাম ঈশ্বর হইতে অভিন্ন। তজ্জন্য ঈশ্বরের

নামকে জানিলে স্বয়ং ঈশ্বরকেও জানা হয়। জীলী বলিয়াছেন যে, ঐশ্বরিক নামরূপ দর্পণে মানব ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করে। ঈশ্বরের নাম দ্বিবিধ—স্বরূপবাচক, যথা, একমেবাদ্বিতীয় (আল্ আহদ্); অথবা গুণবাচক, যথা, 'করুণাময়' (আল্ রাহমান্)। ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ নাম 'আল্লা'। ইহা অপর সকল নাম ও গুণাবলীর দ্যোতক। ইবমুল্ আরবীর মতে, ঈশ্বরের তিনটী প্রধান নাম—'আল্লা', 'করুণাময়', এবং 'প্রভু' (আল্ রাব্)।

স্থষ্টি রহস্য

দর্শনশাস্ত্রের তিনটী প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় :—

(১) ঈশ্বর জগৎ স্থষ্টি করিলেন কেন? প্রত্যেক কর্ম্মের পশ্চাতে থাকে একটী প্রেরণা; অর্থাৎ যে বস্তু আমাদের নাই, অথচ যাহা আমরা চাই তাহারই লাভের তীব্র ইচ্ছা। অতএব অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তির জন্যই কেবল লোকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের অপ্রাপ্ত বস্তু অথবা অপূর্ণ ইচ্ছা থাকা সম্ভবপর নহে। তিনি আপ্তকাম, নিত্যতৃপ্ত, পরিপূর্ণ আনন্দময়। অতএব তাঁহার জগৎ স্থষ্টিরূপ কার্য্যটী কোন্ উদ্দেশ্য প্রসূত?

(২) ঈশ্বর জগৎ স্থষ্টি করিলেন কি প্রকারে? এক কি প্রকারে বহু হন? একমেবাদ্বিতীয় পরমেশ্বর কিরূপে নামরূপ বিশিষ্ট জগৎপ্রপঞ্চে রূপান্তরিত হন?

(৩) ঈশ্বর ও জগতের সম্বন্ধ কি?

স্থফীগণ উক্ত প্রশ্নত্রয়ের কি মীমাংসা করিয়াছেন তাহা নিম্নে আলোচিত হইতেছে।

সৃষ্টির উদ্দেশ্য

এই সম্বন্ধে সূফীগণ সাধারণতঃ একটী সুবিদিত পরম্পরাগত জনশ্রুতি (Tradition) সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন। তাহা এই—"ডেবিড ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'প্রভু! আপনি কেন মানবজাতি সৃষ্টি করিয়াছেন?' ঈশ্বর উত্তর দিলেন, 'আমি গুপ্ত নিধি, এবং আমি জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করি'।" অতএব মানবের নিকট সুবিদিত হইবার বাসনায় ঈশ্বর জগৎ এবং জগতে মানব সৃষ্টি করিয়াছেন।

বিজ্ঞানবাদী (Idealist) সূফীগণ উক্ত জনশ্রুতির এই অর্থ করেন যে, মানবের ঈশ্বর জ্ঞান ঈশ্বরের স্বাত্মজ্ঞানের নামান্তর মাত্র। ঈশ্বর স্বীয় সত্তাকে পরিপূর্ণভাবে জানিবার জন্যই, স্বীয় অনভিব্যক্ত স্বরূপকে পূর্ণ প্রকটিত করিবার জন্যই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়াই, ঈশ্বর তাঁহার অপ্রকটীকৃত শুদ্ধ স্বরূপাবস্থা পরিত্যাগপূর্ব্বক নামরূপ বিশিষ্ট বিশ্বসংসারে ক্রমবিবর্ত্তিত হন, এবং পরিশেষে মানব সৃষ্টি করেন। মানবেই ঈশ্বরের পূর্ণ পরিণতি, এবং মানবেই তিনি স্বীয় পরিপূর্ণ স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেন। অতএব, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বরের দর্পণস্বরূপ,—যে দর্পণে তিনি স্বয়ং স্বীয় স্বরূপ দর্শন করেন। কিন্তু জগৎ মলিন দর্পণ তুল্য; কারণ ইহা ঈশ্বরের আংশিক অভিব্যক্তি মাত্র, তাঁহার সমগ্র স্বরূপ অথবা সমগ্র গুণাবলীর প্রপঞ্চনা ইহাতে নাই। কিন্তু মানব, অর্থাৎ 'পূর্ণমানব', বা সিদ্ধপুরুষ, ঈশ্বরের নির্ম্মল, পূর্ণ, শ্রেষ্ঠ দর্পণস্বরূপ; কারণ পূর্ণমানব তাঁহার সমগ্র স্বরূপ ও গুণাবলীর পূর্ণ অভিব্যক্তি। এই রূপে, ঈশ্বর পূর্ণমানবের দ্বারাই নিজেকে নিজে পরিপূর্ণভাবে জানিতে পারেন; এবং নিজেকে নিজে জানিতে ইচ্ছুক হইয়াই ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেন। তিনি নিজেকে দুই অংশে বিভক্ত করিয়া, যুগপৎ জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় প্রেমিক ও প্রিয়রূপ ধারণ করিয়াছেন।

সুন্দরী নারী ও তাঁহার দর্পণের উদাহরণ দ্বারা এ বিষয় সুস্পষ্ট হইবে। সুন্দরী নারী স্বীয় সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ করিতে ও জানিতে উৎসুক। তজ্জন্য

দর্পণ তাঁহার নিকট অত্যাবশ্যক। একমাত্র দর্পণের সাহায্যেই তিনি স্বীয় সৌন্দর্য্য স্বয়ং দর্শন করিয়া উপলব্ধি করিতে পারেন। নতুবা, তিনি সৌন্দর্য্যবতী হইয়াও স্বীয় সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞই থাকিয়া যান। দর্পণ অবশ্য তাঁহার সৌন্দর্য্য সৃষ্টি অথবা বর্দ্ধিত করে না, কিন্তু পূর্ব্বস্থিত সৌন্দর্য্য অভিব্যক্ত ও তদ্রূপে তাঁহার নিকট জ্ঞাত করে মাত্র। মলিন দর্পণে অবশ্য সৌন্দর্য্যের পূর্ণ প্রকাশ সম্ভবপর নহে, তজ্জন্য নির্ম্মল দর্পণের প্রয়োজন। ঈদৃশ নির্ম্মল দর্পণেই তিনি স্বীয় সৌন্দর্য্য পূর্ণ উপলব্ধি করিয়া আনন্দে আত্মহারা হন। সুতরাং, সুন্দরীর দর্পণদর্শন কার্য্যটী নিরর্থক নহে; এবং তাহার ফলস্বরূপ যে দর্পণস্থ প্রতিচ্ছবি তাহাও সম্পূর্ণ সার্থক। সুন্দরীর স্বসৌন্দর্য্য সম্বন্ধীয় প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও তজ্জনিত আনন্দই দর্পণাবলোকন কার্য্য ও দর্পণস্থ প্রতিবিম্বের সাক্ষাৎ ফল; এবং ইহাদের অভাবে তাঁহার জ্ঞান ও আনন্দেরও অভাব ঘটিত। সুতরাং, তাঁহার জ্ঞান ও আনন্দের সম্পূর্ণতার জন্যই, দর্পণদর্শন কার্য্য ও দর্পণস্থ প্রতিচ্ছবি অত্যাবশ্যক।

ঈশ্বরের জগৎ সৃষ্টিরূপ কার্য্যটীও একই উদ্দেশ্য প্রসূত, নিরর্থক নহে। ঈশ্বরও স্বীয় সমগ্র সত্তা, স্বীয় পূর্ণ স্বরূপ পরিপূর্ণ ভাবে জানিতে উৎসুক। তজ্জন্য তিনি স্বীয় শুদ্ধ স্বরূপকে অনন্ত কল্যাণগুণগ্রামে অভিব্যক্ত করেন, এবং এই অভিব্যক্তিই জগৎ সৃষ্টি। অর্থাৎ, জগৎ ঈশ্বরের অভিব্যক্ত গুণগ্রাম, দর্পণ, অথবা প্রতিচ্ছবি মাত্র। জগদ্রূপ দর্পণ অথবা প্রতিচ্ছবির সাহায্যেই ঈশ্বর স্বীয় স্বরূপ ও গুণাবলী প্রত্যক্ষ জানিতেছেন ও জানিয়া আনন্দানুভব করিতেছেন। জগতে অবশ্য ঈশ্বরের গুণাবলীর অর্থাৎ স্বরূপের আংশিক বিকাশ মাত্র হইতেছে বলিয়া ঈশ্বর জগৎসৃষ্টির পরে মানব সৃষ্টিও করিয়াছেন। পুনরায় তন্মধ্যে যাঁহারা মরমী ভক্ত, যাঁহারা ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারাই 'পূর্ণমানব'; এবং তাঁহারাই ঈশ্বরের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি, পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি। ঈদৃশ পূর্ণ মানবেই ঈশ্বর স্বীয় সমগ্র স্বরূপ ও গুণাবলী

প্রত্যক্ষ করিয়া সাক্ষাৎ উপলব্ধি ও পরিপূর্ণ আনন্দ লাভ করিতেছেন। ঈদৃশ পূর্ণ স্বরূপজ্ঞান ও তজ্জনিত পূর্ণ আনন্দানুভব—এতদ্দ্বয় সৃষ্টির উদ্দেশ্য।

এস্থলে একটী আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। উক্ত মতানুসারে সুন্দরী যেরূপ দর্পণে স্বীয় সৌন্দর্য্য অবলোকন না করিলে সে সম্বন্ধে অজ্ঞই থাকিয়া যান, এবং আনন্দও লাভ করিতে পারেন না, তদ্রূপ ঈশ্বরও জগতে, অর্থাৎ পূর্ণমানবে, স্বীয় স্বরূপ বা গুণাবলী প্রত্যক্ষ না করিলে স্ব স্বরূপ বা গুণাবলী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞই থাকেন, এবং আনন্দলাভেও সমর্থ হন না। অতএব সৃষ্টির পূর্ব্বে তিনি অজ্ঞ ও নিরানন্দ ছিলেন—ইহাই স্বীকার করিতে হয়। অর্থাৎ অনভিব্যক্ত স্বরূপ, নির্গুণ পরমাত্মার জ্ঞানের ও আনন্দের অভাব ছিল; সৃষ্টির পরেই সেই অভাবদ্বয় বিদূরিত হয়। কিন্তু ঈদৃশ সর্ব্বগুণোপেত, জ্ঞানস্বরূপ, নিত্যতৃপ্ত, আপ্তকাম মহান্ পুরুষের পক্ষে কোনো রূপ অভাব, দোষ, ন্যূনতা বা অসম্পূর্ণতা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

এই আপত্তির খণ্ডনার্থ, কোনও কোনও সূফী বলিয়াছেন যে, সৃষ্টির পূর্ব্বেও পরমাত্মার জ্ঞান ও আনন্দের অভাব ছিল না—তৎকালেও তিনি স্বীয় স্বরূপকে পরিপূর্ণ ভাবেই জানিতেন, এবং তৎকালেও তাঁহার আনন্দের লেশমাত্রও অভাব ছিল না। তথাপি জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ পরমাত্মা পুনরায় স্বীয় স্বরূপ দর্শনে উৎসুক হইয়া জগৎ সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। সুতরাং, জ্ঞান ও আনন্দের বিন্দুমাত্র অভাব না থাকিলেও, পূর্ণমানবের দ্বারা পুনরায় জ্ঞান ও আনন্দলাভের জন্যই তিনি সৃষ্টি করেন। জামী বলিয়াছেন, "যদিও তিনি স্বীয় স্বরূপেই স্বীয় গুণগ্রাম পরিপূর্ণ ভাবে দর্শন ও উপলব্ধি করেন, তথাপি তাঁহার স্বরূপ বা গুণাবলী যেন অপর এক দর্পণে তাঁহার নিকট পুনরায় প্রতিফলিত হয়—তজ্জন্য তাঁহার অভিলাষ জন্মে।" হাল্লাজ বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর তাঁহার স্বীয় স্বরূপ, অর্থাৎ স্বীয় আনন্দ ও প্রেমকে বহির্বিক্ষিপ্ত করিতে ইচ্ছুক হন, যাহাতে তিনি তদ্দর্শন ও তৎসঙ্গে কথোপকথন

করিতে পারেন। অতএব, জগৎ ঈশ্বরস্বরূপের পরিণাম, তাঁহার প্রেম ও আনন্দের মূর্ত্ত প্রকাশ।

উপরি লিখিত সূফী প্রতিবিম্ববাদের সহিত অবশ্য অদ্বৈত প্রতিবিম্ববাদের বিন্দু মাত্রও সাদৃশ্য নাই। অদ্বৈত মতে, নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম মায়া বা অজ্ঞানে প্রতিবিম্বিত হইয়া ঈশ্বররূপ, ও অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত হইয়া জীবরূপ, ধারণ করেন (১)। প্রতিবিম্ব মিথ্যা, মায়ামাত্র, সত্যবস্তু নহে। তদ্রূপ ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্ম ও জীবও মিথ্যা, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। কিন্তু উক্ত সূফী মতে, জগৎ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব, প্রতিচ্ছবি, অর্থাৎ সত্য প্রকাশ ও পরিণতি, মিথ্যা নহে। নির্গুণ পরমাত্মা সত্যই সগুণ ঈশ্বরে অভিব্যক্ত হন, এবং সত্যই জগতে ও পূর্ণ মানবে ক্রমবিবর্ত্তিত হন। অতএব জগৎ পরমেশ্বরের তুল্য সত্য। অবশ্য কোনও কোনও সূফী সম্প্রদায় জগতের মিথ্যাত্বও স্বীকার করিয়াছেন। (নিম্নে "ঈশ্বরের সহিত জীবজগতের সম্বন্ধ" দেখুন।)

সৃষ্টির পূর্ব্বে পরমাত্মার জ্ঞান ও আনন্দের বিন্দুমাত্রও অভাব না থাকিলেও তিনি কোন্ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়া পুনরায় জ্ঞান ও আনন্দ লাভে উদ্‌গ্রীব হন, সে সম্বন্ধে পরিষ্কার আলোচনা সূফী মতবাদে দৃষ্ট হয় না। হাল্লাজ বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরের স্বরূপজ্ঞান ও আনন্দের অভাব না থাকিলেও, তিনি প্রতিচ্ছবি ও সাথীরূপে মানব সৃষ্টি করেন। (নিম্নে দেখুন)।

ঈশ্বর জগৎসৃষ্টি করিলেন কেন ?—ইহা দর্শনশাস্ত্রের চিরন্তন প্রশ্ন। বেদান্ত মতে, জগৎসৃষ্টি ঈশ্বরের লীলা অথবা ক্রীড়া মাত্র। (২) ক্রীড়া অভাবজাত নহে; উপরন্তু যাঁহার কোনোরূপ অভাব বা প্রয়োজন নাই, তিনিই ক্রীড়ায় কালক্ষেপ করিতে পারেন। ক্রীড়া কর্ম্মবিশেষ সন্দেহ নাই, কিন্তু অপরাপর কর্ম্মের সহিত ইহার মূলগত প্রভেদ এই যে ইহা প্রয়োজনসম্ভূত নহে।

(১) বেদান্ত পরিভাষা, সপ্তম পরিচ্ছেদ।

(২) "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্" ব্রহ্মসূত্র ২—১—৩২।

অপরাপর কর্ম্মের পশ্চাতে থাকে অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তির ইচ্ছা, অভাবপূরণের প্রচেষ্টা ; সুতরাং ইহারা উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় মাত্র। কিন্তু ক্রীড়া কর্ম্ম বিশেষ হইলেও সম্পূর্ণ পৃথক্ স্বভাব। ইহা অভাব পূরণের প্রচেষ্টা নহে, উপরন্তু অভাব পূরণ হইবার পরেই ইহার উদ্ভব, পূর্ব্বে নহে। প্রয়োজন সিদ্ধি হইবার পরে প্রাণে যে শান্তি ও আনন্দের উদয় হয়, ক্রীড়া তাহারই স্বতঃস্ফূর্ত্ত বাহ্যিক অভিব্যক্তি মাত্র। বেদান্তে এই প্রসঙ্গে মহাপরাক্রান্ত নৃপতির দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে। সকল যুদ্ধে জয়ী হইয়া, সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিঃশেষে সম্পাদন করিয়া, সকল উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ ভাবে সিদ্ধ করিয়া তৎপরেই তিনি ক্রীড়া ও উৎসবে রত হন। সেই সকল ক্রীডা ও উৎসবাদি তাঁহার প্রয়োজন সিদ্ধির উপায় নহে—কারণ বর্ত্তমানে তাঁহার অভাব কিছুই নাই—তাহারা কেবল তাঁহার আনন্দের বাহ্যিক প্রকাশ। অতএব, প্রথমে, অভাব-মূলক কর্ম্ম, তৎপরে উদ্দেশ্য সিদ্ধি ও তজ্জনিত আনন্দ, তৎপরে আনন্দমূলক কর্ম্ম বা ক্রীড়া। এতদ্রূপে ক্রীডা আনন্দাভাব মূলক কর্ম্ম নহে, প্রাপ্ত আনন্দের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। সুতরাং, প্রত্যেক কর্ম্মই যে প্রয়োজনানুরোধী ইহা স্বীকার করা চলে না। অবশ্য সাধারণতঃ, কর্ম্মসমূহ যে অভাবমূলক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ক্রীড়ারূপ কর্ম্মকে উক্ত পর্য্যায়ভুক্ত করা অসঙ্গত।

ঈশ্বর আপ্তকাম, আনন্দ স্বরূপ, সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষ—তাঁহার অভাব ও প্রয়োজন কিছুই নাই। অতএব তাঁহার জগৎ সৃষ্টিরূপ কার্য্যটী সাধারণ অভাবমূলক কর্ম্ম হইতেই পারে না। সুতরাং ইহা ক্রীড়ারূপ কর্ম্মমাত্র। জগৎ সৃষ্টির দ্বারা ঈশ্বর কোনোরূপ উদ্দেশ্য সিদ্ধির আশা করেন না। উপরন্তু, কোনও অভাব ও প্রয়োজন নাই বলিয়াই জগৎ সৃষ্টিরূপ ক্রীড়ায় তিনি মত্ত হন। এইরূপে সৃষ্টি ঈশ্বরের স্বতঃস্ফূর্ত্ত, নিত্য উদ্বেলিত, অসীম, অপরিমেয় আনন্দের মূর্ত্ত বিকাশ মাত্র। তজ্জন্য উপনিষদ্ বলিয়াছেন, "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্য-

ভিসংবিশন্তীতি"। (তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ৩—৬)। আনন্দ হইতেই সমগ্র বিশ্বচরাচরের সৃষ্টি; আনন্দেই তাহাদের স্থিতি; আনন্দেই তাহাদের লয়। স্বয়ং স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ না করিলেও, হাল্লাজের মতবাদে বেদান্ত প্রপঞ্চিত ঈশ্বরলীলাবাদের আভাস পাওয়া যায়। হাল্লাজের মতে, পরমাত্মার তিনটী অবস্থাক্রম।

(১) প্রথম অবস্থা সৃষ্টির পূর্ব্বে তাঁহার নির্গুণ ও নির্ব্বিশেষ শুদ্ধ-স্বরূপাবস্থা। এই অবস্থায় শুদ্ধসত্ত পরমেশ্বর নিজেই নিজের সহিত কথোপকথনে রত থাকেন, নিজেই নিজের স্বরূপশোভা নিরীক্ষণ করেন, এবং বিমুগ্ধ হন। ঈদৃশ স্বরূপবিমুগ্ধতার নামই 'প্রেম'। অর্থাৎ, তৎকালে পরমাত্মা নিজেই নিজের নির্গুণ শুদ্ধ স্বরূপের প্রতি প্রেমমুগ্ধ হন। অতএব স্বাত্মপ্রেমই পরমাত্মার স্বরূপের স্বরূপ। ভগবান্ প্রেমস্বরূপ। উক্ত প্রথম অবস্থা পরমাত্মার অনভিব্যক্ত অবস্থা, এবং এই অবস্থায় তিনি নির্গুণ, স্বাত্মজ্ঞ, স্বাত্মপ্রেমিক, স্বাত্মানন্দী স্বরূপে বর্ত্তমান থাকেন।

(২) দ্বিতীয় অবস্থায়, পরমাত্মা তাঁহার জ্ঞান, প্রেম ও আনন্দ স্বরূপকে বিভিন্ন গুণ ও নাম রূপে অভিব্যক্ত করেন। ইহাই তাঁহার আন্তর ও প্রথম বিকাশ।

(৩) তৃতীয় অবস্থায়, ঈশ্বর তাঁহার সেই নিরালা, নিঃসঙ্গ প্রেম ও আনন্দকে বাহ্যিকভাবে প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক হন। অর্থাৎ, তিনি স্বীয় প্রেমানন্দঘন স্বরূপকে মূর্ত্ত প্রকাশ করিতে অভিলাষী হন, যাহাতে তিনি তাঁহার নিজেরই স্বরূপের প্রতিমূর্ত্তিকে প্রত্যক্ষ করিতে এবং তাহার সহিত কথোপকথন করিতে পারেন। এই অভিলাষবশবর্ত্তী হইয়া, তিনি স্বীয় গুণ ও নামসম্বলিত প্রতিমূর্ত্তি শূন্য হইতে সৃষ্টি করেন। ইহারই নাম 'মানব'। ঈশ্বরের পূর্ণ অভিব্যক্তি ও প্রতিচ্ছবি বলিয়া 'মানব' ঈশ্বরপদবাচ্য।

অতএব হাল্লাজের মতেও বিশ্বচরাচর ঈশ্বরের প্রেম ও আনন্দের অভিব্যক্তি। আনন্দ হইতেই বিশ্বসৃষ্টি, অভাব হইতে নহে। হাল্লাজ

বলিয়াছেন যে, পরমাত্মার স্বরূপজ্ঞান, প্রেম ও আনন্দের অভাব না থাকিলেও তিনি প্রতিচ্ছবি ও সাথীরূপে মানব সৃষ্টি করেন। তিনি স্বাত্মজ্ঞান মাত্রে সন্তুষ্ট না হইয়া অপর এক দর্পণে স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন; স্বাত্ম প্রেমের একাকিত্বে তৃপ্ত না হইয়া অপর এক প্রেমিকের প্রেমকামী হইয়াছিলেন; নিঃসঙ্গ স্বাত্মানন্দে পরিতৃপ্ত না হইয়া আনন্দের অপর এক অংশীদার অন্বেষণে উদ্‌গ্রীব ছিলেন। তজ্জন্যই তিনি স্বীয় প্রতিচ্ছবি রূপে, স্বীয় প্রেম ও আনন্দের অংশীরূপে 'পূর্ণ মানব' সৃষ্টি করেন। কিন্তু যদি পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান ও আপ্তকাম হন, যদি তিনি প্রথম হইতেই আত্মজ্ঞ, প্রেমস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ হন, তাহা হইলে তাঁহার অভাব থাকিবে কিরূপে? সুতরাং সাথীসৃষ্টি অভাবমূলক নহে, ক্রীড়ামূলক। জ্ঞান, প্রেম ও আনন্দের দিক হইতে কোনোরূপ অভাব না থাকিলেও ঈশ্বর লীলাভরে মানব সৃষ্টি করিয়া পুনরায় তাহাতে স্বীয় স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেন, তাহার প্রেমে তৃপ্ত হন, তাহাকে স্বীয় আনন্দের অংশী করেন। অতএব জগৎ সৃষ্টি পরিপূর্ণ আনন্দ হইতে উদ্ভূত প্রয়োজনশূন্য ক্রীড়াবিশেষ মাত্র। ইহা স্বীকার না কারলে ঈশ্বরের অসম্পূর্ণতা অনিবার্য্য। অতএব সম্ভবতঃ হাল্লাজের মতেও, প্রেম ও আনন্দের সাথীরূপে অভিব্যাক্তি অথবা মানব সৃষ্টি প্রয়োজনশূন্য ক্রীড়ামাত্র।

হাল্লাজের উক্ত মতবাদ আমাদিগকে শুদ্ধাদ্বৈতবাদ প্রবর্ত্তক বল্লভাচার্য্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। বল্লভের মতেও ঈশ্বর লীলাস্বরূপ। সৃষ্টির পূর্ব্বে তিনি একাকী বিরাজ করিতেছিলেন, কিন্তু একাকী ক্রীড়া অসম্ভব বলিয়া তিনি ক্রীড়ার সাথীরূপে মানব সৃষ্টি করেন, অর্থাৎ মানবরূপে অভিব্যক্ত হইয়া নিজের সহিতই নিজে ক্রীড়ায় মত্ত হন।

বেদান্তের মতে ব্রহ্ম নিত্য সত্য, অনাদি ও অনন্ত, নিত্য পরিপূর্ণ। তিনি নিত্য সত্তা (Being) এবং নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় (Static)। ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে এই মতবাদ গ্রহণ করিলে, পূর্ব্বোল্লিখিত ঈশ্বরলীলাবাদই জগৎ

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা। ঈশ্বর নিত্যপূর্ণ ও নিত্য অপরিবর্ত্তনীয়, অথচ সৃষ্টিরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। সুতরাং, প্রথমতঃ তাহার সৃষ্টি কার্য্যটী অভাবমূলক কার্য্য নহে, আনন্দোচ্ছাসমূলক ক্রীড়ামাত্র। দ্বিতীয়তঃ সৃষ্ট জগতেও তিনি পরিবর্ত্তিত হন না। শঙ্করের মতে অবশ্য জগৎ ব্রহ্মের বাস্তব পরিণাম নহে, মিথ্যা 'বিবর্ত্ত'(১) মাত্র। কিন্তু অন্যান্য পরিণামবাদী বৈদান্তিকগণের মতেও সৃষ্টি ব্রহ্মার স্বশক্তি বিক্ষেপ মাত্র। সৃষ্টির পূর্ব্বে জীব ও জগৎ ব্রহ্মের সূক্ষ্ম চিৎ ও অচিৎ শক্তিদ্বয় রূপে ব্রহ্মেই লীন থাকে, সৃষ্টিকালে প্রপঞ্চিত হইয়া বিশ্বচরাচররূপ ধারণ করে। সৃষ্টির অর্থ এই নয় যে, ব্রহ্ম স্বীয় অংশ বিশেষকে জগদাকারে পরিণত করেন, এবং অন্যান্য অংশে অপরিণতই থাকিয়া যান। ব্রহ্ম নিরংশ, অখণ্ডনীয়, অবিভাজ্য সমগ্র সত্তা, তাঁহার অংশ বিভাগ নাই। তজ্জন্য শ্রুতিতে (মুণ্ডকোপনিষৎ ১-১-৭) ঈশ্বরের সৃষ্টি কার্য্যকে উর্ণনাভের তন্তুবয়নরূপ কার্য্যের সমতুল বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। উর্ণনাভ স্বশক্তি দ্বারা তন্তু বয়ন করে, কিন্তু স্বয়ং তন্তুরূপে পরিণত হয় না। তদ্রূপ, ঈশ্বরও স্বয়ং অপরিণত অপরিবর্ত্তনীয় থাকিয়াই স্বশক্তি বিক্ষেপ দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেন।

স্থিতিবাদ গ্রহণ করিলে, প্রথমতঃ, বেদান্ত সম্মত লীলাবাদই সৃষ্টি কার্য্যের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা বলিয়া মনে হয়। দ্বিতীয়তঃ, হয় শঙ্করের মতানুসারে ব্রহ্মের বাস্তব পরিণতি অস্বীকার করিয়া জগৎকে মিথ্যা বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়; নয় পরিণামবাদী বৈদান্তিকগণের মতানুযায়ী জগৎকে অপরিণত ব্রহ্মের শক্তিবিক্ষেপ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। হাল্লাজে অবশ্য 'বিবর্ত্তবাদ' অথবা শক্তিবিক্ষেপবাদের প্রপঞ্চনা নাই। তাঁহার মতবাদকে 'পরিণামবাদ'ও বলা চলে না, কারণ তাঁহার মতে জগৎ শূন্য হইতে সৃষ্ট। অথচ জগৎ ঈশ্বর স্বরূপের দর্পণ ও প্রতিচ্ছবিও বটে। ইহা অযৌক্তিক সন্দেহ নাই। (নিম্নে দেখুন)।

(১) কারণ হইতে সত্য কার্য্যোৎপত্তি 'পরিণাম'; যথা, দুগ্ধ হইতে দধির উৎপত্তি। কারণে মিথ্যাকার্য্য প্রতীতি 'বিবর্ত্ত,' যথা, রজ্জুতে সর্প প্রত্যক্ষ।

অবশ্য বেদান্ত প্রপঞ্চিত লীলাবাদ ও শক্তিবিক্ষেপবাদও সম্পূর্ণ যুক্তি-সঙ্গত নহে। লীলাবাদের বিরুদ্ধে এই আপত্তি হইতে পারে যে, ঈশ্বরের দিক হইতে জগৎ লীলামাত্র হইলেও, সৃষ্ট জীবের দিক্ হইতে ইহা পরম দুঃখের কারণ। ঈশ্বর যদি স্বপ্রয়োজনানুরোধেও নহে, কেবল মাত্র সামান্য ক্রীড়ার জন্যই জগৎ সৃষ্টি করিয়া অসংখ্য জীবগণকে এরূপ দুঃখ সাগরে নিমগ্ন করিতেছেন, তাহা হইলে তাঁহাকে পরমকরুণাময় বলা যায় কারূপে? ইহার উত্তরে বেদান্ত বলিয়াছেন যে, সৃষ্টি ঈশ্বরের দিক্ হইতে প্রয়োজনশূন্য হইলেও জীবের দিক হইতে তাহা নহে। সৃষ্টি জীবের কর্ম্মানুসারী। কর্ম্মফলের অমোঘ বিধান এই যে, ফলভোগেচ্ছু হইয়া 'সকাম কর্ম্মে' রত হইলে তাহার ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী, বর্ত্তমান জীবনেই অথবা পরবর্ত্তী জীবনে। কর্ম্মফলের ভোগ পরিসমাপ্ত না হইলে বারংবার জন্ম অনিবার্য্য, মুক্তিও নাই। তজ্জন্য কর্ম্মফলোপভোগের জন্যই ভোগাগার সংসার অত্যাবশ্যক। অতএব ঈশ্বর জীবের কর্ম্মানুসারেই সৃষ্টি করেন। এস্থলে পুনরায় প্রশ্ন হইতে পারে যে, পরবর্ত্তী সৃষ্টি অবশ্য পূর্ব্ববর্ত্তী অভুক্ত কর্ম্মোপভোগের জন্যই প্রয়োজন, কিন্তু সর্ব্বপ্রথম সৃষ্টির কারণ কি? ইহার পূর্ব্বে ত কোন সংসার সৃষ্ট হয় নাই, এবং জীবগণও সৃষ্ট হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় নাই। তাহা হইলে জীবগণের কর্ম্মক্ষয়ের কোনও প্রশ্নই তৎকালে ছিল না। তৎসত্ত্বেও ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিলেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বৈদান্তিকগণ "বীজাঙ্কুর ন্যায়ের" অবতারণা করিয়াছেন। বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে পুনরায় বীজ জন্মে। কিন্তু বীজই অঙ্কুরের পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ, অথবা অঙ্কুরই বীজের পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ এবং সর্ব্বপ্রথম বীজের কারণ কি, তাহা বলা অসম্ভব। তজ্জন্য বীজ ও অঙ্কুরের সম্বন্ধকে অনাদি সম্বন্ধ বলা ব্যতীত আর অন্য উপায় নাই। তদ্রূপ, কর্ম্ম হইতে সংসার, সংসার হইতে পুনরায় কর্ম্মের সৃষ্টি হয়। কিন্তু কর্ম্মই সংসারের পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ, অথবা সংসারই কর্ম্মের পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ, এবং সর্ব্বপ্রথম সংসার সৃষ্টির কারণ

কি, তাহা বলা যায় না। তজ্জন্য কর্ম্ম ও সংসারের অনাদি সম্বন্ধ। অবশ্য, ইহা প্রশ্নের সমাধান নহে, অজ্ঞতা স্বীকার মাত্র। যাহা হউক, লীলাবাদেও এইরূপ আপত্তি হইতে পারে।

শক্তিপ্রপঞ্চবাদে এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, শক্তির আকুঞ্চন ও প্রসারণে শক্তিমানের সত্তার বিকার বা পরিবর্ত্তন সাধিত হয় কি না? যাহা হউক, যদি স্থিতিবাদ গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে লীলাবাদই সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধীয় সর্ব্বোত্তম সমাধান বলিয়া মনে হয়। স্থিতিবাদ গ্রহণ করিলে জগৎ সৃষ্টির সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত ব্যাখ্যা একেবারেই সম্ভব কিনা, সে বিষয়ে অবশ্য যথেষ্টই সন্দেহের অবকাশ আছে। যাহা হউক, এই গূঢ় প্রশ্নের পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনার স্থান ইহা নহে।

স্থিতিবাদ (১) ব্যতীতও পরমেশ্বর সম্বন্ধীয় অপর একটী মতবাদ দৃষ্ট হয়। ইহার নাম গতিবাদ (২)। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে বিখ্যাত জার্ম্মাণ দার্শনিক হেগেল ইহার প্রপঞ্চনা করেন। গতিবাদ মতে, পরম সত্তা (The Absolute) নিত্য অপরিবর্ত্তনীয়, নিত্য পরিপূর্ণ সত্তা নহেন; উপরন্তু নিত্য গতিশীল, পরিবর্ত্তনভাগী ও পরিণামশীল। ঈদৃশ নিত্য ঘটনশীলতাই পরমসত্তার স্বরূপ। তিনি অপরিবর্ত্তনীয় সৎও (Being) নহেন; শূন্যগর্ভ অসৎও (Non-Being) নহেন, কিন্তু সৎ ও অসতের সমন্বয় স্বরূপ, অর্থাৎ ঘটনশীল (Becoming)। ঘটনশীলতায় সত্তা ও অসত্তার পরস্পর বিরোধের সমন্বয় ঘটে, কারণ ঘটনশীল বস্তু কেবল সৎও নহে কেবল অসৎও নহে, উভয়ের সমাহার। যথা, বীজ ঘটনশীল, অর্থাৎ ক্রমান্বয়ে অঙ্কুরে পরিণত হয়। এস্থলে, বীজ বীজরূপে সৎ, অঙ্কুররূপে অসৎ। কিন্তু বীজ শুধু বীজই নহে, অঙ্কুরেও অচিরে পরিণত হইবে। অতএব ইহা কেবল বর্ত্তমান বীজ নহে, ভবিষ্য অঙ্কুরও; কেবল সৎ নহে, অসৎও। বর্ত্তমানের ভবিষ্যতে পরিণতি

(১) Static Conception of God as Being. (২) Dynamic Conception of God as Becoming.

ঘটনশীলতার মূলকথা। সুতরাং, ঘটনশীলতা বর্ত্তমান সত্তা ও অবশ্যম্ভাবী অসত্তার সমাহার। এইরূপে, পরমসত্তা নিত্যঘটনশীল, নিত্যগতিমান্, নিত্য পরিণামী। ঈদৃশ গতিবাদ স্বীকার করিলে সৃষ্টি কার্য্যটী অনায়াসেই যুক্তিযুক্তভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়। অনভিব্যক্ত পরমসত্তা স্বভাবতঃই ক্রমান্বয়ে জগতে অভিব্যক্ত হন। ঈদৃশ অভিব্যক্তিই তাঁহার স্বরূপ বলিয়া, ইহা তাঁহার অসম্পূর্ণতা দ্যোতক নহে। বীজ অন্তর্নিহিত শক্তি বলেই অঙ্কুরে স্বভাবতঃই পরিণত হয়। সুতরাং বীজের অঙ্কুরে অভিব্যক্তি বীজ সত্তার অসম্পূর্ণতার পরিচায়ক নহে, কারণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, বীজ বীজই নহে শুধু ভবিষ্য অঙ্কুরও। অতএব বীজস্বরূপ=বর্ত্তমান্ বীজ+ভবিষ্য অঙ্কুর বলিয়া বীজ হইতে অঙ্কুর সৃষ্টি স্বভাবজ কার্য্য মাত্র। এইরূপে, অব্যক্ত সূক্ষ্ম পরমাত্মা স্বভাববশেই স্থূলজগতে ক্রমান্বয়ে প্রপঞ্চিত হইতেছেন বলিয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই উঠে না। জগৎসৃষ্টির ব্যাখ্যা রূপে, স্থিতিবাদ অপেক্ষা গতিবাদই শ্রেয়ঃ।

জীলী প্রপঞ্চিত মতবাদেও উক্ত গতিবাদের আভাস পাওয়া যায়। জীলীর মতেও সূক্ষ্ম অব্যক্ত পরমাত্মা স্বভাবতঃই ক্রমান্বয়ে স্থূল বিশ্বচরাচরে অভিব্যক্ত হন।[১] অতএব পরমাত্মার স্বভাবই সৃষ্টির কারণ, অভাব নহে। ইহা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী। কিন্তু ধর্ম্ম বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গীর দিক্ হইতে, জীলী ঈশ্বরের করুণাকেই জগৎসৃষ্টির কারণ বলিয়াছেন। করুণা, অভাব অথবা প্রয়োজন নহে, কিন্তু ক্রীড়ার ন্যায় পূর্ণতারই বাহ্যিক অভিব্যক্তি মাত্র।

অতএব, সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সূফীগণ ভিন্ন মত। সাধারণতঃ, পঞ্চবিধ উদ্দেশ্যের উল্লেখ বিভিন্ন সূফী মতবাদে পাওয়া যায়। যথা :— (১) মানবরূপ দর্পণে স্বীয় প্রতিচ্ছবি দর্শন দ্বারা আত্মজ্ঞান ও তজ্জনিত আনন্দ লাভেচ্ছা। (২) আত্মজ্ঞান ও তজ্জনিত আনন্দের অভাব না থাকিলেও,

১ "সৃষ্টি প্রক্রিয়া" পৃঃ ৫০ দেখুন।

মানবরূপ সাথীর দ্বারা পুনরায় ঈদৃশ জ্ঞান ও আনন্দ লাভেচ্ছা। (৩) পরিপূর্ণ আনন্দোচ্ছ্বসিত ক্রীড়া। (৪) স্বভাবজ অভিব্যক্তি। (৫) করুণা সূফী ৪২ ৪৩

সৃষ্টিপ্রক্রিয়া

হল্লাজের মতানুযায়ী সৃষ্টিপ্রক্রিয়া উপরে বিবৃত হইয়াছে। (পৃঃ ৪৪)—ইহাঁর মতে, ঈশ্বরের ত্রিবিধ অবস্থা—(১) অনভিব্যক্ত, স্বগতভেদহীন, নির্গুণ, শুদ্ধস্বরূপাবস্থা, (২) গুণ ও নামসমূহে অভিব্যক্ত স্বগতভেদাবস্থা, (৩) মানবরূপে অভিব্যক্ত স্বগতভেদাবস্থা।

জীলীর মতকে বিজ্ঞানবাদী সূফীগণের মতরূপে গ্রহণ করা যায়। জীলীর মতে, পরমাত্মা বিজ্ঞানস্বরূপ এবং জগৎ ঈশ্বরের জ্ঞানের অভিব্যক্তি মাত্র। সৃষ্টিপ্রক্রিয়া দ্বারা পরমাত্মা অভিব্যক্ত হন এবং স্বীয় সত্তাকে উপলব্ধি করেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, জীলীর মতে দ্রব্য ও গুণ অভিন্ন (পৃঃ ২৯)—সৃষ্টি পরমাত্মস্বরূপের গুণাবলীতে অভিব্যক্তি মাত্র এবং ঈদৃশ গুণাবলীর সমাহারই জগৎপ্রপঞ্চ। পুনরায় পরমাত্মস্বরূপের গুণাবলীতে অভিব্যক্তি পরমসত্তার আত্মজ্ঞানের নামান্তর মাত্র। পরমাত্মা স্বীয় সত্তাকে গুণাবলীতে অভিব্যক্ত করিয়া জগৎ সৃষ্টি করিতেছেন—ইহার অর্থ এই যে তিনি স্বয়ং স্বীয় স্বরূপকে জানিতেছেন। অতএব পরমাত্মা ও জগৎ পরস্পরাশ্রয়ী। আরবীও বলিয়াছেন, "ঈশ্বর আমাদের নিকট অত্যাবশ্যক—কারণ, আমাদের অস্তিত্ব ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে। আমরাও ঈশ্বরের নিকট অত্যাবশ্যক, কারণ আমাদের ভিতর দিয়াই ঈশ্বর নিজের নিকট নিজে প্রকটিত হইতেছেন।" সত্তা ও বিজ্ঞান পরস্পর অভিন্ন এবং জগৎসৃষ্টি সত্তার স্বরূপাভিব্যক্তি ও স্বরূপজ্ঞান বলিয়া, বিজ্ঞানই জগতের প্রকৃত উপাদান; জগৎ জড় নহে, বিজ্ঞানময়। জীলী জগতের বিজ্ঞানময়তার নিম্নলিখিত প্রমাণ দিয়াছেন :—

আমরা ঈশ্বরের স্বরূপ, গুণ ও নামে বিশ্বাস করি। এই রূপে, ঈশ্বর আমাদের বিশ্বাসেই আমাদের নিকট অভিব্যক্ত হন। কিন্তু বিশ্বাস স্বয়ং

বিজ্ঞান অথবা চিন্তাশ্রয়ী ; অর্থাৎ বিশ্বাস মানসিক ভাবনা অথবা চিন্তাবিশেষ। অতএব ঈশ্বর বিজ্ঞান অথবা চিন্তাতেই আমাদের নিকট অভিব্যক্ত হন। কিন্তু ঈশ্বরের অভিব্যক্তিই জগৎ। সুতরাং, জগৎও বিজ্ঞানে অভিব্যক্ত হয়। এতদ্রূপে, জগৎ বিজ্ঞানাশ্রয়ী ও বিজ্ঞানোদ্ভূত। বিখ্যাত পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক বার্কলির এবং বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদীর ন্যায় জীলীর মতে, জ্ঞান না থাকিলে জ্ঞেয় বস্তু থাকিতে পারে না। বস্তুতঃ, জ্ঞেয় বস্তু জ্ঞাতার জ্ঞানের সমাহার মাত্র। বস্তু গুণাবলীর সমষ্টি মাত্র, এবং গুণাবলী বিজ্ঞান বা চিন্তার সমষ্টিমাত্র। যথা —পুষ্প রক্তবর্ণ, সুগন্ধ, পেলবতা প্রভৃতি গুণের এক সমষ্টি, এবং এই সকল গুণ জ্ঞাতার সংবেদন (sensation) মাত্র—অর্থাৎ দর্শন, আঘ্রাণ ও স্পর্শনমাত্র। সংবেদন মানসিক ভাবনা সুতরাং, জ্ঞাতা না থাকিলে সংবেদন নাই, সংবেদন না থাকিলে গুণ নাই, গুণ না থাকিলে বস্তুও নাই। অতএব জ্ঞাতা না থাকিলে জ্ঞেয়বস্তুও নাই। বস্তু জ্ঞানমাত্র। কিন্তু বস্তুর অস্তিত্ব জ্ঞানের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করিলেও ঐ জ্ঞান ব্যক্তির জ্ঞান নহে, ঈশ্বরের জ্ঞান। বস্তু ব্যক্তির জ্ঞানাশ্রয়ী হইলে, যে সময় সেই ব্যক্তি বস্তুটাকে জানিতেছে না, সেই সময়ে বস্তুটাও অসৎ হইয়া যাইতেছে, ইহাই স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু পুষ্পটাকে আমি না জানিলেও সে বিদ্যমানই থাকে। অতএব, বস্তু ব্যক্তির জ্ঞানাশ্রয়ী নহে, ঈশ্বরের জ্ঞানাশ্রয়ী। ঈশ্বর সর্ব্বদাই সর্ব্ববস্তু জানিতে-ছেন এবং সেই জ্ঞানই বস্তুর অস্তিত্ব। সুতরাং, জীলীপ্রমুখ সূফীবিজ্ঞানবাদিগণ ব্যক্তি-বিজ্ঞানবাদী (Subjective Idealist) নহেন, পরাবিজ্ঞানবাদী (Objective Idealist)। জামীও বলিয়াছেন : "বুদ্ধিহীন দার্শনিকগণই কেবল জগৎকে মানসিক ভাবনামাত্র বলিয়া মনে করেন। জগৎ ভাবনা অথবা জ্ঞান নিশ্চয়ই, কিন্তু তাঁহারা সেই মহান্ জ্ঞাতাকে (ঈশ্বরকে) দেখিতে পান না।" জীলীর মতে, জগৎ ঈশ্বর অথবা 'পূর্ণমানবে'র জ্ঞানমাত্র। পূর্ণমানব ঈশ্বরের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি। তিনি জড়জগৎকে বিজ্ঞানস্বরূপ, অর্থাৎ ঐশ্বরিক গুণা-বলী সমষ্টিস্বরূপ এবং ঈশ্বর ও স্বীয় স্বরূপের সহিত অভিন্ন বলিয়া উপলব্ধি

করেন। সাধারণ মানব অবশ্য জগৎকে জড়রূপে এবং স্বীয় স্বরূপ হইতে ভিন্ন বলিয়াই মনে করেন।

জীলী সৃষ্টিপ্রক্রিয়াকে দর্শন ও ধর্ম্ম উভয় দিক্ হইতেই আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে তত্ত্ববিদ্যা বা দর্শনশাস্ত্রের (Ontology) দিক্ হইতে ঈশ্বরের ত্রিবিধ অবস্থা।

(১) প্রথম অবস্থা নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ, নিরপেক্ষ, শুদ্ধস্বরূপাবস্থা বা সত্তা মাত্র। ঈদৃশ শুদ্ধস্বরূপের আন্তর ও বাহ্যিক দুইটী দিক্ (aspect)।

(ক) আন্তর রূপের নাম "ঘনান্ধকার" (আল্ আমা)। এই অবস্থায় পরমাত্মা সম্পূর্ণরূপে স্বাত্মমগ্ন, সম্পূর্ণরূপে অনভিব্যক্তস্বরূপ, সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ ও সম্বন্ধবিহীন। অর্থাৎ এই অবস্থায় তিনি অতি সূক্ষ্মাবস্থ, অব্যক্ত-স্বরূপ বলিয়া স্বীয় সত্তার সহিতও সম্বন্ধবিহীন। তাঁহার জ্ঞেয়বস্তু কিছুই নাই, এবং তিনি কিছুই জানিতেছেন না। সাংখ্যবর্ণিত প্রলয়কালীন 'প্রকৃতি', বা 'প্রধানে'র ন্যায় তিনি ভবিষ্য সৃষ্টির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বীজমাত্ররূপে বর্ত্তমান থাকেন, বাস্তবরূপে নহে। (খ) বাহ্যিকরূপের নাম "নিরংশসত্তাজ্ঞান" (আহাদিয়াহ্)। এই অবস্থায় শুদ্ধস্বরূপ পরমাত্মা নিজেকে নিজে জগদ্‌বহির্ভূত সত্তারূপে জানেন। অর্থাৎ শুদ্ধসত্তা জ্ঞাতারূপে জ্ঞেয়রূপ স্বীয় শুদ্ধসত্তারই সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট।

এই প্রথম অবস্থা পরমেশ্বরের কেবল, অনভিব্যক্ত অবস্থা। এই অবস্থায় আন্তররূপে তিনি সূক্ষ্ম বীজমাত্র; বাহ্যিকরূপে সূক্ষ্ম বীজমাত্র হইয়াও আত্মজ্ঞ। এই রূপদ্বয় পরস্পরবিরোধী হইলেও পরমাত্মসত্তায় সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হয়।

(২) দ্বিতীয় অবস্থা নিরংশ, স্বগতভেদবিহীন সত্তাবস্থা। এই অবস্থারও আন্তর ও বাহ্যিক উভয়রূপ। (ক) আন্তররূপের নাম "তৎ-ত্ব" (হুইয়াহ্)। এই অবস্থায়, কেবলসত্তা বহুবিরোধী রূপেই নিজেকে জানেন। (খ) বাহ্যিক-রূপের নাম "আমি-ত্ব" (অনিয়াহ্)। এই ক্ষেত্রে, কেবলসত্তা বহুর মূল-সত্যরূপেই নিজেকে জানেন।

এই দ্বিতীয় অবস্থাতেও, পরমেশ্বর অনভিব্যক্তস্বরূপ, কিন্তু আত্মজ্ঞ। আন্তররূপে তিনি "সে", অর্থাৎ বহুবিরোধী এক ; বাহ্যিকরূপে তিনি "আমি", অর্থাৎ বহু-আশ্রয় এক।

(৩) তৃতীয় অবস্থায়, পরমেশ্বর সাংশ অথবা স্বগতভেদবান্ সত্তা (আহদিয়াহ্)। এই অবস্থায় পরমেশ্বর নামরূপবিশিষ্ট জগৎপ্রপঞ্চে অভিব্যক্ত হন। সূক্ষ্ম বীজভাব পরিত্যাগ করিয়া তিনি স্থূল বাস্তবরূপে প্রকাশিত হন। তৎকালে সূক্ষ্মাবস্থার ঘনান্ধকার বিদূরিত হইয়া সত্তালোক উদ্ভাসিত হয়। অর্থাৎ, পরমেশ্বর ক্রমান্বয়ে আত্মজ্ঞান, নিরংশসত্তাজ্ঞান ও সাংশসত্তাজ্ঞান লাভ করেন। তিনি নিজেকে এক ও বহু উভয়রূপেই জানেন—এক বহুর সহিত অভিন্ন, বহু একের সহিত অভিন্ন।

জীলীর মত বহুলাংশে হেগেল প্রপঞ্চিত পরাবিজ্ঞানবাদ (Objective Idealism) এবং বিরোধসামন্বয়িক ক্রমবিবর্তনবাদের (Dialectical Evolution) সমতুল। প্রথমাবস্থায়, শুদ্ধস্বরূপমাত্র পরমসত্তায় জ্ঞেয়শূন্য আন্তররূপ ও সত্তামাত্রজ্ঞ বাহ্যিকরূপে পরস্পর বিরোধ বিদ্যমান। প্রথমরূপে তিনি অব্যক্ত বীজমাত্র সত্তা, জ্ঞেয়ও নাই, জ্ঞানও নাই। দ্বিতীয়রূপে তিনি অব্যক্ত বীজমাত্র সত্তা হইলেও, নিজেই জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা। এই বিরোধ দ্বিতীয় নিরংশসত্তাবস্থায় সমন্বয় প্রাপ্ত হয়। পুনরায়, দ্বিতীয় অবস্থাতেও বিরোধী রূপদ্বয়ের উদ্ভব হয়—আন্তর 'তৎ-ত্ব' রূপ ও বাহ্যিক 'আমি-ত্ব' রূপ। প্রথমরূপে তিনি বহু-বিরোধী, দ্বিতীয়রূপে তিনি বহুর আশ্রয়। এই বিরোধ তৃতীয় সাংশ সত্তাবস্থায় সমন্বিত হইয়া যায়। এই অবস্থায়, স্বরূপ গুণে এবং গুণ স্বরূপে প্রকটিত হয়, এবং গুণাবলীর পরস্পর প্রভেদ লোপ প্রাপ্ত হয়। এইরূপে অনভিব্যক্ত সূক্ষ্ম সত্তা ক্রমান্বয়ে প্রতি স্তরে বিরোধদ্বয়ের ভিতর দিয়াই সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হইয়া অভিব্যক্তি লাভ করে।

অতএব পরমাত্মার দ্বিরূপ—অনভিব্যক্ত এবং অভিব্যক্ত। অনভিব্যক্তরূপে তিনি নির্গুণ, শুদ্ধসত্তামাত্র ; অভিব্যক্তরূপে তিনি গুণাবলীর সমষ্টি মাত্র।

ঈদৃশ অনভিব্যক্ত শুদ্ধসত্তা অথবা কেবলাত্মার পূর্ণ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট অভিব্যক্তি 'ঈশ্বর' (আল্লাহ্ অথবা ইলাহিয়াহ্)। কেবলাত্মা নিরপেক্ষ, সম্বন্ধশূন্য, এবং স্রষ্টা নহেন, কারণ সেই অবস্থায় কিছুই সৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু ঈশ্বর সৃষ্টজগতের (আল্ খালাক্) স্রষ্টা (আল-হাক্)। ঈশ্বর কেবলাত্মার গুণসমষ্টি বলিয়া অদৃশ্য, কিন্তু তাঁহার কার্য্যাবলীই কেবল দৃষ্ট হয়। কেবলাত্মার তৃতীয় ও শেষ অবস্থা স্বগতভেদবান্ সত্তা, অথবা বহুর মধ্যে একত্ব (ওয়াহিদিয়াহ্)। কিন্তু ঈশ্বরাবস্থা (ইলাহিয়াহ্) একের মধ্যে বহুত্ব। অতএব প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরাবস্থা কেবলাত্মার তৃতীয়াবস্থার পরবর্ত্তী অবস্থা। অর্থাৎ, সৃষ্টিক্রম চতুর্ব্বিধ :—(১) অনভিব্যক্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বীজাবস্থা। (২) অনভিব্যক্ত স্বাত্ম-জ্ঞানাবস্থা। (৩) প্রথম অভিব্যক্ত বহুর একত্বাবস্থা[১]। (৪) দ্বিতীয় অভিব্যক্ত ঈশ্বরাবস্থা অথবা একের বহুত্বাবস্থা[২]। প্রথমাবস্থায় তিনি তমসাচ্ছন্ন অব্যক্ত সূক্ষ্ম শক্তিমাত্র। দ্বিতীয়াবস্থায় তিনি সাত্মজ্ঞানী অব্যক্ত সূক্ষ্মশক্তি। তৃতীয়াবস্থায় তিনি বহুর মূলীভূত এক। চতুর্থাবস্থায় তিনি একের পরিণতি বহু। তৃতীয় ও চতুর্থাবস্থায় প্রভেদ এই যে, তৃতীয়াবস্থায় তিনি পরমেশ্বর, চতুর্থাবস্থায় তিনি জগৎ। পরমেশ্বর ও জগৎ অভিন্ন, কিন্তু এক অভিন্ন সত্তাকে দুইটী বিভিন্ন দিক্ হইতেও গ্রহণ করা যায়। পরমেশ্বরের দিক্ হইতে একত্ব ও জগতের দিক্ হইতে বহুত্ব—একই সত্তার দুইটী বিভিন্ন রূপমাত্র।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, জীলীর মতে, দর্শনের দিক্ হইতে পরমাত্মার ক্রমবিবর্ত্তিত ত্রিবিধ অবস্থা। কিন্তু ধর্ম্মতত্ত্বের দিক্ হইতে তাঁহার মতে, ঈশ্বরের ক্রমবিবর্ত্তিত পঞ্চ অবস্থা। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই ক্রমের সহিত পূর্ব্বোক্ত দর্শনসম্মত ক্রমের কোনও সামঞ্জস্য নাই। যাহা হউক, পঞ্চক্রম নিম্নলিখিত রূপ :—(১) ঈশ্বর (ইলাহিয়াহ্) (২) নিরংশ একত্ব (অহাদিয়া) (৩) সাংশ একত্ব (ওয়াহিদিয়াহ্), (৫) কারুণ্য (রাহমানিয়া), (৫) ঐশ্বর্য্য অথবা প্রভুত্ব (রুব্বিয়াহ্)। ধর্ম্মের দিক্ হইতে ঈশ্বরই (আল্লাহ্) কেবলাত্মা

১ Unity in plurality. ২ Plurality in unity.

এবং সকল গুণের আধার। অতএব, ঈদৃশ সর্ব্বগুণোপেত ঈশ্বরের দ্বিতীয় নিরংশ একত্বাবস্থা দার্শনিক ক্রমের নিরংশ একত্বাবস্থার সমান হইতে পারে না, কারণ এই শেষোক্ত নিরংশ একত্বাবস্থা নির্গুণ অবস্থা। দর্শনের দিক্ হইতে পরমাত্মা পূর্ব্বে নির্গুণ, পরে সগুণ। ধর্ম্মের দিক হইতে ঈশ্বর সর্ব্বদাই সগুণ। অতএব পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মক্রমের নিরংশ একত্বাবস্থার অর্থ কেবল এই হইতেই পারে যে, ঈদৃশ অবস্থায় সর্ব্বগুণমণ্ডিত ঈশ্বর জীবজগদ্‌রূপে অভিব্যক্ত হন নাই। তৃতীয় সাংশ একত্বাবস্থাতেই ঈশ্বর জীবজগতে অভিব্যক্ত হন। চতুর্থ ও পঞ্চমাবস্থাকে প্রকৃতপক্ষে 'অবস্থা' বলা যায় না; ইহারা গুণাবলীর দ্যোতক মাত্র। কারুণ্য গুণই জগৎ সৃষ্টির মূলীভূত কারণ। করুণাবশবর্ত্তী হইয়াই ঈশ্বর স্বীয় স্বরূপকে বিশ্বচরাচরে অভিব্যক্ত করিয়া ইহাকে স্বীয় দর্পণ অথবা প্রতিচ্ছবিরূপে সৃষ্টি করেন। করুণাবশবর্ত্তী হইয়াই তিনি প্রতি অণুপরমাণুতে লীন হন। ঐশ্বর্য্যগুণ প্রভুত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি গুণের সমষ্টি।

অতএব জীর্ল৷ তত্ত্ববিদ্যা ও ধর্ম্মতত্ত্ব এই উভয় দিক্ হইতে দুইটী বিভিন্ন সৃষ্টিক্রমের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাদের তুলনা করিলে উভয়ের প্রভেদ সুস্পষ্ট হইবে। (১) দার্শনিকের নিকট প্রারম্ভে কেবলাত্মা শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ, নির্গুণ; পরে তাঁহার স্বরূপ গুণাবলীরূপে অভিব্যক্ত হইলে তিনি সগুণত্ব প্রাপ্ত হন। ভক্তের নিকট ঈশ্বর আদিকাল হইতে, শাশ্বতভাবে অনন্ত-কল্যাণগুণমণ্ডিত। (২) দার্শনিকের নিকট জীবজগৎ ঈশ্বরের গুণাবলীর নামান্তর মাত্র। অর্থাৎ, পরমেশ্বরস্বরূপের গুণাবলীতে পরিণতিই জগৎ সৃষ্টি। পরমাত্মার অভিব্যক্তি একবিধ, গুণাভিব্যক্তি অথবা জগদভিব্যক্তি; দ্বিবিধ, গুণাভিব্যক্তি এবং জগদভিব্যক্তি নহে। সুতরাং জগৎ পরমেশ্বরের সত্তাসম্ভূত, সত্তার পরিণাম ভিন্ন আর কিছুই নহে। ভক্তের নিকট, ঈশ্বর স্বীয় গুণ ও শক্তিবলে শূন্য হইতে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। জগৎ ঈশ্বরের স্বরূপাভিব্যক্তি বা গুণাবলীর সমাহার নহে; গুণাবলীর সাহায্যে শূন্য হইতে সম্ভূত মাত্র। (৩) দার্শনিকের নিকট অব্যক্তাবস্থ বীজরূপ আত্মার স্বরূপ

নিহিত শক্তিই সৃষ্টি অথবা অভিব্যক্তির কারণ (পৃঃ ৫১)। কিন্তু ভক্তের নিকট, ঈশ্বরের করুণাই জগতের কারণ। করুণাপরবশ হইয়াই ঈশ্বর জীব সৃষ্টি করিয়া তাহাতে স্বীয় স্বরূপ প্রকটিত করেন। (৪) দার্শনিকের নিকট, পরমতত্ত্ব পরিবর্ত্তনহীন, নিত্যপরিপূর্ণ স্থিতিশীল সত্তা (static) নহেন; নিত্য-অভিব্যক্তিশীল, নিত্য পরিণামী গতিশীল সত্তা (dynamic)। ভক্তের নিকট, ঈশ্বর শাশ্বত, অপরিবর্ত্তনীয়, নিত্যপরিপূর্ণ পুরুষোত্তম।

পরিশেষে, ইব্‌নুল আরবী ও জামীর মতের সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। আরবীর মতেও শুদ্ধসত্তা, অব্যক্তস্বরূপ পরমাত্মা স্বভাববশেই ক্রমান্বয়ে অভিব্যক্তস্বরূপ হন এবং পরিশেষে 'পূর্ণমানবে' পূর্ণ প্রকাশ লাভ করেন। তিনি ঈদৃশ অভিব্যক্তির পঞ্চবিধ স্তরের উল্লেখ করিয়াছেন :—(১) নির্গুণ—স্বরূপ, (২) গুণাবলী, (৩) কার্য্যাবলী, (৪) সামান্য, (৫) বিশেষ। প্রতি পরবর্ত্তী স্তর প্রতি পূর্ব্ববর্ত্তী স্তরের অনুরূপ বা প্রতিচ্ছবি। এতদ্‌রূপে পরম-স্বরূপ জ্ঞান, শক্তি, সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি গুণাবলীতে অভিব্যক্ত হয়; গুণাবলী হইতে সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্যের উদ্ভব হয়। প্রথম সৃষ্টি সামান্য (Universal) অথবা জাতি; দ্বিতীয় সৃষ্টি বিশেষ (Particular) অথবা ব্যক্তি। অর্থাৎ, প্রথমে 'গোত্ব', 'বৃক্ষত্ব' প্রভৃতি সাধারণ জাতি সৃষ্ট হয়; তৎপরে প্রথম গো, দ্বিতীয় গো প্রভৃতি বিভিন্ন গো'র উদ্ভব হয়—ইহাদের সকলেরই মধ্যে 'গোত্ব' বর্ত্তমান। জাতি ব্যক্তির দ্বারাই অভিব্যক্ত হয়; ব্যক্তি জাতিরই প্রতিচ্ছবি বা অনুরূপ। সামান্য বিশেষের আদিরূপ (Prototype) এবং বিশেষ সামান্যানুসারেই সৃষ্ট। একটী সাধারণ দৃষ্টান্তের সাহায্যে ইহা স্পষ্ট হইবে। কুম্ভকার একটী ঘট নির্ম্মাণ করিতে অভিলাষী। তাহার মনে, প্রথমে, ঘটটীর সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা আছে, এবং সেই ধারণা অনুসারেই সে তৎপরে নানাবিধ ঘটের সৃষ্টি করে—ঘটসমূহ তাহার ঘটসম্বন্ধীয় জ্ঞান, চিন্তা বা ধারণার বাহ্যিক প্রতিমূর্ত্তি মাত্র। অতএব ঘটজ্ঞান ঘটের পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ, ঘট ঘটজ্ঞানের পরবর্ত্তী মূর্ত্ত অভিব্যক্তি। এইরূপে, প্রত্যেক বস্তু

তৎসম্বন্ধীয় ধারণা হইতেই উদ্ভূত হয়। সুতরাং, সৃষ্টির প্রারম্ভে ঈশ্বরের মনে ভবিষ্য সৃষ্টি সম্বন্ধে ধারণা বা জ্ঞানের উদ্ভব হয়; এবং 'সামান্য' বা 'জাতি' এই সকল ঐশ্বরিক ধারণারই বাহ্যিক প্রতিচ্ছবি। অবশেষে ঈদৃশ 'সামান্য' বা জাতি অনুসারে তিনি 'বিশেষ' বা বিভিন্ন ব্যক্তি সৃষ্টি করেন। যথা,—তাঁহার মনে 'মানব' সম্বন্ধে ভাবনার উদয় হয়; এই ভাবনা অথবা চিন্তাই 'মানবত্ব' জাতি এবং এই জাতি অনুসারেই তিনি রাম, শ্যাম প্রভৃতি ব্যক্তির সৃষ্টি করেন।

অন্যান্য বিষয়ে বৈসাদৃশ্য থাকিলেও, সামান্য ও বিশেষের পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ে আরবীর মত প্রখ্যাত গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর মতানুরূপ। প্লেটোর মতেও, সামান্য[১] বিশেষের[২] আদিরূপ, বিশেষ সামান্যের প্রতিচ্ছবি।

জামীর মত বহুলাংশে আরবীর মতানুরূপ। জামীর মতে অব্যক্ত পরমাত্মার অভিব্যক্তি ষট্‌স্তরগত। যথা,—(১) নির্গুণ স্বরূপ, (২) সামান্য, (৩) বিশেষ, (৪) বস্তুর নাম ও স্থান, (৫) বস্তুর নানাবিধ রূপ, গুণ ইত্যাদি, (৬) ইহাদের নানা প্রকারভেদ। এইরূপে, নির্গুণ পরমাত্মা সর্ব্বপ্রথম নিজের নিকটই স্বীয় সত্তাকে অভিব্যক্ত করেন, অর্থাৎ ভবিষ্য জগতের আদিরূপ চিন্তা করেন; তৎপরে এই আদিরূপ বা 'সামান্য' অনুসারেই তিনি 'বিশেষ' বা বিবিধ বস্তু সৃষ্টি করেন; তৎপরে ক্রমান্বয়ে, বস্তুজাতের নাম, স্থান, বিবিধ রূপ, গুণ, কার্য্য প্রভৃতি সৃষ্টি করেন।

সংক্ষেপে,(১) বিজ্ঞানবাদী সূফীগণের মতে, অব্যক্ত সূক্ষ্ম পরমাত্মাই স্থূল বিশ্বপ্রপঞ্চে ক্রমান্বয়ে অভিব্যক্ত হন। এই মতানুসারে তাঁহাদিগকে পরিণাম-বাদীও বলা উচিত, কারণ অঙ্কুর যেরূপ বীজের তদ্রূপ জগৎ পরমেশ্বরেরই বাস্তব পরিণাম মাত্র।

(২) কিন্তু একই সঙ্গে তাঁহারা ইহাও বলিয়াছেন যে,ঈশ্বর শূন্য হইতে জগৎ সৃষ্টি করেন। তাহা হইলে, জগতে ঈশ্বর অভিব্যক্ত বা পরিণত হন কিরূপে?

(১) Intelligible world of Ideas. (২) Sensible world of objects.

শূন্য হইতে জগৎ সৃষ্টি করিয়া, তাহাতে তৎপরে স্বীয় স্বরূপ, গুণাবলী ও নামসমূহ অঙ্কিত করিয়া, তাহাকে স্বীয় দর্পণ বা প্রতিচ্ছবি করিলেও, তাহা ঈশ্বরস্বরূপের অভিব্যক্তি বা পরিণাম কদাপি নহে। এইমতে জগতের উপাদান কারণ (Material cause) শূন্য মাত্র, ঈশ্বর নহেন ; ঈশ্বর জগতের আকার কারণ (Formal cause) ও নিমিত্ত কারণ মাত্র। যথা,—মৃত্তিকা মৃণ্ময় ঘটের উপাদান কারণ, ডিম্বাকৃতি তাহার আকার কারণ। সুবর্ণ বলয়ের উপাদান কারণ, গোলাকৃতি ইহার আকার কারণ, ইত্যাদি। মৃত্তিকাপিণ্ড লইয়া কুম্ভকার তাহাকে ডিম্বের আকার প্রদান করে। ঈশ্বরও শূন্য হইতে জগৎ সৃষ্টি করেন স্বীয় গুণ ও নাম অঙ্কিত করিয়া, কিন্তু স্বীয় সত্তা হইতে নহে। সুতরাং, প্রথম মতানুসারে, জগৎ ঈশ্বরের পরিণাম ; এমন কি, পূর্ণ মানব ঈশ্বর হইতে অভিন্ন। দ্বিতীয় মতানুসারে, ঈশ্বর জগতের উপাদান নহেন। বিজ্ঞানবাদী সূফীগণের মতবাদ এই দিক্ হইতে অযৌক্তিক, কিন্তু তাঁহারা এই দোষ ক্ষালনের প্রচেষ্টা করেন নাই। উপরন্তু জগতের যে শূন্য হইতে উৎপত্তি তাহা আরবী, নাসাফী প্রভৃতি অল্পসংখ্যক সূফী ব্যতীত সকল সূফীই পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। কি কারণবশতঃ তাঁহারা এই মতবাদ এরূপ সজোরে প্রচার করিয়াছেন, তাহা নিম্নে আলোচিত হইবে। ("জগতের স্বরূপ" দেখুন। পৃঃ ৬৫)

সনাতন ইস্‌লামপন্থী কালাবাদীপ্রমুখ সূফীগণের মতে অবশ্য ঈশ্বরের উপাদানকারণত্বের সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই উঠে না। ঈশ্বর সম্পূর্ণ রূপে জগদ্‌-বহির্ভূত ও জগৎ হইতে ভিন্ন, এবং কেবল ইচ্ছা বলেই অসত্তা অথবা শূন্য হইতে জগৎ সৃষ্টি করিতেছেন। জগৎ ঈশ্বরের অভিব্যক্তি, পরিণাম, প্রতিচ্ছবি অথবা ঈশ্বর হইতে অভিন্ন কদাপি নহে।

বিজ্ঞানবাদী সূফীগণের নির্গুণ-সগুণবাদ বেদান্তে দৃষ্ট হয় না। বেদান্ত-মতে ব্রহ্ম সর্ব্বদাই নির্গুণ (শঙ্কর) ; অথবা সর্ব্বদাই সগুণ (রামানুজ প্রভৃতি) ; প্রথমে নির্গুণ, পরে সগুণ নহে (পৃঃ ৩১)। পুনরায়, সূফীগণের অসৎ-কার্য্যবাদও বেদান্তবিরোধী। সকল সম্প্রদায়ের বৈদান্তিকগণই এবং সাংখ্য-

গণ সৎকার্য্যবাদী। সৎকার্য্যবাদ মতে, সৃষ্টির পূর্ব্বেও কার্য্য সৎ, অসৎ নহে; উহা কারণেই প্রচ্ছন্ন থাকে। যথা, সর্ষপে তৈল, দুগ্ধে দধি ও বীজে বৃক্ষ নিহিত থাকে। তজ্জন্য সর্ষপ হইতেই কেবল তৈল উৎপাদিত হয়, জল হইতে নহে। সর্ষপ পেষণ করিলে তৈল নির্গত হয়, জল তুল্যরূপে পেষণ করিলে কিন্তু কিছুই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহার কারণ কি? কারণ এই যে, সর্ষপে তৈল পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান, জলে নহে। অতএব অসৎ অথবা শূন্য হইতে কার্য্যের সৃষ্টি নহে। অসৎকার্য্যবাদ মতে সৃষ্টির পূর্ব্বে কার্য্য সম্পূর্ণ অসৎ, সৃষ্টির পরেই তাহার সত্তালাভ হয়, পূর্ব্বে নহে। রামানুজ প্রভৃতি বৈদান্তিকগণের মতে জীব ঈশ্বরের চিৎ শক্তি ও জগৎ তাঁহার অচিৎ শক্তির পরিণাম। সৃষ্টির পূর্ব্বেও জীবজগৎ ঈশ্বরের সূক্ষ্ম চিদচিৎ শক্তিরূপে তাঁহাতেই লীন হইয়া থাকে; সৃষ্টিকালে প্রপঞ্চিত হইয়া বিশ্বচরাচরে পরিণত হয়। অতএব জগতের সৃষ্টি শূন্য অথবা অসৎ হইতে নহে, ঈশ্বরের চিরসৎ শক্তিদ্বয় হইতে। অতএব ঈশ্বরই জগতের উপাদান কারণ।

সংক্ষেপে সূফী মতবাদে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া সম্বন্ধে পাঁচটী প্রধান মতবাদ দৃষ্ট হয়:—(১) শূন্য হইতে নিমেষমধ্যে জগৎ সৃষ্টি (কালাবাধী প্রভৃতি)। (২) (ক) অব্যক্ত পরমেশ্বর, (খ) স্বীয় গুণসৃষ্টি অথবা জগৎসৃষ্টি। গুণ ও জগৎ সৃষ্টি একই প্রক্রিয়ার নামান্তর মাত্র। (জীলী)। (৩) (ক) অব্যক্ত পরমেশ্বর, (খ) স্বীয় গুণসৃষ্টি, (গ) জগৎসৃষ্টি। গুণসৃষ্টি ও জগৎসৃষ্টি একই প্রক্রিয়া নহে (হাল্লাজ)। (৪) (ক) অব্যক্ত পরমাত্মা, (খ) গুণসৃষ্টি, (গ) কার্য্যসৃষ্টি, (ঘ) সামান্যসৃষ্টি, (ঙ) বিশেষসৃষ্টি। (আরবী)। (৫) (ক) অব্যক্ত পরমাত্মা, (খ) সামান্যসৃষ্টি, (গ) বিশেষসৃষ্টি, (ঘ) নাম ও স্থানসৃষ্টি, (ঙ) নানাবিধ রূপ, গুণসৃষ্টি, (চ) নানা প্রকার ভেদসৃষ্টি (জামী)। অবশ্য স্থলে স্থলে একই মতবাদে দুই বা ততোধিক বিরোধী তত্ত্বের সমাবেশও পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু সাধারণ ভাবে উক্ত পঞ্চবিধ ক্রম স্বীকৃত হয়।

সূফী সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার সহিত বেদান্ত সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার তুলনা করিলে দেখা

যায় যে রামানুজ প্রভৃতি বৈদান্তিকগণের মতেও জীবজগৎ ঈশ্বরের চিৎ ও অচিৎ শক্তিদ্বয়ের অভিব্যক্তি বা বিক্ষেপ। প্রলয়ের পরে এবং সৃষ্টির পূর্ব্বে জীবজগৎ ব্রহ্মের সূক্ষ্মশক্তিরূপে ব্রহ্মেই লীন থাকে। ইহাই ব্রহ্মের কারণাবস্থা বা অনভিব্যক্ত অবস্থা। সৃষ্টিকালে চিৎ ও অচিৎ শক্তিদ্বয় অভিব্যক্ত হইলে জীব (আত্মা) ও জগৎ সৃষ্টি হয়। ইহাই ব্রহ্মের কার্য্যাবস্থা অথবা অভিব্যক্ত অবস্থা। অবশ্য কারণাবস্থাতেও ব্রহ্ম সগুণ, নির্গুণ নহেন। সূফীমতবাদের সহিত বৈষ্ণব বেদান্তের এই বিষয়ে প্রভেদ আছে। বৈষ্ণব বেদান্ত মতে, ব্রহ্ম পূর্ব্ব হইতেই সগুণ, এবং 'সৃষ্টি' অর্থ তাঁহার স্বরূপের গুণে অভিব্যক্তি নহে, তাঁহার অসংখ্য গুণ বা শক্তির মধ্যে দুইটির জীব ও জগতে অভিব্যক্তি মাত্র। তাঁহার চিৎশক্তি হইতে তৎক্ষণাৎ জীবাত্মার সৃষ্টি হয়। কিন্তু তাঁহার অচিৎ-শক্তি হইতে স্থূল জগৎসৃষ্টি ক্রমান্বয়ে হয়। বৈদান্তিকগণ এস্থলে সাংখ্যো-পদিষ্ট সৃষ্টিপ্রণালী গ্রহণ করেন। সংক্ষেপে বেদান্তোপদিষ্ট সৃষ্টিপ্রণালী নিম্নলিখিতরূপ। ব্রহ্মের অচিৎশক্তি বা 'প্রকৃতি' হইতে সর্ব্বপ্রথম 'মহৎ' ও মহৎ হইতে 'অহঙ্কারে'র সৃষ্টি হয়। সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে মন, রাজসিক অহঙ্কার হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও তামসিক অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্রের উৎপত্তি হয়। অবশেষে, পঞ্চ তন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূতের উদ্ভব হয়। স্থূল দৃশ্যমান জগৎ পঞ্চ মহাভূতের সমাহার। এই সকলের বিস্তৃত বিবরণী এস্থলে প্রদান করা সম্ভব নহে। শঙ্করও উক্ত সৃষ্টিপ্রক্রিয়া স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মতে মায়া-উপাধিবিশিষ্ট সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর হইতেই জগৎসৃষ্টি, নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে নহে। জীলীও বলিয়াছেন যে, অনভিব্যক্ত নির্গুণ কেবলাত্মা স্রষ্টা নহেন, সগুণ ঈশ্বরই কেবল স্রষ্টা। কিন্তু শঙ্করের সহিত জীলীর মূলগত প্রভেদ এই যে, শঙ্করের মতে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, ঈশ্বর ও জগৎ মিথ্যা। কিন্তু জীলীর মতে ঈশ্বর ও জগৎ নির্গুণ পরমাত্মার ন্যায়ই সত্য।

বিশ্বসৃষ্টি তত্ত্ব (Cosmology.)

বিজ্ঞানবাদী সূফীগণের মতে, নির্গুণ পরমাত্মা সগুণ ঈশ্বরে অভিব্যক্ত হইলে, ঈশ্বর ক্রমশঃ জগৎ সৃষ্টি করেন। সনাতনপন্থী সূফীগণের মতে, প্রথম হইতেই ঈশ্বর সগুণ ও জগৎস্রষ্টা। এস্থলে প্রশ্ন এই যে, ঈদৃশ সৃষ্টি-প্রণালী কিরূপ ?

নাসাফীর মতে, ঈশ্বরের সৃষ্টি দ্বিবিধ, অদৃশ্য ও দৃশ্য। অদৃশ্য, অজড় ও আধ্যাত্মিক জগৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিবরণী সম্ভব নহে। যাঁহারা সেই লোকবাসী তাঁহারাই কেবল এ সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জানেন। তাঁহারা চতুর্ব্বিধ—(১) দেবদূত। (২) ঈশ্বরের দ্বাররক্ষক। ইঁহারাই মানবসমাজে ঈশ্বরের বাণী প্রচার, কৃপা ও পুরস্কার বিতরণ করেন। মহম্মদই ইঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বোচ্চ। (৩) জীবজন্তু, বৃক্ষলতা ও ধাতব দ্রব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। (৪) সয়তান ও বিভিন্ন অপদেবতা।

দৃশ্য, পার্থিব, জড় জগতের অংশদ্বয় স্বর্গ ও মর্ত্ত্য। নয়টী স্বর্গ, আকাশ ও তারকাবৃন্দ লইয়া 'স্বর্গ'। পৃথিবী, চতুর্ভূত, বজ্র, বিদ্যুৎ ও বৃষ্টি, প্রাণী, উদ্ভিদ্ ও ধাতব দ্রব্য, সমুদ্র প্রভৃতি লইয়া 'মর্ত্ত্য'।

সৃষ্টির প্রারম্ভে, ঈশ্বর নিমেষমধ্যে স্বীয় স্বরূপ হইতে আদি ভূতের সৃষ্টি করেন। ইহার নাম "মহম্মদের আলোক" (নুরুল মুহম্মাদিয়া)। ইহাকে "লেখনী"ও বলা হয়, কারণ ইহা ঈশ্বরাদেশে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লিখিত অথবা সৃষ্টি করে। আদি ভূত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এবং ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধবদ্ধ। ইহার অপর নাম "বিশ্বজ্ঞান" (Universal Reason)। ইহা ভবিষ্য বিশ্ব সম্বন্ধে ঈশ্বরের জ্ঞানের মূর্ত্ত প্রকাশ (পৃঃ ৫৬)। ইহা সমগ্র জগতের আদিরূপ অথবা আদর্শ। আদি ভূত হইতে মৌলিক তত্ত্ব ; ইহা হইতে নব সংখ্যক স্বর্গ ; চতুর্ব্বিধ ভূতগ্রাম (পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ু) ; আকাশ ও তারকাদি জন্মে। সর্ব্বোচ্চ স্বর্গদ্বয় ব্যতীত অপর সপ্ত স্বর্গকে "পিতৃসপ্তক" ও চতুর্ভূতকে "মাতৃচতুষ্টয়" নামে অভিহিত করা হয়। উক্ত "পিতৃসপ্তক" ও "মাতৃচতুষ্টয়"

হইতে ধাতু, উদ্ভিদ্ ও জীবজন্তুর উদ্ভব হয়। ইহারা "সন্ততিত্রয়" নামে অভিহিত। পরিশেষে মানব সৃষ্টি হয়।

অতএব নাসাফীর মতে, বিশ্বতত্ত্ব নিম্নলিখিত রূপ :—
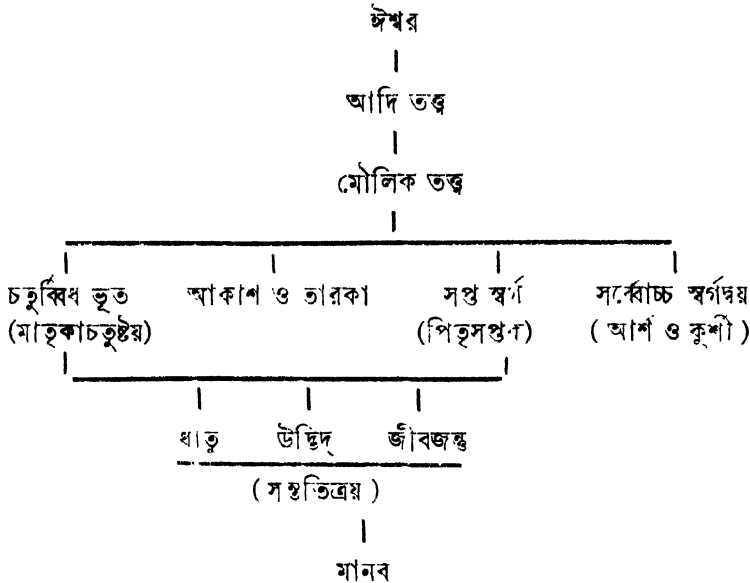
জীলীর মতে, সৃষ্টিক্রম নিম্নলিখিতরূপ :—অব্যক্ত পরমাত্মা স্বীয় স্বরূপ প্রকটীকৃত করিতে অভিলাষী হইয়া সর্ব্বপ্রথম স্বীয় নামের আলোক হইতে মহম্মদের আলোক সৃষ্টি করেন। ইহাই বিশ্ব-চরাচরের আদি ভূত। এই আলোকের উপর তিনি "সর্ব্বজয়ী দাতা" ও "করুণাময় ক্ষমাকর্ত্তা" এই নামদ্বয়ের জ্যোতিঃ বিকিরণ করিলে, উহা দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যায়; এবং ঈশ্বর দক্ষিণ অংশ হইতে অষ্টবিধ স্বর্গ ও বাম অংশ হইতে নরক সৃষ্টি করেন। পুনরায় তিনি, আদি ভূতের প্রতি পরিপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, তাহা তরলত্বপ্রাপ্ত হইয়া জলে পরিণত হয়। তৎপরে, তিনি ইহার প্রতি ঐশ্বর্য্যপ্রধানা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, উহা তরঙ্গ, ফেন ও বাষ্পরূপ প্রাপ্ত হয়। ফেনরূপ স্থূল

অংশ হইতে তিনি সপ্ত ভুবন ও তল্লোকবাসী ; এবং বাষ্পরূপ সূক্ষ্ম অংশ হইতে সপ্তস্বর্গ এবং তল্লোকবাসী দেবদূতের সৃষ্টি করেন। তৎপরে, তিনি জল হইতে ব্রহ্মাণ্ডপরিবেষ্টী সপ্ত-সমুদ্র সৃষ্টি করেন।

সপ্ত ভুবন নিম্নলিখিত রূপ :—

(১) জীবাত্মভুবন। ইহা মানবগণের আবাসস্থান। পূর্ব্বে ইহা দুগ্ধফেন-নিভ ছিল, কিন্তু আদমের পতনের পরে, ইহা ধূসর বর্ণ ধারণ করিয়াছে।

(২) ভক্তজন-ভুবন। ইহা ঈশ্বরবিশ্বাসী উপদেবতাগণের (জিন্) বাসভূমি, এবং মরকতমণি তুল্য হরিৎ বর্ণ। পৃথিবীতে যখন দিবস কাল, তৎকালে এই স্থানের রাত্রি কাল, এবং পৃথিবীতে যখন রাত্রি, ইহার তৎকালে দিবস কাল। রাত্রিকালে এই লোকবাসী উপদেবতাগণ পৃথিবীতে বিচরণ করে, এবং ভগবদ্‌ভক্তগণকে প্রায়শঃ পাপের পথে প্ররোচিত করিতে চেষ্টা করে।

(৩) ভূতজন-ভুবন। ইহা অবিশ্বাসী উপদেবতাগণের (জিন) বাসস্থান এবং জাফ্‌রান সদৃশ গাঢ় পীতবর্ণ। এই লোকবাসী উপদেবতাগণ মনুষ্যরূপ-ধারণ করিয়া পৃথিবীতে আগমন করে, এবং ভক্তগণকে উপাসনা প্রভৃতি হইতে বিরত করিতে চেষ্টা করে।

(৪) কামুকজন-ভুবন। ইহা সয়তানের (ইব্‌লিস) বংশধর নানা-বিধ পিশাচের আবাসস্থল, এবং গাঢ় রক্তবর্ণ।

(৫) অমিতাচারিজন-ভুবন। ইহাও নানাবিধ দানব প্রভৃতির বাসভূমি, এবং নীলবর্ণ। এই লোকবাসিগণও মানবগণকে নানা প্রকারে প্রলোভিত করিয়া পাপের পথে প্ররোচিত করে।

(৬) অধার্ম্মিকজন-ভুবন। ইহা ঘোরতর অবিশ্বাসী ও ঈশ্বরবিদ্রোহী অপদেবতাগণের (জিন্) আবাসভূমি, এবং রাত্রির ন্যায় ঘন কৃষ্ণবর্ণ।

(৭) ক্লেশসঙ্কুল-ভুবন। ইহা বৃহৎ সর্প ও বৃশ্চিকপূর্ণ।

সপ্তগ্রহ নিম্নলিখিত রূপ :—

(১) চন্দ্র। ইহা আদমের বাসভূমি, এবং রজতশুভ্র। (২) বুধ। ইহা

দেবদূতগণের আবাসস্থল, এবং ধূসরবর্ণ। (৩) শুক্র। ইহাও নানাবিধ দেবদূতগণের বাসস্থান, এবং পীতবর্ণ। (৪) সূর্য্য। ইহা অধিকাংশ ধর্ম্মপ্রবর্তকগণের আবাসভূমি। (৫) মঙ্গল। ইহা মৃত্যুদূতের নিবাস, এবং গাঢ় রক্তবর্ণ। (৬) বৃহস্পতি। ইহা করুণাদূতগণের আবাস ও নীলবর্ণ। (৭) শনি। ইহাই সর্ব্বপ্রথম মহম্মদের আলোক হইতে সৃষ্ট হয়, এবং ইহা কৃষ্ণবর্ণ।

স্বর্গ ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য ও নরক তাঁহার ঐশ্বর্য্য বা প্রভুত্বের চরম বিকাশ। স্বর্গ অষ্টবিধ। প্রথম স্বর্গলাভ পুণ্য কার্য্যের, ও দ্বিতীয় স্বর্গলাভ পুণ্য চিন্তা ও ভগবদ্‌বিশ্বাসের ফল। তৃতীয় স্বর্গ কেবলমাত্র ভগবৎপ্রসাদলভ্য এবং ইহা সকল ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ভুক্ত সাধুগণের প্রাপ্য। চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম স্বর্গ পবিত্রতার তারতম্যানুসারে নানাবিধ সাধুগণলভ্য। অষ্টম স্বর্গ (আর্শ) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বর্গ, এবং মহম্মদ ব্যতীত অপর কাহারও ইহাতে প্রবেশাধিকার নাই।

উপরিবিবৃত সূফীপ্রপঞ্চিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডবিবরণীর সহিত, ভারতীয় পুরাণোক্ত বিবরণীর তুলনা করা চলে। বৈদান্তিকেরা সাধারণতঃ এই পুরাণপ্রপঞ্চিত ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন। যথা, বিষ্ণু-পুরাণ বর্ণিত (২-৪) ব্রহ্মাণ্ডের বিবরণী। এই মতে, ব্রহ্মাণ্ড কপিত্থ ফলাকার, এবং চতুর্দ্দশ ভুবনের সমাহার। চতুর্দ্দশ-ভুবন নিম্নলিখিতরূপ :—

(১) ভূর্লোক। ইহা মনুষ্যাদির বাসভূমি। ইহা পদ্মাকার, এবং সপ্তসাগর পরিবেষ্টিত সপ্তদ্বীপময়। জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মা, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর—এই সপ্তদ্বীপ। ক্ষারোদকার্ণব, ইক্ষুরসার্ণব, সুরার্ণব, ঘৃতার্ণব, দধিমণ্ডোদকার্ণব, ক্ষীরার্ণব, মধুর জলার্ণব,—এই সপ্ত-সমুদ্র। প্রতি দ্বীপ সমবিস্তৃত সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত; এবং সমুদ্রও পুনরায় দ্বিগুণপ্রসারী দ্বীপ দ্বারা পরিবেষ্টিত, ইত্যাদি। যথা, জম্বুদ্বীপ ক্ষারোদকার্ণব দ্বারা পরিবেষ্টিত, এবং ক্ষারোদকার্ণব পুনরায় দ্বিগুণ বিস্তৃত প্লক্ষ দ্বীপ দ্বারা পরিবেষ্টিত।

(২) ভুবর্লোক। ইহা ভূর্লোকোপরি বর্ত্তমান, এবং পৃথিবী হইতে সূর্য্যমণ্ডল পর্যান্ত বিস্তৃত।

(৩) স্বর্লোক। ভূর্লোকোপরি চন্দ্র, নক্ষত্র, বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, ও সপ্তর্ষিমণ্ডল। ইহাদের উপরি ধ্রুবচক্র, এবং তাহারও উর্দ্ধে স্বর্লোক, ইন্দ্রের বাসস্থান।

(৪) মহর্লোক। ইহা স্বর্লোকোপরিস্থিত, এবং ভৃগু প্রভৃতি মুনিগণের আবাসস্থল।

(৫) জনলোক। ইহা মহর্লোকোপরিস্থিত, ও ব্রহ্মপুত্র সনৎকুমার প্রভৃতির বাসভূমি।

(৬) তপোলোক। ইহা মহর্লোকোপরিস্থিত ও বৈরাগিগণের নিবাস।

(৭) সত্যলোক অথবা ব্রহ্মলোক। ইহা সর্ব্বোচ্চ লোক, ও ব্রহ্মার আবাস স্থান।

পৃথিবীর উপরিস্থিত উক্ত সপ্তলোক ব্যতীত, পৃথিবীর নিম্নে স্থিত সপ্ত-লোকের নাম—অতল, পাতাল, বিতল, সুতল, তলাতল, রসাতল ও মহাতল। ইহারা প্রত্যেকে প্রত্যেকের নিম্নে স্থিত। এই সপ্তলোকের মধ্যে মধ্যে রৌরব প্রভৃতি একবিংশ নরক বিদ্যমান।

এই সকল লইয়া এক ব্রহ্মাণ্ড। বিশ্ব এরূপ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টি।

জগতের স্বরূপ

জগতের অনিত্যতা

অধিকাংশ সূফীই সনাতন ইস্‌লামধর্ম্মিগণের মতানুযায়ী জগৎকে সাদি ও সান্ত বলিয়া গ্রহণ করেন। বস্তুতঃ, তাঁহারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ঈশ্বর-সত্তাময়, ঈশ্বরস্বরূপের অভিব্যক্তি মাত্র বলিয়া বর্ণনা করেন; অথচ একই সঙ্গে তাঁহারা ইহাও বলেন যে, জগৎ অনিত্য, অসৎ বা শূন্য হইতে সৃষ্ট (পৃঃ ৫৮)। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে,সনাতন ইস্‌লামপন্থী সূফীগণের মতে, ঈশ্বর জগতের বহির্ভূত স্রষ্টা মাত্র, জগল্লীন নহেন, জগৎও ঈশ্বরস্বরূপের অভিব্যক্তি নহে, কিন্তু ঈশ্বর

হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সুতরাং এই সম্প্রদায়ভুক্ত সূফীগণই কেবল বলিতে পারেন যে, ঈশ্বর স্বীয় ইচ্ছাবলে শূন্য হইতে জগদুৎপাদন করেন। তিনি কেবল আজ্ঞা করেন, "সৃষ্ট হও" এবং তৎক্ষণাৎ জগৎ শূন্য হইতে সৃষ্ট হইয়া যায়। অতএব, জগৎ অনিত্য, অনাদি ও অনন্ত নহে। ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে এবং আজ্ঞাবলেই জগৎ কালক্রমে সৃষ্ট হয়; তাহার পূর্ব্বে ইহা সম্পূর্ণ অসৎ, শূন্য ছিল। সুতরাং একমাত্র ঈশ্বরই নিত্য ও শাশ্বত, জন্ম, মৃত্যু, ক্ষয়হীন—জগৎ নহে। কিন্তু বিজ্ঞানবাদী সূফী-গণের মতবাদ অযৌক্তিক। জগৎ যদি পরমেশ্বরের স্বরূপের মূর্ত্ত অভিব্যক্তিই হয়, এবং পরমেশ্বর যদি নিত্যস্বরূপই হন, তাহা হইলে জগৎকেও নিত্য বলিয়া স্বীকার করা ভিন্ন আর উপায় নাই। ঈশ্বরস্বরূপের অভিব্যক্তি অবশ্য নিত্য নহে, কারণ প্রথমাবস্থায় তিনি অব্যক্ত সূক্ষ্মশক্তি মাত্র, এবং জগদ্রূপে প্রকটীকৃত নহেন। কিন্তু অভিব্যক্তি নিত্য না হইলেও স্বরূপ নিশ্চয়ই নিত্য, কারণ অভিব্যক্তির অভাব স্বরূপকে ধ্বংসীভূত করিয়া শূন্যে পরিণত করিতে পারে না। সুতরাং, ঈশ্বরের অব্যক্ত অবস্থাতেও জগৎ তাঁহারই প্রচ্ছন্ন স্বরূপ-রূপে তাঁহাতেই লীন ছিল; পরে প্রকটীকৃত হইয়া স্থূলরূপ প্রাপ্ত হইয়া দৃশ্য হইয়াছে। অতএব, জগৎকে শূন্য হইতে সৃষ্ট সম্পূর্ণ নূতন বস্তুরূপে গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত নহে। উপরন্তু, জগৎ ঈশ্বরের শাশ্বতস্বরূপেরই অভিব্যক্তি বলিয়া স্বয়ং শাশ্বত—এই মতই সমীচীন। যথা, জামী বলিয়াছেন, "দৃশ্যরূপে, বাহ্যিকভাবে অভিব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে জগৎ সত্যস্বরূপের সহিত অভিন্নাত্মা ছিল; এবং অভিব্যক্তির পর সত্যস্বরূপ জগতের সহিত অভিন্নাত্মা হন।" তাহা হইলে, সৃষ্টির পরে যেরূপ জগৎ ঈশ্বরস্বরূপ, সৃষ্টির পূর্ব্বেও উহা সেইরূপই ঈশ্বরস্বরূপ ও ঈশ্বর হইতে অভিন্ন ছিল, শূন্য বা অসৎ নহে। অতএব, জগৎও যে ঈশ্বরেরই ন্যায় নিত্য, ইহা অবশ্যস্বীকার্য্য। এস্থলে সৃষ্টির প্রকৃত অর্থ, ঈশ্বরের শাশ্বতস্বরূপাভিব্যক্তি মাত্র, নূতন বস্তুর উদ্ভব নহে।

বিজ্ঞানবাদী সূফীগণের অধিকাংশই উক্ত অযৌক্তিক মতের প্রপঞ্চনা

করিয়াছেন। কিন্তু ইব্‌নুল আরবী প্রমুখ স্বল্প কয়েকজন মাত্র স্থফী জগতের নিত্যতা স্বীকার করিয়াছেন। আরবীর মতে, ঈশ্বর শূন্য হইতে জগৎ সৃষ্টি করেন নাই, কিন্তু স্বীয় জ্ঞান হইতে। সৃষ্টির পূর্ব্বেও জগৎ ঈশ্বরের জ্ঞানরূপে ঈশ্বরেই বিদ্যমান ছিল, পরে বাহ্যিকভাবে প্রপঞ্চিত হইয়া মূর্ত্ত হয়।

কিন্তু জীলী সজোরে এই মত ভ্রান্ত বলিয়া ঘোষণা করেন। জীলীর মতে, ঈশ্বর প্রথমে জগৎকে শূন্য হইতে স্বীয় জ্ঞানরূপে, এবং তৎপরে জ্ঞানরূপ হইতে বাহ্যিক মূর্ত্তরূপে সৃষ্টি করেন। স্নুতরাং জগৎ নিত্য নহে, অনিত্য। কিন্তু এস্থলে এই আপত্তি হইতে পারে যে, যদি বলা হয়, ঈশ্বর শূন্য হইতে জগৎকে জ্ঞানরূপে সৃষ্টি করেন, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, পূর্ব্বে ঈশ্বরের জগৎ সম্বন্ধীয় কোনরূপ জ্ঞান ছিল না, পরে তিনি সেই জ্ঞান লাভ করেন। কিন্তু ঈশ্বর সর্ব্বদাই সর্ব্বজ্ঞ—ঈদৃশ জ্ঞানাভাব তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। জীলী স্বয়ং উক্ত আপত্তির যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, এবং তজ্জন্য তিনি স্বয়ং উহার খণ্ডনার্থ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে, জগতের ত্রিবিধ অবস্থা—(১) অসত্তা অথবা শূন্যতা (২) ঈশ্বরের জ্ঞানস্বরূপত্ব, অথবা অব্যক্ত ঈশ্বরস্বরূপত্ব, (৩) অভিব্যক্ত ঈশ্বরস্বরূপত্ব, অথবা বাহ্যিক প্রকাশ। এস্থলে, তৃতীয় অবস্থা দ্বিতীয় অবস্থার পরবর্ত্তী, অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে কালগত পার্থক্য বিদ্যমান। প্রথমে জগৎ অব্যক্তস্বরূপ, তৎপরে তাহা অভিব্যক্ত স্বরূপ। কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থা প্রথম অবস্থার পরবর্ত্তী নহে। কারণ, যদি বলা হয়, প্রথমে জগৎ সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরবহির্ভূত ও অসৎ ছিল, তৎপরে ঈশ্বর তাহা স্বীয় জ্ঞানরূপে সৃষ্টি করেন, অর্থাৎ উহাকে জানিতে পারেন, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, কিছুকাল অন্ততঃ ঈশ্বর জগৎসম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না। কিন্তু ইহা অসম্ভব বলিয়া প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থার মধ্যে কালগত কোনোরূপ পার্থক্য নাই, কেবল ন্যায়ানুক্রমিক প্রভেদ আছে মাত্র। তত্ত্বের দিক্ হইতেই কেবল জগৎ প্রথমে অসৎ, পরে ঈশ্বরের জ্ঞানরূপে সৎ। কিন্তু কালের দিক হইতে ঈশ্বর সর্ব্বপ্রথম হইতেই সর্ব্বজ্ঞ। অর্থাৎ

আত্মজ্ঞানের সহিত জগৎবিষয়ক জ্ঞানও তাঁহার প্রথম হইতেই আছে, যদিও কেবল তিনিই নিত্য, জগৎ অনিত্য। ইহাই জীলীর মত। কিন্তু উক্ত মতবাদ কোনোরূপেই ন্যায়ানুমোদিত নহে। জগৎ অনিত্য, অথচ ঈশ্বরের জগদ্‌বিষয়ক জ্ঞান নিত্য; জগৎ প্রথমে অসৎ, অথচ প্রথম হইতেই ঈশ্বর জগৎকে জানেন—ইহা সম্ভব হয় কি প্রকারে? বস্তু নাই, তথাপি বস্তুর জ্ঞান হইতেছে, ইহা অতি অন্যায্য কথা। অতএব হয় বলিতে হয়, যে পূর্ব্বে অসৎ জগৎ সম্বন্ধে ঈশ্বরের জ্ঞানের অভাব ছিল; নয় বলিতে হয় যে, জগৎ কদাপি ঈশ্বরের জ্ঞানবহির্ভূত অথবা অসৎ ছিল না।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, (পৃঃ ৪৪) হাল্লাজের মতেও ঈশ্বর স্বীয় স্বরূপ, স্বীয় প্রেম ও আনন্দকে বাহ্যিক বা মূর্ত্তরূপে প্রত্যক্ষ করিতে ইচ্ছুক হইয়া শূন্য হইতে স্বীয় প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করিয়া তাহাকে স্বীয় গুণ ও নামে বিভূষিত করেন। কিন্তু উক্ত প্রতিচ্ছবি যদি ঈশ্বরের স্বীয় সত্তার মূর্ত্ত বিকাশই হয়, তাহা হইলে উহা শূন্য হইতে সৃষ্ট হইবে কিরূপে?

যাহা হউক, শূন্য হইতে জগৎ সৃষ্টি বিষয়ে কেবল সনাতন ইসলামপন্থী সূফীগণের মতবাদই যৌক্তিক, বিজ্ঞানবাদী সূফীগণের নহে। কিন্তু ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা সম্বন্ধে উভয় মতই তুল্য অযৌক্তিক। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, (পৃঃ ৩৬) সনাতনপন্থী সূফীগণের মতে ঈশ্বরের 'জগৎকে জানা' প্রভৃতি কার্য্যাবলী নিত্য, অথচ জগৎ অনিত্য এবং এই মতবাদের অযৌক্তিকতাও প্রদর্শিত হইয়াছে। বিজ্ঞানবাদী সূফীগণের এই বিষয়ে অযৌক্তিকতা উপরে আলোচিত হইল। উভয় মতেই ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা নিত্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, অথচ জ্ঞেয় জগতের নিত্যতা অস্বীকৃত হইয়াছে। ইহা ন্যায়ানুমোদিত নহে।

জগতের অনিত্যতা স্বমতবিরুদ্ধ হইলেও সূফীগণ কি কারণ বশতঃ উহা পুনঃ পুনঃ প্রপঞ্চনা করিয়াছেন সে সম্বন্ধে কোনও পরিষ্কার আলোচনা নাই। সম্ভবতঃ দুই নিত্য বস্তুর যুগপৎ অস্তিত্ব অসম্ভব বলিয়া তাঁহারা মনে

করিতেন। কিন্তু দুই সর্ব্বব্যাপী বস্তুর যুগপৎ অস্তিত্ব অসম্ভব হইলেও, দুই নিত্য বস্তুর সমকালীন অস্তিত্ব অসম্ভব নহে। যাহা হউক, প্রথমতঃ যদি সৃষ্টি কার্য্যটীই নিত্য বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে সৃষ্ট জগৎও নিশ্চয়ই নিত্য। দ্বিতীয়তঃ, যদি জগৎকে ঈশ্বরস্বরূপেরই অভিব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলেও জগতের নিত্যতা স্বতঃসিদ্ধ সত্য।

এই বিষয়ে, বেদান্তের সহিত সূফীমতবাদের প্রভেদ মূলগত। সকল সম্প্রদায়ভুক্ত বৈদান্তিকগণেরই মতে জগৎ ঈশ্বরেরই ন্যায় নিত্য। সৃষ্টির পূর্ব্বেও জীবজগৎ অসৎ নহে, কিন্তু ঈশ্বরের চিৎ ও অচিৎ সূক্ষ্মশক্তিদ্বয়রূপে ঈশ্বরেই প্রচ্ছন্ন থাকে; সৃষ্টিসময়ে ঈশ্বরকর্ত্তৃক প্রপঞ্চিত হইয়া নামরূপবিশিষ্ট বিশ্বচরাচরে মূর্ত্ত হয় (পৃঃ ৫৯ দেখুন)। দ্বৈতবাদী মধ্বের মতে অবশ্য জীব ও জগৎ নিত্য হইলেও ঈশ্বর হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

জগতের ক্রমবিবর্ত্তন

বিখ্যাত পারসিক্ সূফী রূমী জাগতিক ক্রমবিবর্ত্তনবাদের প্রপঞ্চনা করিয়াছেন। সাধারণতঃ সূফীদের মতে জগৎ ঈশ্বর হইতে ক্রমবিবর্ত্তিত হইলেও জগতের বিভিন্ন শ্রেণীর বস্তুসমূহ একই মূল বস্তু হইতে ক্রমবিবর্ত্তিত নহে, বিভিন্ন বস্তু হইতে প্রথম হইতেই পৃথক্ ভাবে উৎপন্ন। কিন্তু রূমীর মতে, জগতে নিম্নস্তরীয় বস্তু হইতে উচ্চস্তরীয় বস্তুতে, অসম্পূর্ণতা ও অল্পতর উৎকর্ষ হইতে সম্পূর্ণতা ও অধিকতর উৎকর্ষে, সরল হইতে জটিলে—একটী ক্রমবিবর্ত্তনের ধারা চলিয়াছে। এই মতবাদ ডারউইনের সুবিখ্যাত বিবর্ত্তনবাদের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। রূমীর মতে জগতে ক্রমান্বয়ে উচ্চ হইতে উচ্চতর শ্রেণীর উদ্ভব হইতেছে—জড়বস্তু, উদ্ভিদ্, পশুপক্ষী ও মানব। প্রতিক্ষেত্রে নিম্ন স্তরটী উচ্চস্তর দ্বারা উপভুক্ত হইয়া উচ্চস্তরে উন্নীত হইতেছে। জড়বস্তুই সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীগত, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ প্রাণ ও জ্ঞানহীন নহে, উপরন্তু ইহাই প্রাণ ও জ্ঞানের সর্ব্বনিম্ন অবস্থা। জড়বস্তু উদ্ভিদ্ কর্ত্তৃক উপভুক্ত হইয়া উদ্ভিদ্‌রূপ প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ বৃক্ষ লতা প্রভৃতি জড় মৃত্তিকা হইতে রস শোষণ

করিলে, সেই রস মৃত্তিকাস্বরূপ ত্যাগ করিয়া বৃক্ষের অংশরূপে পরিণত হয়। এইরূপে উদ্ভিদ্ জীবজন্তু প্রভৃতি কর্ত্তৃক উপভুক্ত হইয়া জীবরূপ ধারণ করে। অর্থাৎ অশ্বোপভুক্ত তৃণ, অশ্বের শরীরের অংশত্ব প্রাপ্ত হয়। পরিশেষে, মানবোপভুক্ত জীবজন্তু মানবরূপ ধারণ করে। এইরূপে জড়বস্তু হইতে উদ্ভিদে, উদ্ভিদ্ হইতে জীবজন্তুতে, জীবজন্তু হইতে মানবে প্রাণ ও জ্ঞানের ক্রমোন্নতি হইতেছে। কিন্তু ইহাই বিবর্ত্তনের পরিসমাপ্তি নহে। মানবও পুনরায় দেবদূতত্ব এবং পরিশেষে ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইতে সচেষ্ট। মানব স্বীয় সাধনাবলে দেবদূতসদৃশ গুণাবলী প্রাপ্ত হইয়া দেবদূতরূপ ধারণ করে, এবং সেই অবস্থা হইতে অবশেষে ঈশ্বর-স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হয়। অতএব, জড়বস্তু উদ্ভিদ্, জীবজন্তু, মানব, দেবদূত ও ঈশ্বর—ইহাই ক্রমবিবর্ত্তনের ক্রমোচ্চ ছয়টী স্তর। রূমী বলিয়াছেন, "আমি জড়রূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক উদ্ভিদ্‌রূপ প্রাপ্ত হইলাম। উদ্ভিদ্‌রূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জীবরূপ ধারণ করিলাম। জীবরূপ পরিহার করিয়া মানবরূপ গ্রহণ করিলাম। সুতরাং মৃত্যুর পরে নিম্নস্তর প্রাপ্তির আশঙ্কা আমার হইবে কেন? অতঃপর, আমি মানবরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেবদূতরূপ ধারণ করিব। তৎপরে, আমি দেবদূতরূপও ত্যাগ করিয়া অচিন্ত্যরূপ (ঈশ্বররূপ) পরিগ্রহ করিব।"

অবশ্য, রূমীর উক্ত বিবর্ত্তনবাদ বিজ্ঞানসম্মত নহে, এবং স্বমতবিরুদ্ধও। প্রথমতঃ রূমীর মতে উচ্চস্তরীয় বস্তু নিম্নস্তরীয় বস্তুকে স্বীয় সত্তার অন্তর্ভূত করিলেই নিম্নস্তরীয় বস্তু উচ্চস্তরস্বরূপ হয়। অর্থাৎ উচ্চস্তরের বস্তুটী প্রথম হইতেই বর্ত্তমান, নিম্নস্তরের বস্তু হইতে ক্রমবিবর্ত্তিত নহে। যথা,—উদ্ভিদ্ প্রথম হইতেই বর্ত্তমান এবং উদ্ভিদ্ কর্ত্তৃক উপভুক্ত হইলেই জড়বস্তু উদ্ভিদ্ স্তরে উন্নীত হয়। অতএব, উদ্ভিদ্ জড়বস্তু হইতে বিবর্ত্তিত অথবা সৃষ্ট নহে। দ্বিতীয়তঃ, জড়বস্তু হইতে উদ্ভিদে, উদ্ভিদ্ হইতে জীবজন্তুতে, জীবজন্তু হইতে মানবে ক্রমোন্নতির ক্ষেত্রে "উপভুক্তি" (assimilation) আক্ষরিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; কিন্তু মানব হইতে দেবদূতে, এবং দেবদূত হইতে ঈশ্বরে

ক্রমবিবর্ত্তনের ক্ষেত্রে ইহা রূপক অর্থে গ্রহণ করা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। তৃতীয়তঃ, ঈশ্বররূপ প্রাপ্তি অর্থ ঈশ্বরের সহিত একত্ব হইতে পারে না, কারণ রূমী স্বয়ং বলিয়াছেন যে মানব ঈশ্বরের গুণাবলী প্রাপ্ত হয় মাত্র, স্বরূপ নহে। (নিম্নে "ঈশ্বরের সহিত জীবজগতের সম্বন্ধ" দেখুন)। যাহা হউক, ত্রুটী-শূন্য না হইলে রূমীর মতবাদ স্ফীমতবাদে একটী অভিনব বস্তু এবং ভবিষ্য বিবর্ত্তনবাদের পরিস্ফুচক।

বেদান্তে ক্রমবিবর্ত্তনবাদের প্রপঞ্চনা নাই। জীব ও জগৎ একই ঈশ্বরসৃষ্ট হইলেও পরস্পর পৃথক্, এবং জীব জড়বস্তু হইতে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর জীব একে অপর হইতে ক্রমবিবর্ত্তিত নহে। কর্ম্মানুসারে অবশ্য জীব জন্মান্তর প্রাপ্ত হয়, এবং বিভিন্ন কলেবর ধারণ করে। কিন্তু এস্থলেও, কোনোরূপ ক্রম বা স্তর নাই। যথা, মানব পরজন্মে হঠাৎ বৃশ্চিকরূপ প্রাপ্ত হইতে পারে ; এবং বৃশ্চিকও হঠাৎ পরজন্মে মানবত্ব লাভ করিতে পারে।

জগতের সজীবত্ব

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, (পৃঃ ৬৯) রূমীর মতে জড়জগৎও সজীব ও চেতন। অন্যান্য কতিপয় স্ফীও এই মত সমর্থন করিয়াছেন। বস্তুতঃ, জগতের সজীবত্ব ঈশ্বরের জগল্লীনত্বেরই অবশ্যম্ভাবী ফলমাত্র। জামী বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর জগল্লীন বলিয়া, তাঁহার স্বরূপ প্রতি বস্তুর স্বরূপে, এবং তাঁহার গুণ প্রতি বস্তুর গুণে নিহিত হইয়া আছে। অতএব, জগতের প্রত্যেক বস্তুতেই প্রাণ, ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞান ও বল প্রভৃতি ঐশ্বরিক গুণাবলী বিদ্যমান আছে, অবশ্য বিভিন্ন পরিমাণে। বস্তুর উৎকর্ষ, অপকর্ষ অনুসারেই তাহার মধ্যে বিভিন্ন পরিমাণে ঐশ্বরিক সত্তা ও গুণাবলীর অভিব্যক্তি হয়। যথা—জড়, উদ্ভিদ্, পশুপক্ষী, মানব ও পূর্ণমানব ক্রমান্বয়ে উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরগত ; এবং সেই ক্রমানুসারে ইহাদের মধ্যে ঐশ্বরিক স্বরূপ ও গুণাবলীর অল্প হইতে অধিক বিকাশ হইয়াছে। যেরূপ মলিন দর্পণে সূর্য্য পূর্ণ প্রতি-ফলিত হইতে পারে না, তদ্রূপ নিম্নস্তরগত বস্তুতেও ঈশ্বর পূর্ণ প্রকটীকৃত

হন না। অবশ্য সকল সুফী সম্প্রদায় জগতের সজীবত্ব ও চেতনত্ব স্বীকার করেন না। সনাতন ইস্‌লামপন্থী সুফীগণের মতে, জগৎ ঈশ্বর হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, প্রাণহীন, অচেতন, জড়বস্তু মাত্র।

বেদান্ত মতেও জগতের সজীবত্ব স্বীকৃত হয় না। জীব ঈশ্বরের চিৎ-শক্তি এবং জগৎ তাঁহার অচিৎ-শক্তির বিকাশ; সুতরাং জীবই প্রাণবান্ ও চেতন, জগৎ নহে। অবশ্য ঈশ্বরকে জগল্লীন বলিয়া স্বীকার করিলে, জগৎকে সম্পূর্ণ অচেতন বলা দুঃসাধ্য। যাহা হউক, জৈনমতের সহিত উক্ত সুফীমতবাদের এই বিষয়ে বহুলাংশে সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। জৈনমতেও সমগ্র বিশ্বচরাচর সজীব ও সচেতন, অবশ্য বিভিন্ন পরিমাণে। এই ক্রমবিবর্দ্ধিত পরিমাণানুসারে জীবগণকে নিম্ন হইতে উচ্চস্তরে শ্রেণীবিন্যস্ত করা যায়। যথা—পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও উদ্ভিদ্‌গত জীবাত্মা। ইহারা সর্ব্বনিম্নস্তরীয়। ইহাদের কেবল স্পর্শশক্তিই আছে। তৎপরে শম্বুক প্রভৃতি (স্পর্শ ও আস্বাদশক্তিমান্); পিপীলিকা, জলৌকা প্রভৃতি (স্পর্শ, আস্বাদ ও ঘ্রাণশক্তিমান্); মধুমক্ষিকা, মশক প্রভৃতি (স্পর্শ, আস্বাদ, ঘ্রাণ ও দর্শনশক্তিমান্) এবং জীবজন্তু ও মানব (পঞ্চেন্দ্রিয়বিশিষ্ট) ক্রমোচ্চ-স্তরগত। 'জিন' অথবা জীবন্মুক্ত সাধুগণ সর্ব্বোচ্চ-স্তরগত এবং তাঁহাদের মধ্যেই কেবল জ্ঞান, বিশ্বাস, শক্তি ও আনন্দ এই অনন্ত চতুষ্টয় অথবা চতুর্ব্বিধ উৎকর্ষের পরিপূর্ণ বিকাশ হয়।

জগতের ক্ষণিকত্ব

ইবনুল আরবী, সাবিস্তরি, জামী প্রমুখ সুফীগণ গ্রীক্ দার্শনিক্ হেরাক্লাইটাস্ ও ক্ষণবাদী বৌদ্ধগণের ন্যায় ক্ষণবাদের প্রপঞ্চনা করেন। সাবিস্তরি বলিয়াছেন, "প্রতিক্ষণেই জগৎ অসৎ হইয়া যাইতেছে, ইহা দুই ক্ষণস্থায়ী নহে। তৎপরে, পুনরায় একটী নূতন জগতের সৃষ্টি হইতেছে।" জামীও বলিয়াছেন, "জগৎ প্রতি মুহূর্ত্তেই পরিবর্ত্তিত এবং নবসৃষ্ট হইতেছে। প্রতি নিমেষে একটী জগৎ ধ্বংসীভূত হইয়া যাইতেছে, এবং অপর এক সদৃশ জগৎ তাহার স্থান গ্রহণ করিতেছে, যদিও অধিকাংশ লোকই

ইহা সম্বন্ধে অজ্ঞ।" বস্তুতঃ, প্রত্যেক বস্তু নিরবচ্ছিন্ন পরম্পরানুক্রমিক বিভিন্ন অবস্থার সমষ্টিমাত্র। প্রতি মুহূর্ত্তে পূর্ব্বগুণ ও অবস্থা বিলয় প্রাপ্ত হইতেছে এবং তৎস্থলে অপর সদৃশ গুণ ও অবস্থার উদ্ভব হইতেছে। কিন্তু পুরাতন অবস্থার বিলয়ের পরে নূতন অবস্থার উদ্ভব এরূপ তড়িদ্গতিতে সম্পাদিত হইতেছে যে, নিত্য পরিবর্ত্তনশীল বস্তুটীকে স্থায়ী বলিয়া সকলে ভ্রমে পতিত হইতেছে। কিন্তু বস্তুর ঈদৃশ ক্ষণস্থায়িত্বের কারণ কি? জামীর মতে কারণ এই যে, জাগতিক সকল বস্তুই ঈশ্বর স্বরূপের অভিব্যক্তি। কিন্তু তিনি কদাপি স্বীয় সত্তাকে একই ভাবে দুইবার অভিব্যক্ত করেন না, উপরন্তু প্রতি মুহূর্ত্তেই নব নব অভিব্যক্তি দ্বারাই স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ করিতেছেন। অর্থাৎ, তিনি কদাপি উপর্য্যুপরি দুই মুহূর্ত্তে একই পার্থিব বস্তু এবং অবস্থাতে স্বীয় স্বরূপ প্রকটীকৃত করেন না, কিন্তু প্রতিক্ষণেই নব নব বস্তু ও অবস্থা সৃষ্টি করেন। ইহার কারণ এই যে, ঈশ্বরে সর্ব্বকরুণাময়ত্ব (জামাল্) ও সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব (জালাল্)—এই বিরোধী গুণদ্বয় নিত্য সক্রিয়। প্রতিক্ষণে ঈশ্বরের করুণা অভিব্যক্ত হইয়া বস্তু সৃষ্টি করিতেছে; পরক্ষণেই ঈশ্বরের শক্তি উহা ধ্বংস করিয়া ফেলিতেছে, কারণ 'বহু'কে ধ্বংস করিয়া 'একে'র একত্বকে রক্ষা করাই ঈশ্বরের শক্তির কর্ম্ম। পরমুহূর্ত্তেই ঈশ্বরানুগ্রহে পুনরায় পুরাতন ধ্বংসীভূত বস্তুর সদৃশ অপর একটী বস্তুর উদ্ভব হইতেছে; এবং ইহাও পরক্ষণে পূর্ব্ববৎ বিনষ্ট হইতেছে। এইরূপে, ক্রমান্বয়ে সৃষ্টি, ধ্বংস, নবসৃষ্টি, পুনর্ধ্বংস, ধারাবাহিক নিরবচ্ছিন্নভাবে চলিতেছে। প্রতি মুহূর্ত্তে মধুরস্বভাব ঈশ্বর সৃষ্টি করিতেছেন, এবং পরমুহূর্ত্তেই ভীষণস্বভাব ঈশ্বরই তাহা ধ্বংস করিতেছেন। অর্থাৎ প্রতিমুহূর্ত্তে ঈশ্বরস্বরূপ ক্রমান্বয়ে অভিব্যক্ত ও অনভিব্যক্ত হইতেছে। বলাবাহুল্য অধিকাংশ সূফীসম্প্রদায় ক্ষণবাদী নহেন।

বৌদ্ধ-ক্ষণবাদের সহিত অবশ্য সূফীক্ষণবাদের মূলগত পার্থক্য বিদ্যমান। বৌদ্ধমতে ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতি নিত্যবস্তু বলিয়া কিছুই নাই—অন্ততঃ আমরা ঈদৃশ নিত্যবস্তু সম্বন্ধে কিছুই জানি না। আমরা কেবল পরিবর্ত্তনের

নিরবচ্ছিন্ন ধারাই প্রত্যক্ষ করি, তৎপশ্চাতে কোনও নিত্যসত্তার বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কিন্তু সূফীমতে এক শাশ্বত অপরিবর্ত্তনীয় ঈশ্বরই জাগতিক সকল পরিবর্ত্তন ও ক্ষণস্থায়িত্বের মূল বা আশ্রয়। শাশ্বত পরমাত্ম-স্বরূপেরই অভিব্যক্তি বা অনভিব্যক্তি অনুসারে বস্তুর প্রতিক্ষণে উদয় ও বিলয় ঘটিতেছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মনস্তত্ত্ব

সূফীমতে, মানব জড়দেহেন্দ্রিয় ও অজড় আত্মার সমাহার। মানবই সৃষ্টির চরমোৎকর্ষ, মানবেই ঈশ্বরের সৃষ্টির পরিপূর্ণতা ও প্রকর্ষ, মানবই ঈশ্বর স্বরূপের পূর্ণ অভিব্যক্তি; কিন্তু জগৎ ঈশ্বরের আংশিক অভিব্যক্তিমাত্র। অতএব আংশিক প্রতিচ্ছবি জগৎও পূর্ণ-প্রতিচ্ছবি মানবের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ মানবরূপ ক্ষুদ্র জগতে (microcosm) বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপ বৃহৎ জগৎ (macrocosm) প্রতিফলিত হইয়া আছে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, (পৃঃ ৬১) বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দ্বিবিধ— অদৃশ্য, অজড় ও আধ্যাত্মিক ভবিষ্যৎ জগৎ ; এবং দৃশ্য, জড় ও পার্থিব বর্ত্তমান জগৎ। প্রথমটীকে "আজ্ঞাকৃত জগৎ" (আলাম্ ই আমর্) এবং দ্বিতীয়কে "সৃষ্টিকৃত জগৎ" (আলাম্ ই খাল্ক্) নামে অভিহিত করা হয়, কারণ প্রথমটী ঈশ্বরের আজ্ঞা "সৃষ্ট হও" হইতে একনিমেষে সম্ভূত, কিন্তু দ্বিতীয়টী পূর্ব্ববর্ত্তী আদিভূত হইতে ক্রমান্বয়ে সৃষ্ট। মানব বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিচ্ছবিরূপে অদৃশ্য ও দৃশ্য উভয় জগতেরই প্রতিরূপ ; এবং তজ্জন্য প্রতি জগতের পাঁচটী উপাদান প্রাপ্ত হইয়াছে। জড় জগৎ হইতে সে অগ্নি, জল, বায়ু, পৃথিবী এবং জড় আত্মা (নাফ্স্) প্রাপ্ত হইয়াছে। অগ্নি প্রভৃতি চতুর্ভূত তাহার জড়দেহের উপাদান কারণ। জড় দেহ ও জড় আত্মার সমাহারই মানবের পার্থিব স্বরূপ। অজড় জগৎ হইতে সে হৃদয় (কাল্ব্), আত্মা (রুহ্), প্রগাঢ় আধ্যাত্মিক জ্ঞানশক্তি (সির্), গভীরতর উপলব্ধিশক্তি (খাফী), এবং গভীরতম অনুভূতিশক্তি (আখ্ফা) প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহারা মানবের আধ্যাত্মিক স্বরূপ।

ইহারা পার্থিব জড়দেহের অংশ না হইলেও দেহান্তর্গত। হৃদয় বাম পার্শ্বে, আত্মা দক্ষিণপার্শ্বে, প্রগাঢ় আধ্যাত্মিক জ্ঞানশক্তি উভয়ের মধ্যস্থলে, গভীরতর উপলব্ধিশক্তি ললাটদেশে এবং গভীরতম অনুভূতিশক্তি মস্তিষ্কে (মতান্তরে বক্ষঃকেন্দ্রে) অবস্থিত।

উপরি উক্ত দশবিধ উপাদানে গঠিত মানব পৃথিবীর হইয়াও পৃথিবীর উপরে। অতএব পার্থিব স্বরূপকে বশীভূত করিয়া আধ্যাত্মিক স্বরূপের যথাযথ উন্নতিই মানবের প্রধান কর্ত্তব্য।

জড় আত্মাকে (নাফ্স্) সূফীগণ দেহেরই ন্যায় জড়বস্তুরূপে গ্রহণ করেন। সূফী সম্প্রদায়ে জড় আত্মার জড়ত্ব সম্বন্ধে বহু আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে। প্রবাদ যে, বহু সূফী তাঁহাদের স্বীয় জড় আত্মাকে নানাবিধ মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করিতে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। যথা, সাধনকালে জড় আত্মা কুকুর, শৃগাল, সর্প, ইন্দুর প্রভৃতি মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভক্তগণের পশ্চাদ্ধাবন করিত। মোহাম্মদ ইবন্ উলিয়ান্ নামক প্রখ্যাত সূফী বিবৃত করেন যে, একদা তাঁহার গলদেশ হইতে হঠাৎ একটী শৃগালশিশু নির্গত হয়; এবং ঈশ্বর-কৃপায় তিনি জানিতে পারেন যে, ইহাই তাঁহার জড় আত্মা। তিনি তৎক্ষণাৎ ইহাকে পদাঘাতে জর্জ্জরিত করেন, কিন্তু প্রতি পদাঘাতের সঙ্গে সঙ্গে ইহা বৃহত্তর হইতে থাকে। কথিত আছে যে, হাল্লাজের জড় আত্মাও কুকুররূপ ধারণ করিয়া তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইয়াছিল। জড় আত্মাই পাপের মূলীভূত কারণ। অতএব আধ্যাত্মিক জীবনের প্রারম্ভেই ইহাকে বশীভূত করা অত্যাবশ্যক। কোনও কোনও সূফীর মতে জড় আত্মা দেহেরই ন্যায় বস্তুবিশেষ। পুনরায়, কাহারও কাহারও মতে ইহা স্বতন্ত্র বস্তু নহে, প্রাণের ন্যায় দেহেরই গুণবিশেষ।

হৃদয় (কাল্ব্) ঈশ্বরস্বরূপের দর্পণতুল্য। জীলী ইহাকে "ঈশ্বরের সিংহাসন, মানবস্থিত ঈশ্বর-মন্দির, ঈশ্বর-জ্ঞানের কেন্দ্রস্বরূপ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। হৃদয়ে ঈশ্বরের সকল গুণ ও নাম প্রতিফলিত হয়। ত

একটী প্রখ্যাত জনশ্রুতি আছে; "স্বর্গ ও মর্ত্ত্য আমাকে ধারণ করে না, কিন্তু আমার বিশ্বস্ত ভৃত্যের হৃদয়ই আমাকে ধারণ করে।" ঈশ্বরস্বরূপ এবং জগৎস্বরূপ সম্বন্ধীয় জ্ঞানলাভই হৃদয়ের প্রধান কার্য্য। সাধারণতঃ হৃদয়কে হর্ষ, বিষাদ, ভয়, ক্রোধ, প্রেম প্রভৃতি ভাব অথবা অনুভবের কারণরূপেই গ্রহণ করা হয়। কিন্তু সূফীদের মতে, হৃদয় অনুভব (feeling) ব্যতীত জ্ঞানেরও (knowledge) কারণ। অবশ্য ঈদৃশ জ্ঞান সাধারণ বিচার-বুদ্ধিমূলক জ্ঞান নহে, ভগবৎ-প্রসাদলব্ধ সাক্ষাৎ উপলব্ধি (নিম্নে "সাধনমার্গের বিভিন্ন সোপান" দেখুন)।

হুজ্‌ৱিরির মতে আত্মা (রুহ্‌) গুণবিশেষ নহে, সূক্ষ্ম দ্রব্যবিশেষ, অর্থাৎ ইহা স্থূলদেহান্তর্গত সূক্ষ্মদেহমাত্র। নিদ্রাকালে অথবা মৃত্যুর পরে ইহা ঈশ্বরাজ্ঞায় স্থূল দেহ পরিত্যাগ করে। সংবেদন (sensation) ও অনুভব (feeling) যথাক্রমে দেহ ও জড় আত্মার গুণ, কিন্তু জ্ঞান সূক্ষ্ম আত্মার গুণ। প্রত্যক্ষ, স্মরণ, কল্পনা, বিচার, চিন্তা প্রভৃতি আত্মারই কার্য্য। জীলীর মতে, ঈশ্বর স্বীয় আলোক হইতেই আত্মা সৃষ্টি করিয়া ইহাকে সমগ্র বিশ্বের আদিভূত-রূপে ন্যস্ত করেন। অতএব আত্মা ও মহম্মদের আলোক (পৃঃ ৬১ দেখুন) অভিন্ন। কেবল পূর্ণ মানবই আত্মাকে জানিয়া ঈশ্বরস্বরূপকে উপলব্ধি করেন। হৃদয় ও আত্মা পরস্পর সদৃশ, কারণ উভয়েই ঈশ্বরের সমগ্র স্বরূপ প্রতিফলিত করে।

কোনও কোনও সূফীর মতে, হৃদয় (কাল্‌ব্‌), আত্মা (রূহ্‌) ও প্রগাঢ় আধ্যাত্মিক জ্ঞানশক্তির মধ্যে প্রভেদ এই যে, প্রথমটী ঈশ্বরকে জানে, দ্বিতীয়টী তাঁহাকে ভালবাসে, তৃতীয়টী তাঁহার ধ্যান করে।

জীলী আত্মা (রূহ্‌) এবং পবিত্র আত্মার (রূহুল্‌ কুদ্‌স্‌) মধ্যে পার্থক্য করিয়াছেন (নিম্নে "চতুর্ব্বিধ অধ্যাত্মালোক" দেখুন)। পবিত্র আত্মাই মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়। ইহা মানবে ঈশ্বরাত্মা ভিন্ন আর কিছুই নহে। হৃদয় ও আত্মা ঈশ্বরের স্বরূপ প্রতিফলিত করে, কিন্তু পবিত্র আত্মা স্বয়ংই

মানবান্তর্গত ঈশ্বরস্বরূপ। মানব সাধনমার্গের সর্ব্বোচ্চ সোপান অতিক্রম করিবার পরই পবিত্র আত্মালাভে ধন্য হয়, অর্থাৎ ঈশ্বরের সহিত স্বীয় একত্ব সাক্ষাৎ উপলব্ধি করে। পবিত্র আত্মা স্বয়ং ঈশ্বরাত্মা বলিয়া প্রকৃতপক্ষে নিত্য, তথাপি জীলীর মতে, মানবের পক্ষে ইহা অনিত্য ও ঈশ্বরসৃষ্ট, কারণ দুইটী নিত্যবস্তুর এককালীন অস্তিত্ব সম্ভবপর নহে।

জীলীর মতে আত্মার ক্রমোচ্চ পঞ্চ অবস্থা :—(১) স্থূল আত্মা। ইহা দেহ-পরিচালক। (২) আজ্ঞাকারী অথবা পাপ-প্ররোচক আত্মা। ইহা লোভ প্রভৃতি ষড়্রিপুর অধীন। (৩) প্রবুদ্ধ আত্মা। ইহা ঈশ্বর-কর্ত্তৃক পুণ্য-কর্ম্মে প্রয়োজিত হয়। (৪) অনুতপ্ত আত্মা। ইহা বিগত পাপের জন্য ভগবৎ কৃপাভিক্ষু হয়। (৫) শান্ত আত্মা। ইহা ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়াছে।

গাজালীর মতে, আত্মার পঞ্চবিধ অবস্থা নিম্নলিখিতরূপ :—(১) প্রত্যক্ষ-কারী আত্মা। ইহা ইন্দ্রিয় সাহায্যে বস্তু প্রত্যক্ষ করে। (২) স্মরণকারী আত্মা। ইহা প্রত্যক্ষদৃষ্ট বস্তু পরে স্মরণ করে। (৩) চিন্তাকারী আত্মা। ইহা জটিল তত্ত্বের চিন্তা করে। (৪) বুদ্ধি-বিচারী আত্মা। ইহা জ্ঞাত তত্ত্ব হইতে অজ্ঞাত-তথ্য অনুমান করে। (৫) ধর্ম্ম প্রচারকোপযোগী আত্মা। ইহা আত্মার সর্ব্বোচ্চ অবস্থা, এবং ধর্ম্মপ্রচারকগণই আত্মার ঈদৃশ অবস্থা লাভে ধন্য হন। গাজালীর মতে, মানবাত্মা আধ্যাত্মিক স্বরূপ, এবং ইহা দেহের সহিত যুক্তও নহে, দেহ হইতে পৃথকও নহে।

সাধারণতঃ, সূফীগণ আত্মার নিত্যত্ব, জন্মান্তরবাদ ও অবতারবাদ স্বীকার করেন না (নিম্নে দেখুন) রূমীপ্রমুখ অল্পসংখ্যক সূফী মাত্র জীবাত্মাকে ঈশ্বরের ন্যায় অনাদি, অনন্ত, নিত্য ও অজাতরূপে গ্রহণ করেন। রূমী বলিয়াছেন :—"সূফীর ঈশ্বর নাই, সে কাহারও দ্বারা সৃষ্ট হয় নাই।"

বেদান্তের সহিত সূফীমতের তুলনা করিলে উভয়ের পার্থক্য স্পষ্টীকৃত হইবে। বেদান্তমতে, জীব দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, বুদ্ধি ও আত্মার সমষ্টি। তন্মধ্যে দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ ও বুদ্ধি অচেতন 'প্রকৃতি'র কার্য্যরূপে জড়স্বভাব,

ও অচেতন আত্মাই একমাত্র অজড় ও চেতনস্বরূপ। দেহ দ্বিবিধ—স্থূল ও সূক্ষ্ম। মৃত্যুর পরে স্থূলদেহ ধ্বংসীভূত হয়, কিন্তু সূক্ষ্মদেহ স্বর্গে বা নরকে যথাযথ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া, নূতন স্থূল শরীরের সহিত সংযুক্ত হইয়া পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। মুক্তির পরে এই সূক্ষ্ম শরীরও ধ্বংসীভূত হইয়া যায়। ইন্দ্রিয় দ্বিবিধ—চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, এবং হস্ত, পাদ প্রভৃতি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়। মন অন্তঃকরণ, এবং চক্ষু প্রভৃতি বহিঃকরণের ন্যায় মনও অচেতন-স্বভাব। প্রাণ বায়ুর অবস্থাবিশেষ। শ্বাস, প্রশ্বাস প্রভৃতি প্রাণের ক্রিয়া। প্রাণ, অপান প্রভৃতি পঞ্চ প্রাণ। বুদ্ধি জড় অন্তঃকরণের ধর্ম্ম বলিয়া স্বয়ং জড়স্বভাব। দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি আত্মার উপকরণ, অথবা উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায়। আত্মার উদ্দেশ্য দ্বিবিধ—ভোগ, অথবা সংসারে গ্রহণ পূর্ব্বক কৃতকর্ম্মের ভোগ দ্বারা ক্ষয় ; এবং অপবর্গ, অথবা সংসারচক্র বা জন্মজন্মান্তর হইতে চিরমুক্তি। রামানুজ প্রভৃতি বৈদান্তিকগণের মতে, আত্মা সৎস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ ও জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞাতা, কর্ত্তা ও ভোক্তা। কিন্তু শঙ্করের মতে, আত্মা সচ্চিদানন্দস্বরূপ মাত্র, জ্ঞাতা, কর্ত্তা বা ভোক্তা নহে। সূফীগণের ন্যায় বৈদান্তিকগণও মানবকে জড়দেহ ও অজড় আত্মার সমষ্টি রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা জ্ঞান, উপলব্ধি ও অনুভূতিকে পৃথক্ তত্ত্বরূপে গ্রহণ করেন নাই—ইহারা আত্মারই স্বরূপ ও কার্য্য মাত্র, স্বতন্ত্র ও স্বাধীন শক্তি নহে।

আত্মার নিত্যতা সম্বন্ধে কিন্তু বৈদান্তিকগণ একমত। জগৎ যেরূপ ঈশ্বরের অচিৎশক্তিরূপে নিত্য, আত্মাও তদ্রূপ ঈশ্বরের চিৎশক্তিরূপে নিত্য। উপনিষদ্ বলিয়াছেন, আত্মার জন্ম, বৃদ্ধি, ক্ষয়, জরা, মরণ কিছুই নাই—ইহা শাশ্বত, অবিনশ্বর। দেহেরই জন্ম ও মৃত্যু হয়, আত্মার নহে। শঙ্করের মতে, আত্মা ব্রহ্মের চিৎশক্তিমাত্র নহে, স্বয়ংই ব্রহ্ম, অতএব নিত্য। কিন্তু মাত্র স্বল্প সংখ্যক সূফী আত্মার নিত্যত্বস্বীকার করেন। অধিকাংশের মতে, জীব-জগৎ ঈশ্বরের অভিব্যক্তি হইয়াও অনিত্য। (পৃঃ ৬৫ দেখুন)।

পূর্ণমানব বা সিদ্ধপুরুষ

পূর্ণমানববাদ সুফীমতবাদের মূল তত্ত্বগুলির অন্যতম। সনাতন ইস্‌লাম-পন্থী সুফীগণ ব্যতীত অধিকাংশ সুফীই ইহা গ্রহণ করিয়াছেন। প্রখ্যাত সুফী ইব্‌নুল আরবী প্রথম এই মতবাদ সুশৃঙ্খলভাবে প্রপঞ্চিত করেন, এবং সেই হইতে "পূর্ণ মানব" (আল্‌ ইন্‌সানুল কামিল্‌) এই শব্দটী একটী বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ, নির্ভেদ কেবলাত্মা ক্রমান্বয়ে গুণ, বিশেষ ও ভেদের রাজ্যে অবতরণ করেন। কিন্তু কেবলাত্মা এক ও অদ্বিতীয় স্বরূপ বলিয়া ভেদ ও বহুর রাজ্যে তিনি স্থায়িভাবে স্থিতি করিতে পারেন না, শীঘ্রই তাঁহাকে স্বীয় এক ও অদ্বিতীয় স্বরূপে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়। যথা, জল তুষারে পরিণত হয়, কিন্তু তুষারও শীঘ্রই জলরূপ ফিরিয়া পায়। কেবলাত্মা এইরূপে পৃথিবীতে অবতরণ করিয়া শীঘ্রই নিজের নিকটই পুনরায় আরোহণ করেন, এবং ঈদৃশ আরোহণ তিনি পূর্ণমানবের দ্বারাই সম্পাদিত করেন। পূর্ণমানবই ঈশ্বরের একমাত্র পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি। পৃথিবীর অন্যান্য বস্তু ঈশ্বরের কতিপয় গুণাবলী মাত্র অভিব্যক্ত করে। কিন্তু পূর্ণমানবেই ঈশ্বরের সমগ্র গুণাবলীর পূর্ণ প্রকাশ। পূর্ণমানবেই ঈশ্বর স্বীয় স্বরূপকে পূর্ণ প্রকাশিত করিয়া পূর্ণভাবে জ্ঞাত হন। অতএব পূর্ণমানবেই মানব ও ঈশ্বরের মিলন সংঘটিত হয়। পূর্ণমানব মানবদেহী ঈশ্বর—আকারে মানব, কিন্তু স্বরূপ ও গুণে ঈশ্বর। সৃষ্টির চরমোৎকর্ষ মানব, এবং মানবের চরমোৎকর্ষ পূর্ণমানব। পূর্ণমানব সাধনমার্গের সর্ব্বোচ্চ সোপান অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরের সহিত স্বীয় অভিন্নতা উপলব্ধি করিয়াছেন। ঈশ্বরানুগ্রহে, তিনি ঈশ্বরের সাক্ষাৎ দর্শন লাভে ধন্য হন, এবং জাগতিক সকল বস্তুরই বিষয়ে জ্ঞানলাভ করেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, শুদ্ধ একস্বরূপ পরমাত্মা নামরূপবিশিষ্ট জগৎপ্রপঞ্চে অভিব্যক্ত হইয়া পুনরায় পূর্ণমানবেই স্বীয় স্বরূপ ফিরিয়া পান। অতএব, ঈশ্বর হইতে মানবে, মানব হইতে পুনরায় ঈশ্বরে—একটী সম্পূর্ণ বৃত্ত। তজ্জন্য, মানবের পূর্ণমানবত্ব

লাভ করিয়া ঈশ্বরলাভের প্রচেষ্টাকে সূফীগণ ঈশ্বরের স্ব স্বরূপ পূর্ণ লাভের প্রচেষ্টা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন (নিম্নে "চতুর্ব্বিধ অধ্যাত্মালোক" দেখুন)।

পূর্ণমানবের কার্য্য দ্বিবিধ—জাগতিক ও নৈতিক। জাগতিক দিক্ হইতে, তিনি ঈশ্বরের সাক্ষাৎ প্রতিচ্ছবি, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের আদিরূপ, সকল বস্তুর সৃষ্টির কারণ আদিভূত, সমগ্র পৃথিবীর কেন্দ্র ও মেরুদণ্ড স্বরূপ (কুতব্) যাঁহার চতুর্দ্দিকে ইহা বিঘূর্ণিত হইতেছে। তিনিই ঈশ্বরের আদি চিন্তা, যদনুসারে সমগ্র বিশ্বচরাচর গঠিত হইয়াছে। পূর্ণমানব দ্বিরূপের সমন্বয়ঃ ঈশ্বর রূপ ("তৎ-ত্ব)" এবং মানব রূপ ("আমি-ত্ব")। এতদ্রূপে, জীলী ত্রিত্ববাদী (Trinity)। ঈশ্বর, পূর্ণমানব ও জগৎ, ঈশ্বরের এই ত্রিবিধ রূপ। ঈশ্বর স্বাধীন, স্বতন্ত্র সত্তা ; জগৎ পরাধীন, পরতন্ত্র সত্তা ; পূর্ণমানব এতদ্ব্যতীত তৃতীয় তত্ত্ব বিশেষ। এতদ্রূপে, আমরা বলিতে পারি যে, ঈশ্বর একস্বরূপ (কেবলাত্মা), অথবা দ্বিস্বরূপ (কেবলাত্মা ও জগৎ), অথবা প্রকৃতপক্ষে ত্রিস্বরূপ (কেবলাত্মা, পূর্ণমানব ও জগৎ)। জীলী বলিয়াছেন "যদি তুমি বল যে, ঈশ্বর একস্বরূপ, তাহা হইলে তুমি যথার্থই বলিয়াছ। অথবা, যদি তুমি বল যে তিনি দ্বিরূপ, তাহাও সত্য। যদি তুমি বল যে, না, তিনি ত্রিরূপ, তাহা হইলেও তুমি যথার্থই বলিয়াছ, কারণ ইহাই মানবের স্বরূপ।"

প্রত্যেক মানবেই পরিপূর্ণতা নিহিত রহিয়াছে, মানব স্বভাবতঃই সর্ব্ব-গুণোপেত। তজ্জন্য চরমোৎকর্ষ প্রতি মানবলভ্য নিশ্চয়ই। কিন্তু মানবের গুণ ও শক্তি প্রথমে অব্যক্তভাবেই নিহিত থাকে, তজ্জন্য স্বচেষ্টায় ইহাদের অভিব্যক্তি অত্যাবশ্যক। কিন্তু অতি স্বল্প-সংখ্যক মানবই অব্যক্ত পূর্ণতাকে অভিব্যক্ত করিয়া বাস্তব পূর্ণতা ও চরমোৎকর্ষ লাভ করে। ঈদৃশ স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তিগণ, যাঁহারা তাঁহাদের স্বভাবনিহিত পূর্ণতাকে বাস্তব উপলব্ধি করেন, তাঁহারা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ও সাধু নামে পরিচিত হন। ইঁহাদের মধ্যেও স্তরভেদ আছে। যিনি যে পরিমাণে স্বীয় স্বরূপকে বিকশিত করিয়া ঈশ্বরের আলোক-প্রাপ্ত হইয়াছেনও ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি সেই পরিমাণে

উচ্চ বা নিম্ন স্তরভুক্ত। অতএব সাধুগণকে ক্রমোচ্চ স্তরে বিভক্ত করা যায়। পূর্ণমানবই (কুতব্) সর্ব্বোচ্চ স্তরগত। জীলীর মতে, মহম্মদই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পূর্ণমানব বা দিব্যমানব। তজ্জন্য তাঁহাকে "মহম্মদের আলোক" (নূরুল মুহাম্মাদিয়াহ্) অথবা "মহম্মদের জ্ঞান" (আল্ হাকিকাতুল্ মুহাম্মাদিয়াহ্) নামে অভিহিত করা হয়। জীলী বলিয়াছেন যে, তিনি নানারূপ আকার ধারণ করিতে পারেন। তিনি বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সাধুগণের রূপ ধারণ করেন, এবং তত্তৎ নামে অভিহিত হন। তিনি জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বেও বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি ঈশ্বরের দর্পণ, ঈশ্বরও তাঁহার দর্পণ। জীলীর মতে, বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন সাধুগণ ঈশ্বর হইতে সাক্ষাৎ ভাবে "সত্তালোক"—ঈশ্বরের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ আলোক—প্রাপ্ত হন না, কিন্তু মহম্মদের নিকট হইতেই প্রাপ্ত হন। (নিম্নে "চতুর্ব্বিধ অধ্যাত্মালোক" দেখুন)।

নৈতিক দিক হইতে পূর্ণমানব অন্যান্য মানব ও ঈশ্বরের মধ্যে মিলনসেতু। তিনি মানবজাতির আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা ও পথপ্রদর্শক। একমাত্র তিনিই মানবকে ঈশ্বরের সহিত তাহার অভিন্নত্ব উপলব্ধি করাইয়া তাহাকে ঈশ্বরের নিকট লইয়া যাইতে পারেন। ঈশ্বর পূর্ণমানবের নিকটই তাঁহার স্বরূপ সাক্ষাৎ প্রকটিত করেন। তজ্জন্য ঈশ্বরের বাণী অন্যান্য মানবগণের নিকট প্রচারিত করিয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মপথে সাহায্য করা পূর্ণমানবেরই কার্য্য। অতএব পূর্ণমানব কেবল জগতের আদিভূতই নহেন, জগতের আধ্যাত্মিক নেতাও বটে। জীলী বলিয়াছেন যে, পূর্ণমানব ঈশ্বরের পূর্ণ অভিব্যক্তি হইলেও তিনি স্বীয় সত্তাকে ঈশ্বর হইতে ভিন্ন ও অভিন্ন, এবং ঈশ্বরকে অন্তর্য্যামী ও স্বীয় সত্তার অতিরিক্ত এই উভয়রূপেই উপলব্ধি করেন। ("ভক্তের ত্রিবিধ পর্য্যটন" দেখুন)।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হওয়া অসম্ভব নহে যে, সুফীগণের "পূর্ণমানব" শঙ্করের "জীবন্মুক্তের"ই তুল্য। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহাদের মধ্যে সাদৃশ্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্যই অধিক। প্রথমতঃ, জগৎ-সৃষ্টির দিক্ হইতে পূর্ণমানবের

একটী গুরুতর আবশ্যকতা রহিয়াছে, কারণ তিনিই ঈশ্বর হইতে প্রথম সৃষ্ট বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের আদি উপাদান। কিন্তু জীবন্মুক্ত তাহা নহেন। বেদান্তে স্থূল জগৎ-সৃষ্টির দিক্ ও আধ্যাত্মিক মুক্তির দিকের মধ্যে কোনরূপ সংমিশ্রণ নাই। যিনি মুক্ত তিনি জগতের আধ্যাত্মিক গুরু, সন্দেহ নাই; কিন্তু তিনি জগতের পার্থিব উপাদান কদাপি নহেন—'প্রকৃতি'ই সেইরূপ উপাদান। বিশেষরূপে, শঙ্করের জীবন্মুক্ত সমগ্র জগতের মিথ্যাত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহার নিকট সৃষ্টিই মিথ্যা, মায়ামাত্র। অতএব, তিনি স্বয়ং জগতের আদি উপাদান হইবেন কিরূপে? মিথ্যা জগতের আদি উপাদান মায়া অথবা অবিদ্যা, জীবন্মুক্ত নহেন। কিন্তু সূফী পূর্ণমানববাদে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক দিকের একটী অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ দৃষ্ট হয়। যিনি আধ্যাত্মিক দিক হইতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব, পার্থিব দিক্ হইতে তিনিই পুনরায় জগতের আদি ভূত। আধ্যাত্মিক দিক হইতে যিনি সর্ব্বশেষ—কারণ পূর্ণমানবত্ব লাভই জীবের চরম লক্ষ্য,—পার্থিব দিক হইতে তিনিই সর্ব্বপ্রথম (আদি ভূতরূপে) এবং সর্ব্বশেষ (মানবরূপে) উভয়ই (পৃঃ ৬১ দেখুন)।

দ্বিতীয়তঃ, পূর্ণমানব ঈশ্বরের পূর্ণ অভিব্যক্তি হইলেও স্বয়ং ঈশ্বর নহেন, ঈশ্বর হইতে ভিন্ন। জীলীও বলিয়াছেন যে, পূর্ণমানব ঈশ্বর হইতে ভিন্ন ও অভিন্ন উভয়রূপেই স্বীয় সত্তাকে উপলব্ধি করেন। কিন্তু শঙ্করের জীবন্মুক্ত ব্রহ্মের অভিব্যক্তি মাত্র নহেন, স্বয়ংই ব্রহ্ম। তিনি ব্রহ্মের সহিত স্বীয় অভিন্নত্ব পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারিয়াই বলেন, "অহং ব্রহ্মাস্মি"—"আমিই ব্রহ্ম।" ভগ্নঘটমধ্যস্থিত আকাশ ও মহাকাশে যেরূপ বিন্দুমাত্রও প্রভেদ নাই, তদ্রূপ অবিদ্যামুক্ত জীবন্মুক্তের সহিত ব্রহ্মেরও লেশমাত্র পার্থক্য নাই।

তৃতীয়তঃ, পূর্ণমানবও ঈশ্বরের দাস, সেবক ও উপাসক। ঈশ্বর ও পূর্ণমানবের মধ্যে নিত্য উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধ। কিন্তু জীবন্মুক্ত স্বয়ংই ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনার প্রশ্ন উঠে না, কারণ উপাস্য ও উপাসকের মধ্যে ভেদ থাকিলেই উপাসনা সম্ভবপর হয়।

চতুর্থতঃ, এতদুভয়ের গুরুতর প্রভেদ এই যে, পূর্ণমানব ঈশ্বরের সহিত স্বীয় অভিন্নতা উপলব্ধি করেন, প্রেমোন্মত্ত অবস্থায়, আকুল উন্মাদনায়, ভাবের প্রগাঢ় উচ্ছ্বাসে মাত্র, যে অবস্থায় স্থির জ্ঞানের সম্পূর্ণ বিলয় হয়। কিন্তু ঈদৃশ উন্মাদনা হইতে স্থৈর্য্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেই অভেদ উপলব্ধিও লোপ পায়, এবং ভিন্নাভিন্ন উপলব্ধির উদয় হয়। কিন্তু শঙ্করের জীবন্মুক্তের ব্রহ্মাভিন্নত্ব উপলব্ধি প্রেমমূলক নহে, জ্ঞানমূলক; ক্ষণস্থায়ী উচ্ছ্বাস বা উন্মত্ততা নহে, স্থির, স্থায়ী অনুভূতি। ("সূফী মরমিয়াবাদ" দেখুন)।

পঞ্চমতঃ, ঈদৃশ প্রেমোন্মত্ত মানব ঈশ্বরের সহিত ঐক্যোপলব্ধি করিলেও, জগৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন। সুতরাং, এই অবস্থায় তিনি উপদেশ প্রভৃতি কর্ম্মে রত হইতে পারেন না। (নিম্নে "মরমী ভক্তের ত্রিবিধ পর্য্যটন" দেখুন)। কিন্তু শঙ্করের জীবন্মুক্ত সর্ব্বদাই স্থির, ধীর, কর্ম্মোপযোগী।

অতএব সূফীগণের পূর্ণমানব ও শঙ্করের জীবন্মুক্ত এক নহেন। অবশ্য উভয়েই জগদ্‌গুরু ও আধ্যাত্মিক পথ-প্রদর্শক। কিন্তু, এ স্থলেও সূফী পূর্ণমানব ধর্ম্মগুরু, শঙ্করের জীবন্মুক্ত জ্ঞানগুরু। পূর্ণমানবের নিকট ধর্ম্ম, উপাসনা প্রভৃতি, কিন্তু জীবন্মুক্তের নিকট অভেদজ্ঞানই, চরম লক্ষ্য। সাধারণ ধর্ম্মাচার প্রভৃতি জীবন্মুক্তের নিকট মুক্তির প্রথম সোপান মাত্র, অধিক কিছুই নহে।

সাধারণতঃ, সাংখ্যগণ এবং জৈনগণও জীবন্মুক্তিবাদী। কিন্তু উভয়েই নিরীশ্বরবাদী। সাংখ্য জীবন্মুক্ত 'প্রকৃতি' অথবা জড়দেহ ও বস্তু হইতে 'পুরুষে'র অথবা 'আত্মার' পার্থক্য উপলব্ধি করিয়াছেন। জৈন জীবন্মুক্ত অনন্ত জ্ঞান, বিশ্বাস, বল ও আনন্দময়। কিন্তু কেহই বিশ্বের আদি উপাদান নহেন।

সাধু ও ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক

সূফীগণের মতে, সাধু ও ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণই পূর্ণমানব। সনাতন ইস্‌লাম-ধর্ম্মিগণের সুদৃঢ় মতানুযায়ী সূফীগণ সাধারণতঃ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক (নবী বা পয়গম্বর) ও সাধুগণের (ওয়ালি বা পীর) মধ্যে প্রভেদ করেন। সনাতন ইস্‌লাম-ধর্ম্মিগণের মতে, দ্বাদশজন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের মধ্যে মহম্মদ সর্ব্বশেষ ও সর্ব্ব-

শ্রেষ্ঠ১। তাঁহার পরে অপর কোনও ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের উদ্ভব হইতেই পারে না। অর্থাৎ, তাঁহার পরে ঈশ্বর অপর কাহারও নিকট স্বীয় স্বরূপ সাক্ষাৎ প্রকাশ, এবং স্বীয় বাণী সাক্ষাৎ প্রচার করেন নাই, করিবেন না, করিতে পারেন না। অতএব মহম্মদের পরবর্ত্তী অপরাপর সাধু ও ধর্ম্মগুরুগণ মহম্মদ প্রচারিত ধর্ম্মের ব্যাখ্যা ও প্রচার করিতে পারেন মাত্র, কিন্তু সাক্ষাৎ ঈশ্বর হইতে প্রত্যাদেশ বা বাণী প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া দাবী করিয়া নূতন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তনা করিতে পারেন না। তাঁহারা ধর্ম্ম প্রচারক, কিন্তু ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক নহেন। ইহাই সনাতন ইস্‌লাম-ধর্ম্মিগণের সুদৃঢ় অভিমত। কিন্তু সূফীগণ দাবী করেন যে, মহম্মদের পরেও, তাঁহারা ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসেন, এবং ঈশ্বর হইতে বাণী ও আলোক প্রাপ্ত হন। সনাতন ইস্‌লাম-ধর্ম্মিগণ অবশ্য এই বিষয়ে অত্যন্ত দৃঢ়মত, এবং তাঁহাদের মতে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকত্ব দাবী ঈশ্বরত্ব দাবীর ন্যায়ই সমান পাপ, অনাচার ও ধর্ম্ম-বিরোধী। তজ্জন্য অধিকাংশ সূফীগণই সনাতন ইস্‌লাম ধর্ম্মিগণের প্রবল বিরুদ্ধতা ও আপত্তি কিয়দংশে প্রশমিত করিবার জন্য বলেন যে, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ ও অন্যান্য সাধুগণ সকলেই সাক্ষাৎ ঈশ্বরের নিকট হইতে বাণী প্রাপ্ত হন, সন্দেহ নাই; তথাপি সাধুগণ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণের অপেক্ষা নিম্নস্তরীয়। কারণ, প্রথমতঃ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের সহিত ঈশ্বরের সংযোগ নিত্য; কিন্তু সাধুর সহিত ঈশ্বরের সংযোগ অল্প স্থায়ী মাত্র। দ্বিতীয়তঃ, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক স্থির, ধীর, শান্ত অবস্থায় নিত্য ঈশ্বরের বাণী প্রাপ্ত হন; এবং তজ্জন্য তিনি সেই বাণী ও তথ্য জগতে প্রচার করিতে পারেন। কিন্তু সাধু প্রেমোন্মত্ত অবস্থাতেই কেবল ঈশ্বরাদেশ প্রাপ্ত হন, এবং তজ্জন্য তিনি অপরকে সেই তথ্য সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিতে, বা উৎসাহিত করিতে সমর্থ নহেন। অতএব, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকই একমাত্র ঈশ্বরের দূত, সাধু নহেন। সাধু ঈশ্বরের বাণী প্রাপ্ত হইলে, তাহা তাঁহার

(১) অন্যান্য পূর্ব্বগামী ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণের নাম—নোয়া, এব্রাহাম, ইস্‌মেইল্, আইজাক্, জেকব্, জিসাস্, জব্, আরন্, সলোমন্ ও ডেবিড। কোরাণ ৪-১৬৩।

নিজের নিকটই আবদ্ধ হইয়া থাকে, জনসমাজে প্রচারিত হয় না ; এবং তিনি ধর্ম্মের প্রবর্ত্তকও হইতে পারেন না। অতএব ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক সাধু হইতে শ্রেয়ান্ ও উচ্চতর। উভয়েরই অদ্ভুত ঘটনা সংঘটন করিবার শক্তি আছে, কিন্তু সাধুর ঈদৃশ শক্তি তাঁহার স্বীয় অধীন নহে, ঈশ্বরাধীন ; এবং উন্মাদনাকালেই তিনি এই শক্তির অধিকারী হন। কিন্তু ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের ঈদৃশ শক্তি স্বায়ত্ত, এবং সর্ব্বকালস্থায়ী। তজ্জন্য কোনও কোনও সূফী 'পূর্ণমানব' ও 'দিব্যমানবের' মধ্যে পার্থক্য স্বীকার করেন। ইহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে (পৃঃ ৭০)। 'দিব্যমানব' মহম্মদ সৃষ্টির পূর্ব্বেও বর্ত্তমান ছিলেন, এবং সমগ্র সৃষ্টি তাঁহার দেহ ও আত্মার প্রতিচ্ছবি মাত্র। অন্যান্য 'পূর্ণমানব'গণ 'দিব্যমানব' মহম্মদের প্রতিনিধি মাত্র।

অধিকাংশ সূফীগণই এইরূপে স্বমতবিরুদ্ধভাবে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ও সাধুগণের ভিতর প্রভেদ স্বীকার করিয়াছেন। সূফীগণ নিজেরাই বলিয়াছেন যে, ক্ষুদ্র, মহৎ প্রত্যেক মানবই স্বয়ং ঈশ্বরের নিকট হইতে সাক্ষাদ্‌ভাবে বাণী প্রাপ্ত হইতে পারেন। তাহা হইলে, সেই ঐশ্বরিক বাণী জনসমাজে প্রচার কেন তাঁহারা করিবেন না? তাঁহারা যদি বাণীপ্রাপ্ত সাধুই হইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের বাণীপ্রচারক ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক হইতে আর বাধা কি? যাহা হউক, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কোনও কোনও সূফী ঈশ্বরের সহিত স্বীয় অভেদত্ব প্রচারে পরাঙ্মুখ নহেন, কিন্তু ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের শ্রেষ্ঠতাও তাঁহারা অকুণ্ঠিতভাবে স্বীকার করিয়াছেন। যথা—বায়াজিদ্ ঈশ্বরের সহিত স্বীয় অভেদত্ব পুনঃ পুনঃ সগৌরবে প্রচার করিয়াছেন। তাহা সত্ত্বেও তিনি বলিয়াছেন যে, নব্বই হাজার বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত অদৃশ্য জগতে পর্য্যটন করিবার পরে তিনি আবিষ্কার করেন যে, তাঁহার মস্তক ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকেরই পাদ-দেশে—অর্থাৎ সাধুর জ্ঞান ও শক্তির চরম সীমা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের জ্ঞান ও শক্তির প্রারম্ভ মাত্র ; এবং ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের জ্ঞান ও শক্তি নিঃসীম।

বিখ্যাত পারসিক সূফী রূমী অবশ্য ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ও সাধুর মধ্যে কোনরূপ

পার্থক্য করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক মানবই ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিতে পারে এবং তজ্জন্য দেবদূত বা ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকের সাহায্যের কোনই প্রয়োজন নাই। যিনি ঈশ্বরের সহিত স্বীয় অভিন্নত্ব পূর্ণ উপলব্ধি করিয়াছেন, যিনি ঐশ্বরিক গুণগ্রামে বিভূষিত হইয়াছেন, তাঁহাকে "সাধু"ও বলা যায়, "ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক"ও বলা যায়—উভয়ের অর্থ একই, ভিন্ন নহে।

ভারতীয় দর্শনেও সাধু ও ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের মধ্যে কোনরূপ ভেদ স্থাপন করা হয় নাই। যিনি পূর্ণ সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনিই ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকও হইতে পারেন, কোনও বাধা নাই। তজ্জন্যই ভারতে এরূপ অসংখ্য বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে। অধিকাংশ সূফীগণের মতে, ইস্‌লামের পরে আর নূতন কোনও ধর্ম্মের উদয় হইতেই পারে না, কারণ মহম্মদই শেষ ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, মহম্মদই শেষ ঈশ্বরের বাণী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, মহম্মদই জগতে শেষ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক। কিন্তু ভারতীয় দার্শনিক-গণের মতে, ঈশ্বরের সহিত মানবের সাক্ষাৎ সম্বন্ধেরও যেরূপ বিরতি নাই, তদ্রূপ জগতে নব নব ধর্ম্মেরও শেষ নাই। প্রত্যেক মানবই ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার নিকট হইতে প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইতে পারেন; এবং যদি ইচ্ছা করেন, তাহা মানব-সমাজে প্রচারও করিতে পারেন, নূতন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তনাও করিতে পারেন। ভারতীয় গুরুবাদ মানব ও ঈশ্বরের উক্ত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধের বিরোধী নহে। গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা ও গুরুর নিকট হইতে শাস্ত্রপাঠ ধর্ম্ম-জীবনের প্রথম সোপান মাত্র। গুরু ঈশ্বরের পথপ্রদর্শক মাত্র, স্বয়ং ঈশ্বর নহেন। যেরূপ শিশু শিক্ষকের নিকট হইতে বর্ণমালা প্রভৃতি শিক্ষা করিয়া, পরে স্বয়ং নানাবিধ পুস্তক পাঠ দ্বারা জ্ঞানলাভ করে, তদ্রূপ ধর্ম্ম-পিপাসু ব্যক্তিও সদ্‌গুরুর নিকট হইতেই আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রথম পাঠ গ্রহণ করে, এবং পরে স্বচেষ্টায় সাক্ষাৎ ঈশ্বরোপলব্ধি করে। শিক্ষকের সাহায্য ব্যতীত অক্ষর শিক্ষা করিতে পারে, এরূপ শিশু অতীব বিরল। তদ্রূপ, সদ্‌গুরু ব্যতীতও সাধারণ মানব শাস্ত্র-শিক্ষা করিতে সমর্থ হয় না।

তাহাদের জন্যই গুরুর সাহায্য প্রয়োজন। কিন্তু অসাধারণ মানবপক্ষে গুরূপসত্তি অত্যাবশ্যক নহে।

অবতারবাদ

পূর্ণমানবকে ঈশ্বরের অবতাররূপে গ্রহণ করা ভ্রম। হুজ্‌য়িরি কয়েকটী অবতারবাদী স্থফী সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়াছেন। হুজ্‌য়িরির মতে, হাল্লাজকে অবতারবাদীরূপে গ্রহণ করা অন্যায়, যদিও সনাতনপন্থী ইস্‌লামধর্ম্মিগণ তাঁহাকে অবতারবাদী বলিয়া বহু কটূক্তি করিয়াছেন। যাহা হউক, হাল্লাজের রচনাবলীর অংশ-বিশেষে তিনি অবতারবাদ স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়, অবশ্য তাঁহার স্বকীয় মত কি ছিল, তাহা নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন। যথা—একস্থলে হাল্লাজ বলিয়াছেন, "ঈশ্বর জয়যুক্ত হউন, যিনি মানবে স্বীয় ঐশ্বরিক-স্বরূপ প্রকাশ করেন। তৎপরে তিনি তাঁহার সৃষ্ট জীবগণের নিকট দৃশ্যভাবে পানভোজনকারী জীবের আকার ধারণ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন, যাহাতে তাহারা এক নিমেষেই তাঁহাকে দেখিতে পায়।" ইহা হইতে মনে করা অসম্ভব নহে যে, হাল্লাজের মতে, ঈশ্বর পানভোজনকারী দৃশ্য মানব-মূর্ত্তিতে অবতাররূপে পৃথিবীতে অবতরণ করেন।

যাহা হউক, সনাতনপন্থী ইস্‌লামধর্ম্মিগণের ন্যায়, অধিকাংশ স্থফীই অবতারবাদ গ্রহণ করেন নাই। যাঁহাদের মতে ঈশ্বর জগৎ হইতে বহিঃস্থিত মাত্র, জগল্লীন নহেন, এবং যাঁহাদের মতে তিনি জগল্লীন মাত্র, জগদতিরিক্ত নহেন—উভয় সম্প্রদায়ই অবতারবাদের সমান বিপক্ষে। ঈশ্বরবহির্ভূতত্ববাদিগণ বলেন যে, ঈশ্বর জীব ও জগৎ হইতে অত্যন্ত ভিন্ন বলিয়া, তিনি মানবরূপে অবতীর্ণ হইয়া জগতে স্থিতি করিতে পারেন না। অনিত্য মানবদেহ কি প্রকারে নিত্য পরমাত্মার আগার হইতে পারে? বিশ্বাত্মবাদিগণ বলেন যে, অবতারত্ব ঈশ্বর ও জীবের প্রভেদসূচক, কারণ এইমতে, ঈশ্বর মানবরূপ ধারণ করেন অর্থাৎ ঈশ্বর ও মানব ভিন্ন। প্রকৃতপক্ষে, ঈশ্বর ও মানব অভিন্ন—মানবই ঈশ্বর, ঈশ্বরের অবতারমাত্র নহে। জীলীর মতে, মানব

সাধনমার্গের শেষপ্রান্তে আরোহণ করিলে, ঈশ্বরের "সত্তালোক" প্রাপ্ত হয়। (নিম্নে "চতুর্ব্বিধ অধ্যাত্মালোক" দেখুন) এবং তৎকালে, ঈশ্বরাত্মা মানবাত্মার স্থলাভিষিক্ত হয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও, মানবকে ঈশ্বরের অবতাররূপে পরিগণনা করা যায় না, কারণ ঈশ্বরাত্মা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর হইতে পৃথক্‌ও হয় না, মানবের সহিত সংযুক্তও হয় না।

কিন্তু ভারতীয় দার্শনিকগণ অবতারবাদ স্বীকার করিয়াছেন। গীতায় [৪-৮] শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন: "সাধুগণের পরিত্রাণ ও দুরাচারগণের বিনাশ, ও ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করি।" বৈষ্ণব বৈদান্তিকগণ বহুবিধ অবতারের উল্লেখ করিয়াছেন—যথা—গুণাবতার, পুরুষাবতার, লীলাবতার, স্বরূপাবতার [অংশরূপ ও পূর্ণরূপ] প্রভৃতি। এই সকলের বিস্তৃত বিবরণ এস্থলে নিষ্প্রয়োজন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ঈশ্বরের সহিত জীবজগতের সম্বন্ধ ও মুক্তির স্বরূপ নির্ণয়

সূফীগণের মতে মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য দ্বিবিধ—অভাববোধক ও ভাববোধক। অভাবের দিক হইতে ইহার অর্থ ঈশ্বরে ক্ষুদ্র জীবসত্তার "আমিত্বে"র বিলয়, (ফানা) ; ভাবের দিক হইতে ইহার অর্থ ঈশ্বরে প্রকৃত জীবসত্তার সংস্থিতি (বাকা)। • "ধ্বংস" (ফানা) ও "স্থিতি" (বাকা) এই শব্দ দ্বয়ের প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে সূফীগণের মধ্যে বহু মতভেদ আছে। চারিটী প্রধান মত নিম্নে আলোচিত হইতেছে।

(১) কালাবাধী, হুজ্‌য়িরি, প্রমুখ সনাতনপন্থী সূফীগণের মতে "ধ্বংস" (ফানা) অর্থ এই নহে যে জীবের স্বরূপ অথবা "আমিত্ব" ঈশ্বরে বিলয় প্রাপ্ত হয় ; এবং "সংস্থিতি" (বাকা) অর্থও এই নহে যে, জীব ঈশ্বরের সহিত স্বরূপ অথবা গুণে অভেদত্ব প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বর ও মানব নিত্য ভিন্ন, এবং প্রভু ভৃত্যের সম্পর্কই উভয়ের নিত্য সম্বন্ধ। অতএব কালাবাধীর মতে "ধ্বংস"

শব্দের অর্থ, জগতের সহিত সকল সম্পর্ক ধ্বংস, অর্থাৎ জাগতিক বিষয়ে পরিপূর্ণ বৈরাগ্য মাত্র, অপর কিছুই নহে। ভক্তের আত্মার ধ্বংসের কোন-রূপ প্রশ্নই এস্থলে উঠে না। এই অবস্থাতেও ভক্ত পৃথক্‌সত্তাবান্‌ এবং সকল মনুষ্যোচিত গুণমণ্ডিতরূপেই স্থিতি করেন। কেবল তিনি অতঃপর কামনা-বাসনার শৃঙ্খলদ্বারা স্বীয় দেহ অথবা জগতের সহিত আবদ্ধ হইয়া থাকেন না। তাঁহার নিকট সুখ ও দুঃখ, ধন ও দারিদ্র্য, স্বর্ণ ও মৃত্তিকা সকলই সমান—সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার নিকট অর্থহীন। অতএব তিনি জগদ্বাসী হইয়াও জগতের নহেন। তজ্জন্য জগৎ তাঁহার নিকট ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং, "ধ্বংস" অর্থ মানবের স্বরূপধ্বংস নহে, জাগতিক বিষয়ে আসক্তির ধ্বংস। পুনরায় "স্থিতি" অর্থ ঈশ্বরের আজ্ঞাবহরূপে স্থিতি। এস্থলেও ঈশ্বরের সহিত মানবের স্বরূপ অথবা গুণাবলীর অভিন্নতার কোনরূপ প্রশ্নই উঠে না। অভিন্ন হওয়া দূরে থাকুক, মানব ঈশ্বরের সাদৃশ্যও লাভ করিতে কদাপি সমর্থ হয় না, কারণ সে ঈশ্বর হইতে চিরভিন্ন। অতএব "ধ্বংস" অর্থ পার্থিব বাসনাকামনার সম্পূর্ণ ধ্বংস অথবা জগতের প্রতি বৈরাগ্য ; "স্থিতি" অর্থ ঈশ্বরের ইচ্ছায় সম্পূর্ণ বশ্যতা ও ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ।

হুজ্‌য়িরির মতেও "ধ্বংস" (ফানা) অর্থ ঈশ্বরে আত্মার বিলোপ অথবা আত্মার স্বরূপ ও গুণাবলীর বিনাশ নহে। আত্মা দ্রব্যবিশেষ, এবং এক দ্রব্য অপর এক দ্রব্যে বিলয় প্রাপ্ত হইতেই পারে না। অতএব "ধ্বংস" শব্দের অর্থ স্বীয় সত্তা ও জগতের অপরিপূর্ণতা ও দোষালুতা সম্বন্ধে আত্মার জ্ঞান, স্বীয় সত্তা ও জগতের প্রতি আত্মার চরম বৈরাগ্য এবং আত্মার মনুষ্যোচিত গুণ ও কার্য্যাবলীর বিলোপ, স্বরূপের নহে। ভক্ত পার্থিব ভোগে শান্তি না পাইয়া, জাগতিক সুখে বীতস্পৃহ হইয়া পড়েন এবং তাঁহার মনে পরা বৈরাগ্যের উদয় হয়। তজ্জন্য তাঁহার সাধারণ মানবোচিত গুণাবলী ও কার্য্যাবলী—যথা, আসক্তি, অভিরুচি, স্বাতন্ত্র্যবোধ, সুখ, দুঃখ, প্রচেষ্টা ইত্যাদি তিরোহিত হয়। উক্ত মানবোচিত গুণাবলী জগৎ সম্বন্ধীয় গুণাবলী।

তজ্জন্য জগৎ তাঁহার নিকট অর্থহীন বলিয়া, জগৎ সম্বন্ধীয় গুণ ও কার্য্যাবলীও তাঁহার নিকট নিরর্থক হইয়া পড়ে। যথা, লোভনীয় বস্তু তিরোহিত হইলে লোভ ও প্রচেষ্টারও শেষ হয়। অতএব "ধ্বংস" অর্থ সকল জাগতিক গুণ ও কার্য্যাবলীর বৈরাগ্যজনিত নিবৃত্তিমাত্র, মানবের স্বরূপ ও গুণের নিবৃত্তি নহে। তজ্জন্য মানব হইয়াও তিনি সাধারণ মানববাচক বর্ণনার অতীত। দ্বিতীয়তঃ, "স্থিতি" (বাকা) অর্থ মানবে ঈশ্বরের স্থিতি নহে। অর্থাৎ ইহার অর্থ এই নহে যে, ঈশ্বর বস্তুতঃই মানবরূপে অবতীর্ণ হন এবং তাহার গুণাবলী প্রাপ্ত হন। ঈশ্বর ও মানবের স্বরূপের ঈদৃশ সংমিশ্রণ অসম্ভব। অতএব "স্থিতি', অর্থ ঈশ্বরে মানবের স্থিতি। অর্থাৎ মানবের মানবোচিত গুণ অথবা স্বতন্ত্র ইচ্ছা ও প্রচেষ্টার পরিসমাপ্তি সংঘটিত হইলে সে ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারেই স্থিতি করে এবং ঈশ্বর দ্বারাই সম্পূর্ণ পরিচালিত হয়। সংক্ষেপে "ধ্বংস" ও "স্থিতি"র অর্থ এই যে ভক্ত স্বতন্ত্র সত্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক ঈশ্বর দ্বারা চালিত হন।

হুজ্‌য়িরি এস্থলে অগ্নি ও লৌহের উদাহরণ প্রদান করিয়াছেন। লৌহ অগ্নির সহিত মিলিত হইলে অর্থাৎ অগ্নিতে লৌহ নিক্ষেপ করিলে, অগ্নি লৌহের স্বরূপ ধ্বংস করিতে পারে না, (কারণ লৌহ কদাপি অগ্নিতে পরিণত হয় না) কিন্তু কেবল লৌহের গুণেরই (যথা কঠিনত্ব, শীতলত্ব প্রভৃতি) পরিবর্ত্তন সাধন করে ; এবং তৎস্থলে স্বীয় গুণ (যথা তাপ, আলোক প্রভৃতি) লৌহে আরোপ করে। এই রূপে মানব ঈশ্বরের সহিত মিলিত হইলে, তাহার স্বরূপের কোনোরূপ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় না কিন্তু তাহার গুণাবলী (স্বতন্ত্র ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা) তিরোহিত হয় ; এবং তৎস্থলে ঈশ্বর স্বীয় গুণ (ইচ্ছা ও আদেশ) আরোপ করেন। এস্থলে এক বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। ইহা মনে করা ভ্রম যে, মানব ঐশ্বরিক গুণাবলী প্রাপ্ত হয়, যেরূপ লৌহ অগ্নির তাপ, আলোক প্রভৃতি গুণাবলী প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বর ও মানবের গুণবিষয়ে ঈদৃশ অভিন্নত্ব সম্বন্ধে কোনরূপ প্রশ্নই উঠে না। ঈশ্বর ও মানব স্বরূপ ও গুণ উভয় বিষয়েই সম্পূর্ণ ও চিরন্তনভাবে ভিন্ন। পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহাই

কেবল স্পষ্ট করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে, যেরূপ অগ্নি স্বীয় তাপরূপ গুণ লৌহে ন্যস্ত করে, এবং লৌহের স্বীয় শীতলতা রূপ গুণ নষ্ট করিয়া তাহাকে উত্তপ্ত করে, তদ্রূপ ঈশ্বরও স্বীয় গুণ, অর্থাৎ ইচ্ছা মানবের উপর আরোপ করেন এবং মানবের স্বীয় গুণ, অর্থাৎ স্বতন্ত্র ইচ্ছা ও স্বার্থপর আকাঙ্ক্ষা ধ্বংস করিয়া তাহাকে স্বীয় ইচ্ছাধীন করেন। এতদ্রূপে, মানব সর্ব্বদাই ঈশ্বরের দাসানুদাস, এবং তাঁহার স্বরূপ ও গুণের অংশী নহে, কিন্তু তাঁহার দ্বারাই শাসিত ও চালিত। ঈদৃশ ভগবদ্দাসত্ব উপলব্ধিই "ধ্বংস" ও "স্থিতির" প্রকৃত অর্থ।

সংক্ষেপে এই সম্প্রদায়ের স্থফীগণের মতে, ঈশ্বর ও মানব স্বরূপতঃ ও গুণতঃ চির ভিন্ন। "মুক্তি" অথবা ঈশ্বরের সহিত মিলন অর্থ (ক) পার্থিব আসক্তি সমূলে ধ্বংস এবং স্বতন্ত্র ইচ্ছা ও প্রচেষ্টার সম্পূর্ণ পরিহার (ফানা); (খ) ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ ও সর্ব্বাংশে তাঁহার আজ্ঞাধীন দাসরূপে অবস্থান (বাকা)।

(২) বিশ্বাত্মবাদিগণের মতে, ঈশ্বর ও মানব অভিন্ন, এবং মানব ঈশ্বরের গুণাবলীর সমাহার (পৃঃ ২১ দেখুন)। জীলী ঈশ্বর ও জগতের সম্বন্ধকে জল ও বরফের সম্বন্ধের তুল্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ঈশ্বর জল, জগৎ বরফ এবং এই রূপে উভয়ে অভিন্ন। যেরূপ জল বরফের উপাদান কারণ, তদ্রূপ ঈশ্বরই জগতের উপাদান কারণ। যেরূপ জমাট জলের প্রকৃত নাম 'জল' হইলেও 'বরফ' এই নামটী উহাতে সাময়িকভাবে প্রদত্ত হয়, তদ্রূপ জগতের প্রকৃত নাম "ঈশ্বর" হইলেও "জগৎ" এই নামটী উহাতে কেবল সাময়িক-ভাবেই প্রযোজিত হয়। জীলী বলিয়াছেন যে, প্রকৃতপক্ষে জীব ঈশ্বরের অবতার মাত্র নহেন, স্বয়ংই ঈশ্বর; ঈশ্বর জগল্লীন মাত্র নহেন, স্বয়ংই জগৎ। জগৎ ঈশ্বরের বাহ্যিক রূপ, অপর স্বরূপ, দর্পণ। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, (পৃঃ ২১) জীলীর মতে, তাঁহাদের মতবাদকে বিশ্বাত্মবাদ (Pantheism) বলা ভ্রম, কারণ উক্ত মতবাদানুসারে সমগ্র ঈশ্বর জগতে অন্তর্লীন, অর্থাৎ

ঈশ্বর ও জগৎ দুই ভিন্ন পদার্থ এবং একে অপরে নিহিত মাত্র। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে ঈশ্বর ও জগৎ অভিন্ন বলিয়া একে অপরে লীনত্বের কোনরূপ প্রশ্নই উঠে না। সুতরাং তাঁহাদের মতবাদকে "বিশ্বাত্মবাদ" (আত্মা বিশ্বে নিহিত) না বলিয়া, "একাত্মবাদ"ই (এক আত্মাই স্বয়ং বিশ্ব) বলাই সমীচীন।

যাহা হউক, উক্ত সূফীগণের মতে, জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলেও মিথ্যা মায়ামাত্র নহে। জগৎ ঈশ্বরের মূর্ত্ত অভিব্যক্তিরূপে ঈশ্বরেরই ন্যায় সত্য। যথা—বরফ জলেরই ন্যায় সত্য। এ সম্বন্ধে সূফীগণ অন্যান্য উদাহরণও প্রদান করিয়াছেন। যথা—সমুদ্রজল ও ঘটান্তর্গত জল (আত্তার), সমুদ্র ও তরঙ্গ (রূমী), গ্রন্থ ও গ্রন্থান্তর্গত পত্রাবলী, সূর্য্য ও গবাক্ষবর্ত্তী রশ্মি, এক ও দুই (দুইবার এক), তিন (তিনবার এক) প্রভৃতি সংখ্যা, সূত্র ও সূত্রস্থ গ্রন্থি ইত্যাদি। সমুদ্রের জল ও ঘটান্তর্গত জল, সমুদ্র ও তরঙ্গ, সূর্য্য ও রশ্মি প্রভৃতি অভিন্ন সন্দেহ নাই, কিন্তু ঘটান্তর্গত জল, তরঙ্গ, রশ্মি প্রভৃতি অসৎ বা মিথ্যা নহে, সত্য।

(৩) কোনও কোনও সূফী সম্প্রদায়ের মতে, ঈশ্বর ও জগৎ শুধু অভিন্নই নহেন, জগৎ সম্পূর্ণ মিথ্যা, মরীচিকা মাত্র। "গুল্‌সান্‌-ই-রাজ্" নামক বিখ্যাত গ্রন্থের লেখক সাবিস্তরির মতবাদ এই সম্পর্কে আলোচনীয়। তাঁহার মতে, শুদ্ধসত্তা পরমাত্মা "অসত্তায়" (Non-Being) প্রতিবিম্বিত হইলে জগৎ-সৃষ্টি হয়। ঈদৃশ সত্তা-প্রতিবিম্বিত অসত্তা সত্তারূপে প্রতিভাত হইলেও প্রকৃত সত্তা নহে। বস্তুতঃ, অসত্তা সৎ ও অসৎ উভয়ই—ইহা আপাতদৃষ্ট-রূপে সৎ, কিন্তু পরিণামে অসৎ। অতএব জগৎ পরমাত্মা হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও প্রকৃতরূপে পরমাত্ম-স্বরূপ—দৃশ্যমান জগৎ স্বপ্নবৎ, অলাতচক্রবৎ, কল্পনাবৎ মিথ্যা। সাবিস্তরি বলিয়াছেন: "তুমি নিদ্রিত আছ, এবং তোমার জগৎ-প্রত্যক্ষ স্বপ্নমাত্র। তুমি যাহা প্রত্যক্ষ করিতেছ, সে সকলই মরীচিকা মাত্র। জীবনের শেষ প্রত্যূষে তোমার নিদ্রাভঙ্গ হইলে, তুমি সে সকলের কাল্পনিকত্ব স্পষ্ট উপলব্ধি করিবে। ভেদদর্শনরূপ ভ্রান্ত

প্রত্যক্ষের অবসান ঘটিলে, স্বর্গমর্ত্ত্য রূপান্তরিত হইয়া যাইবে।" পুনরায় : "এই সকল বিবিধ আকার তোমার কল্পনাপ্রসূত ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাহারা দ্রুত বিঘূর্ণিত চক্ররূপে প্রতিভাত বিন্দু সদৃশ মাত্র।" (১)

জগতের ন্যায় জীবও ঈশ্বর হইতে অভিন্ন—ভিন্নরূপে প্রতীত জীব জগতেরই ন্যায় মিথ্যা। একই সূর্য্য যেরূপ বহু গবাক্ষাভ্যন্তরে কিরণ বিকিরণ করিয়া বহুরূপে প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ একই পরমাত্মা অসত্তায় প্রতিফলিত হইয়া বহু মানবরূপে প্রতীয়মান হন। অতএব পরমাত্মা ও জীব, এবং "সে", "তুমি", "আমি" প্রভৃতি জীব ও জীবের ভেদ মিথ্যা। সাবিস্তরি বলিয়াছেন : "সত্যালোকে ভেদের প্রবেশাধিকার নাই।" সেই আলোকে 'আমি', 'আমরা', 'তুমি' প্রভৃতি কিছুই নাই। 'আমি', 'আমরা', 'তুমি', ও 'সে' সকলই এক; কারণ অভেদে ব্যক্তির পরস্পর ভেদ নাই।" পুনরায় : "তৎকালে ভেদের অস্তিত্বমাত্রও থাকে না। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এক হইয়া যায়।"

সাবিস্তরি পরিণামবাদী নহেন। তাঁহার মতে, সত্তা অসত্তায় প্রকৃতরূপে পরিণত হন না, কিন্তু পরিণত হইয়াছেন বলিয়া প্রতিভাত হন মাত্র। তিনি বলিয়াছেন : "অসতের সৎ হওয়া অসম্ভব। সৎ শাশ্বত ও চিরন্তন। সৎও অসৎ হন না, অসৎও সৎ হয় না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কল্পনামাত্র। ইহা চক্ররূপে প্রতীত দ্রুতবিঘূর্ণিত অগ্নিশিখামাত্র।...সকল ভেদই মিথ্যা আরোপ মাত্র।" অতএব জীব জগৎ, ও পরমাত্মার ভেদ, সকলই মিথ্যা ; পরমাত্মাই একমাত্র সত্য।

কোনো কোনো স্থফী এস্থলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে প্রতিধ্বনি, ছায়া, প্রতিবিম্ব ও চক্ষুরোগাক্রান্ত ব্যক্তির দ্বিচন্দ্রদর্শনের ন্যায় মিথ্যা বলিয়াও বর্ণনা করিয়াছেন।

উপরি উক্ত দ্বিতীয় ও তৃতীয় উভয় মতবাদ অনুসারেই ঈশ্বর ও মানব স্বরূপতঃ ও গুণতঃ সম্পূর্ণ অভিন্ন। অতএব "ধ্বংস" (ফানা) শব্দের অর্থ—

(১) দ্রুত বিঘূর্ণিত দীপশিখা চক্রবৎ প্রতিভাত হয়।

মানবের মানবত্ব ও মানবোচিত গুণের বিলয় ; এবং "স্থিতি" (বাকা) অর্থ ঈশ্বরস্বরূপ ও গুণমণ্ডিতরূপে সংস্থিতি। কিন্তু উভয়মতের প্রভেদ নিম্নলিখিতরূপ :—দ্বিতীয় মতানুসারে, "ঈশ্বরই একমাত্র সত্য"—এই বাক্যের অর্থ এই যে, জগৎই ঈশ্বর, ঈশ্বর ভিন্ন অপর দ্বিতীয় তত্ত্ব নহে, ইহা ঈশ্বরের বাস্তব বাহ্যিক অভিব্যক্তি, ও ঈশ্বরেরই ন্যায় সত্য। তৃতীয় মতানুসারে, উক্ত বাক্যের অর্থ এই যে, জগৎ মিথ্যা বলিয়া ঈশ্বরই একমাত্র সত্য, জগৎ ঈশ্বরের অভিব্যক্তি নহে, সত্যও নহে। উভয় মতই "একতত্ত্ববাদ"। কিন্তু, দ্বিতীয় মতবাদ, জগতের সহিত ঈশ্বরের অভিন্নতা স্থাপন দ্বারাই ঈশ্বরের একত্ব স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু, তৃতীয় মত, জগতের মিথ্যাত্ব প্রমাণপূর্ব্বকই ঈশ্বরের একত্ব প্রমাণিত করিয়াছেন। উভয়েই ঈশ্বর ও জগৎ, এই পদার্থদ্বয় লইয়া আরম্ভ করিয়াছেন। এস্থলে প্রশ্ন এই—একতত্ত্ববাদ অথবা কেবল একেরই সত্যতা স্থাপন করা যায় কিরূপে? দুইটী উপায় আছে—হয় জগৎকেই ঈশ্বরে পরিণত করা, অথবা জগৎকে সম্পূর্ণ মিথ্যা পরিগণিত করা। উপরি উক্ত দ্বিতীয় মতবাদ ইহাদের মধ্যে প্রথম উপায় এবং তৃতীয় মতবাদ দ্বিতীয় উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। দ্বিতীয় মতবাদ জগৎকেই ঈশ্বর বলিয়া বলিয়াছে 'ঈশ্বরই একমাত্র সত্য'; তৃতীয় মতবাদ জগৎকে মিথ্যা বলিয়া বলিয়াছে 'ঈশ্বরই একমাত্র সত্য'। দ্বিতীয় মতবাদ বলিয়াছে, যেরূপ মৃত্তিকা ও মৃন্ময় ঘট তত্ত্বদ্বয় নহে, মৃত্তিকাই একমাত্র সত্য, কারণ মৃন্ময় ঘটই মৃত্তিকামাত্র ; তদ্রূপ ঈশ্বর ও জগৎ তত্ত্বদ্বয় নহে, ঈশ্বরই একমাত্র সত্য, কারণ জগৎই ঈশ্বর। তৃতীয় মতবাদ বলিয়াছে যে, যেরূপ সূর্য্য ও সূর্য্যের জলস্থিত প্রতিবিম্ব তত্ত্বদ্বয় নহে, সূর্য্যই একমাত্র সত্য, কারণ প্রতিবিম্ব সম্পূর্ণ মিথ্যা ; তদ্রূপ ঈশ্বর ও জগৎ তত্ত্বদ্বয় নহে, ঈশ্বরই একমাত্র সত্য, কারণ জগৎ মিথ্যামাত্র। অতএব উভয় মতবাদই একতত্ত্ববাদের প্রপঞ্চনা করিয়াছে, কিন্তু সম্পূর্ণ বিভিন্ন অর্থে।

(৪) কোনও কোনও সূফীর মতে, মানব ঈশ্বরের সহিত মিলিত হইলে ঈশ্বরের গুণাবলী প্রাপ্ত হয় মাত্র, স্বরূপ নহে। অর্থাৎ, ঈশ্বর ও মানব

স্বরূপতঃ ভিন্ন, কিন্তু গুণতঃ অভিন্ন। এস্থলে রূমীর মত আলোচনীয়। রূমীর মতে, ঈশ্বর ক্রমান্বয়ে মানবরূপে স্বীয় সত্তা অভিব্যক্ত করিয়াছেন। তজ্জন্য ঈশ্বরসত্তার সহিত পূর্ণমিলনই মানবজীবনের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য। ঈদৃশ মিলনের দুইটী দিক্—"ধ্বংস" (ফানা) এবং "স্থিতি" (বাকা)। "ধ্বংস" অর্থ মানবের মানবীয় গুণাবলীর বিনাশ, স্বরূপের নহে। "স্থিতি" অর্থ ঐশ্বরিক গুণাবলী লাভ, এবং স্বতন্ত্রসত্তাবান্ ও স্বরূপবিশিষ্ট হইয়াই ঈশ্বরস্বরূপে শাশ্বত স্থিতি। অতএব মানব ঈশ্বরের সহিত গুণতঃ অভেদত্ব প্রাপ্ত হয়, স্বরূপতঃ নহে। ইহা সুগম করিবার জন্য রূমী বহু উদাহরণ প্রদান করিয়াছেন। প্রথমতঃ, তিনি বহুবার অঙ্গ ও অঙ্গীর উদাহরণের উল্লেখ করিয়াছেন। ঈশ্বরের সহিত মিলিত মানবের সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ অঙ্গ ও অঙ্গীর সম্বন্ধতুল্য। অঙ্গের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অথবা গুণ নাই, কিন্তু ইহা সমগ্র অঙ্গীর সত্তা ও গুণের সাহায্যেই সত্তালাভ করে; তথাপি ইহার স্বীয় স্বতন্ত্র সত্তা বা স্বরূপ আছে। এতদ্রূপে মুক্তজীবগণ ঈশ্বরের গুণাবলী লাভ করিলেও স্বতন্ত্র সত্তাবান্। দ্বিতীয়তঃ, রূমী সূর্য্যালোক এবং দীপশিখা ও তারকার উদাহরণও প্রদান করিয়াছেন। সূর্য্যোদয় হইলে দীপশিখা ও তারকা অন্তর্হিত হয়। এক্ষেত্রে, দীপশিখা প্রভৃতি সৎ ও অসৎ উভয়রূপই। দীপশিখা সৎ, কারণ তাহার স্বরূপ বা সত্তার ধ্বংস হয় নাই। দীপের উপরে তুলা নিক্ষেপ করিলে তাহা তৎক্ষণাৎ দগ্ধ হইয়া যায়—ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, শিখার স্বরূপ নষ্ট হয় নাই, ইহা স্বতন্ত্র দ্রব্যরূপে অদ্যাপি বর্ত্তমান। তাহা সত্ত্বেও, দীপশিখা অসৎও, কারণ ইহার ভাস্বরত্ব গুণ সূর্য্যের গুণে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অতএব দীপশিখা সূর্য্যালোকের সহিত সম্মিলিত হইলে, শিখার স্বরূপের বিনাশ হয় না, গুণের বিনাশ হয় মাত্র। তৃতীয়তঃ, রূমী অগ্নি ও লৌহের উপমাও উল্লেখ করিয়াছেন। অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত, অর্থাৎ অগ্নি সংস্পৃষ্ট লৌহের স্বীয় কৃষ্ণবর্ণ, শীতলতা, কাঠিন্য প্রভৃতি গুণ বিনষ্ট হইয়া যায়; এবং তৎস্থলে তাহা অগ্নির রক্তবর্ণ, উষ্ণতা প্রভৃতি

গুণ প্রাপ্ত হয়। তৎসত্ত্বেও লৌহ অগ্নিত্বে পরিণত হয় না, লৌহই থাকে। চতুর্থতঃ, রূমী মুক্তজীবের অবস্থাকে তাম্রের স্থবর্ণত্ব প্রাপ্তিবৎ বলিয়াও বর্ণনা করিয়াছেন। যাহা হউক, উপরি উল্লিখিত উদাহরণাবলী হইতে স্থস্পষ্ট হইবে যে, রূমীর মতে মুক্ত জীবও ঈশ্বর হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন, কিন্তু গুণতঃ অভিন্ন। তাহারও স্বতন্ত্র সত্তা আছে।

ভগবৎসম্মেলিত মানবের দ্বিবিধ উপলব্ধি হয়। প্রথমতঃ, তিনি উপলব্ধি করেন যে, তিনি কিছুই নহেন, জীবও নহেন, জগৎও নহেন। অর্থাৎ, তাঁহার মানবোচিত গুণাবলীর বিলোপ হইয়াছে বলিয়া তিনি পৃথিবীতে থাকিয়াও পৃথিবীর নহেন। দ্বিতীয়তঃ, তিনি ইহাও উপলব্ধি করেন যে, তিনি সকলই —সকল জীব ও সমগ্র জগৎ তিনি ভিন্ন অপর কিছুই নহে। অর্থাৎ, তিনি ঐশ্বরিক গুণবিভূষিত হইয়াছেন, এবং জগৎ ঈশ্বরের গুণাবলীর অভিব্যক্তি বলিয়া তিনি ও জগৎ এক। এতদ্রূপে রূমী জগতের সহিত ভেদ ও অভেদ উভয়ই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, "হায়! আমি আমার নিজের স্বরূপ জানি না, আমি কি করিব? আমি খৃষ্টভক্তও নহি, ইস্‌লামধর্ম্মীও নহি, অবিশ্বাসীও নহি, ইহুদীও নহি। পূর্ব্ব পশ্চিম, স্থল বা জল, কোনো স্থানই আমার বাসভূমি নহে। দেবদূত অথবা উপদেবতা, কেহই আমার আত্মীয় নহে। অগ্নি বা ফেন, কিছু হইতেই আমার উৎপত্তি হয় নাই; ধূম বা শিশির, কিছু দ্বারাই আমি গঠিত হই নাই। আমি চীন, সাকসিন, বুল্‌গার, ভারত, ইরাক্ বা খোরাসান্—কোনো স্থানেই জন্মগ্রহণ করি নাই। আমি পৃথিবীতে অথবা পরলোকে, স্বর্গে অথবা মর্ত্ত্যে—কোনো স্থানেই বাস করি না।" পুনরায় রূমী বলিতেছেন: "পৃথিবীতে প্রেমিকজন যদি কেহ থাকেন, হে মুসলমানগণ, তিনি আমিই। বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী সাধু যদি কেহ থাকেন, তাঁহারা সকলই আমি। মদ্য, পাত্রবাহক, গায়ক, বীণা ও গীত, প্রিয়া, দীপ, মদ্যপান ও আনন্দ—সকলই আমি। পৃথিবীতে সপ্তবিংশ বিভিন্ন সম্প্রদায় কিছুই নাই—প্রতি সম্প্রদায় একমাত্র

আমিই। মৃত্তিকা, বায়ু, জল ও অগ্নি, দেহ ও আত্মা—সকলই আমি। সত্য ও মিথ্যা, পুণ্য ও পাপ, সহজ ও কঠিন, জ্ঞান ও শিক্ষা, সন্ন্যাস ও কারুণ্য—সকলই আমি।" "আমিই চৌরের চৌর্য্য, আমিই রোগীর রোগ আমিই মেঘ ও বৃষ্টি, আমিই মাঠে মাঠে বর্ষিত হইয়াছি।" ইত্যাদি। উপরি-লিখিত রূমীর মতানুসারে, এই সকল কবিতার কেবল এই অর্থই হইতে পারে, যে, সর্ব্ববস্তু স্বরূপতঃ ভিন্ন হইলেও গুণতঃ অভিন্ন।

রূমী পুনরায় বলিয়াছেন—"হে আমার আত্মা, আমি আদ্যোপান্ত অন্বেষণ করিয়াও তোমার মধ্যে প্রিয় [ঈশ্বর] ব্যতীত অপর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। হে আমার আত্মা! যদি আমি বলি যে, তুমি স্বয়ংই তিনি, আমাকে অবিশ্বাসী বলিও না।" "তোমরা যাহারা ঈশ্বরান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছ, তোমাদের অন্বেষণের আর প্রয়োজন নাই, কারণ তোমরাই ঈশ্বর, তোমরাই ঈশ্বর। যাহা কদাপি হারায় নাই, তাহারই জন্য পুনরায় অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছ কেন?" এ-স্থলেও, রূমীর পূর্ব্ব মতানুসারে, ঈশ্বর ও জীবের অভেদত্ব অর্থ গুণতঃ অভেদত্ব, স্বরূপতঃ নহে।

কিন্তু রূমীর কবিতার কোনো কোনো অংশ হইতে ইহা মনে করা আশ্চর্য্য নহে যে, রূমীর মতে, মানব ঈশ্বরের সহিত পূর্ণ-মিলিত হইলে অবশ্য তাহার স্বরূপের ধ্বংস হয় না, কিন্তু স্বতন্ত্র সত্তার বিলোপ হয়। যথা, রূমী জীবকে বারিবিন্দু ও ঈশ্বরকে সীমাহীন সমুদ্রের সহিত তুলনা করিয়াছেন এবং ঈদৃশ সমুদ্রেই অবশেষে জীবের সত্তা লুপ্ত হইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত, একটী কবিতায় তিনি বলিয়াছেন: "কি আনন্দেরই সেই সময় যখন আমরা দু'জনে প্রাসাদে উপবিষ্ট হই—তুমি আর আমি। আমাদের আকার ও দেহ ভিন্ন, কিন্তু আত্মা একই—তোমার ও আমার। তুমি আর আমি, অতঃপর ভিন্ন সত্তাবান্ নহি, কিন্তু আবেগোন্মাদনায় একীভূত হইয়া যাইব।" অন্যান্য বহু উপমা দ্বারাও তিনি জীবের স্বতন্ত্র সত্তা বিলোপেরই ইঙ্গিত করিয়াছেন। যথা—ঈশ্বর সমুদ্র, জীব বায়ুতাড়িত তরঙ্গ: ঈশ্বর শিখা, জীবের দেহ শিখাধারী

প্রদীপ ; ঈশ্বর সূর্য্য, জীব গবাক্ষপ্রবিষ্ট রশ্মি। এই সকল কবিতা ও উপমা হইতে ইহাই প্রমাণীকৃত হয় যে, ঈশ্বর ও জীব, এবং জীব ও জীব, গুণতঃই নহে, স্বরূপতঃও অভিন্ন, কেবল দেহ প্রভৃতি উপাধি বিশিষ্ট হইয়াই ভিন্ন প্রতীত হইতেছে। কিন্তু রূমী স্বপ্রপঞ্চিত তত্ত্ব হইতে উক্ত ন্যায়ানুমোদিত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হন নাই।

যাহা হউক, রূমীর মতে, ঈশ্বর ও জীব স্বরূপতঃ ভিন্ন, কিন্তু গুণতঃ অভিন্ন। হাল্লাজও এই মতানুসারী বলিয়া বোধ হয়। তিনিও অবশ্য ঈশ্বর ও মানবের একত্ব প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু জীবের স্বতন্ত্র সত্তা বা স্বরূপ অস্বীকার করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন :—"তোমার আত্মা আমার আত্মার সহিত সংমিশ্রিত হইয়াছে, যেরূপ মদ্য জলের সহিত সংমিশ্রিত হয়। কোনো বস্তু তোমাকে স্পর্শ করিলে আমাকেও স্পর্শ করে। প্রতি ক্ষেত্রেই তুমিই আমি।" "আমি যাঁহাকে ভালবাসি, আমিই তিনি, এবং তিনিই আমি। আমরা একদেহবাসী দুই আত্মা। তুমি আমাকে দেখিলে, তাঁহাকেও দেখ ; তাঁহাকে দেখিলে, আমাকেও দেখ।" "প্রজাপতি আলোকে প্রবেশ করিয়া, আলোকে পরিণত হয়।" এস্থলে, মদ্য ও জলের, এবং প্রজাপতি ও আলোকের উপমা জীবের স্বতন্ত্র স্বরূপের দ্যোতক। মদ্য জলের সহিত সংমিশ্রিত হইলে, অবশ্য তাহা আর জল হইতে পৃথক করা সম্ভব নহে। তথাপি মদ্য জলস্বরূপে পরিণত হয় না, মদ্যস্বরূপই থাকে। এতদ্রূপে, অগ্নিভস্মীভূত প্রজাপতিও স্বয়ং অগ্নিত্ব প্রাপ্ত হয় না। পুনরায়, ঈশ্বর ও জীব একদেহান্তর্গত দুই আত্মা হইলে, তাঁহারা নিশ্চয়ই স্বতন্ত্র স্বরূপ। অতএব এই মতানুসারে, ঈশ্বর ও মানব স্বরূপতঃ ভিন্ন, কিন্তু গুণতঃ অভিন্ন।

সংক্ষেপে, ঈশ্বর ও জীবজগতের সম্বন্ধ বিষয়ে, চারিটী প্রধান স্ফী মতবাদ দৃষ্ট হয় :—(১) ঈশ্বর ও জীব-জগৎ স্বরূপতঃ ও গুণতঃ সম্পূর্ণ ভিন্ন। (২) উভয়ে স্বরূপতঃ ও গুণতঃ সম্পূর্ণ অভিন্ন, এবং জীবজগৎ সত্য। (৩) উভয়ে

স্বরূপতঃ ও গুণতঃ সম্পূর্ণ অভিন্ন, কিন্তু জীবজগৎ মিথ্যা। (৪) উভয়ে স্বরূপতঃ ভিন্ন, কিন্তু গুণতঃ অভিন্ন।

এস্থলে, ঈশ্বরের সহিত মিলিত জীবের স্বীয় স্বতন্ত্র সত্তারও বিলোপ ঘটে কিনা, সেই সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, বহু সুফী ঈশ্বর ও মানবের ঐক্যমূলক উক্তি করিয়াছেন। যথা—হাল্লাজের সুবিখ্যাত উক্তি—"আমিই সত্য (ঈশ্বর)" (আনল্ হক্); ইব্নুল ফরিদের "আমিই তিনি" (অন হিয়া); বায়াজিদের "আমিই ঈশ্বর, আমি ব্যতীত অন্য ঈশ্বর নাই, অতএব আমাকেই ভজনা কর"; "ঈশ্বর হইতে ঈশ্বরে ভ্রমণ করিলাম, পরিশেষে তাঁহারা আমার হৃদয় মধ্য হইতে বলিলেন: 'তুমিই আমি';" "আমারই জয় হউক! আমার মহিমা কি নিরতিশয়!"; রূমীর "স্বয়ং তুমিই তিনি", ইত্যাদি। জীবের সহিত অপরাপর, জীবের ও জীবের সহিত জগতের ঐক্য সম্বন্ধেও বহু উক্তি আছে। যথা, বায়াজিদের, "সর্প যেরূপ কঞ্চুক পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ আমিও বায়াজিদত্ব পরিত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া আসিলাম। তৎপরে, আমি দেখিলাম যে, প্রেমিক, প্রিয়া ও প্রেম সকলই এক, কারণ অভেদে ভেদের স্থান নাই," "আমিই মদ্যপায়ী, আমিই মদ্য, আমিই পাত্রধারক"; সাবিস্তরির "সেই আলোকে 'আমি', 'আমরা' অথবা 'তুমি' নাই; 'আমি', 'আমরা' 'তুমি' ও 'সে'—সকলই এক" (উপরে দেখুন); রূমীর "মদ্য, পাত্রধারক, গায়ক, বীণা। গীত, প্রিয়া, প্রদীপ, মদ্যপান ও তজ্জনিত আনন্দ—সকলই আমি" (উপরে পৃঃ ৯৮ দেখুন), ইত্যাদি। অবশ্য ঈদৃশ সকল উক্তিরই অর্থ এই নহে যে, মানব ঈশ্বর হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন—স্বরূপতঃ ও গুণতঃ উভয়তঃই, এবং তাহার মানবস্বরূপের ঈশ্বরস্বরূপে সম্পূর্ণ বিলোপ হয়। বস্তুতঃ এই বিষয়ে দুইটী মতবাদ দৃষ্ট হয়:—

(১) কোনও কোনও সুফী ঈশ্বরে স্বতন্ত্র সত্তাহীন শাশ্বত জীবন বা অস্তিত্বই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহাদের

মতে, "ধ্বংস' (ফানা) শব্দের অর্থ—মানবের মানবত্বের ও মানবীয় গুণাবলীর সম্পূর্ণ ধ্বংস : এবং "স্থিতি' (বাকা) শব্দের অর্থ—ঈশ্বরে চিরন্তন স্থিতি, কিন্তু স্বতন্ত্র সত্তাবান্ ব্যক্তিরূপে নহে। একবিন্দু বৃষ্টি সমুদ্রে সম্পূর্ণ লোপপ্রাপ্ত হইলেও, তাহার অস্তিত্বের লোপ হয় না। অবশ্য ইহা বৃষ্টিবিন্দুরূপে, অর্থাৎ ভিন্ন স্বতন্ত্র সত্তাবান্ পদার্থরূপে আর বিরাজ করে না, সত্য; কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহার অস্তিত্বের লোপ হয় না—সমুদ্রের সহিত একীভূত হইয়া ইহা স্বতন্ত্র সত্তাহীনভাবেই স্থিতি করে। এতদ্রূপে, জীবসত্তা ঈশ্বরসত্তায় বিলুপ্ত হইলে, জীব ঈশ্বরেই অনন্তকাল স্থিতি করে, অবশ্য স্বতন্ত্রসত্তাবান্ ব্যক্তিরূপে নহে। যথা, বায়াজিদ এই মতবাদের প্রপঞ্চনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "তাহার সকল চিহ্নই বিলুপ্ত হইয়া যায়, এবং তাহার সত্তা অপরের সত্তায় বিনষ্ট হইয়া যায়, এবং তাহার চিহ্ন অপরের চিহ্নে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়।" অপর এক সুফী বাবা কুহী বলিয়াছেন, "তাঁহার আলোকে আমি মোমবাতির ন্যায় গলিয়া গেলাম।·· আমি শূন্যত্বে পরিণত হইলাম, আমি অদৃশ্য হইয়া গেলাম। কিন্তু আমিই সর্ব্বসত্তাময়ও।"

এই সম্প্রদায়ের সুফীগণ ঈশ্বরে মানবের ঈদৃশ স্বরূপ "ধ্বংস" (ফানা) অপেক্ষাও আরেকটা উচ্চতর স্তরের উল্লেখ করেন—ইহার নাম "ধ্বংসের ধ্বংস" (ফানা অল্ ফানা)। "ধ্বংস"রূপ স্তরেও, ভেদজ্ঞানের কণামাত্র অবশিষ্ট থাকে, কারণ তৎকালেও জীবের ঈশ্বরের সহিত একত্বজ্ঞান বিদ্যমান থাকে। অর্থাৎ সেই সময়েও জীব নিজকে ঈশ্বর হইতে অভিন্ন বলিয়া জানে এবং এই জ্ঞানের জ্ঞাতারূপে সে পৃথক্ সত্তাবান্ নিশ্চয়ই। কিন্তু "ধ্বংসের ধ্বংসরূপ" উচ্চতর স্তরে ঈদৃশ অভেদজ্ঞানেরও বিলোপ ঘটে, এবং স্বতন্ত্র সত্তারও পরিসমাপ্তি হয়। সময়বিশেষে, এই স্তরে চেতনার পরিপূর্ণ বিলুপ্তিও ঘটে। উন্মাদনাঘন, ভাবারূঢ় অবস্থায় সুফী সাধুগণ আহত হইলেও কোনরূপ শারীরিক বেদনা অনুভব করিতেন না—এইরূপ বহু গল্প প্রচলিত আছে। যথা, আবুল খেয়রের পায়ে দুষ্টক্ষত হওয়ায় উহা ছেদন করিবার প্রয়োজন হয়,

কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মতি প্রদান করেন নাই। তাঁহার শিষ্যদের পরামর্শানুসারে, চিকিৎসক ধ্যানমগ্ন সাধুর পদচ্ছেদন করেন, কিন্তু তিনি কিছুই অনুভব করেন নাই।

(২) কোনো কোনো সূফীসম্প্রদায়ের মতে, ঈশ্বরে স্বতন্ত্র সত্তাশীল অস্তিত্বই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য। ঈশ্বরের সহিত মিলন হইবার পরেও মানবের মানবত্বের বা স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের বিনাশ ঘটে না। ইহা হাল্লাজ, রূমী প্রভৃতির মত। ইঁহারা ঈশ্বর ও মানবের একত্ব সজোরে পুনঃ পুনঃ প্রচার করিলেও ইঁহাদের মতে, ঈশ্বরের সহিত একীভূত মানবেরও স্বতন্ত্রস্বরূপ বিনষ্ট হয় না।

বিশ্বাত্মবাদী ও বিজ্ঞানবাদী সূফীগণও প্রকৃতপক্ষে এই শ্রেণীভুক্ত। যদিও তাঁহাদের মতে ঈশ্বর ও মানব স্বরূপতঃ ও গুণতঃ সম্পূর্ণ অভিন্ন, তথাপি তাঁহারা একই কালে ঈশ্বরের সহিত মানবের নিগূঢ়, ব্যক্তিগত সম্বন্ধের কথাও বলিয়াছেন। যথা, জীলী বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরোপাসনা মানবের চিরন্তন অবশ্য কর্ত্তব্য। অন্যান্য সূফী মরমী কবিগণও ঈশ্বরের সহিত মিলনাবস্থাকে প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেমোন্মত্ত অবস্থার তুল্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ঈশ্বরও ভক্ত প্রায়শঃ ঘনিষ্ঠ কথোপকথনে রত হন—ইহাও তাঁহারা বলেন। অতএব, ভক্ত ঈশ্বরের সহিত স্বরূপতঃ ও গুণতঃ অভিন্ন হইয়াও, তাঁহা হইতে ভিন্ন। ইহা যুক্তির দিক্ হইতে অসঙ্গত হইতে পারে। কিন্তু, স্মরণে রাখা কর্ত্তব্য যে,সূফীমতবাদ যুক্তিমূলক জ্ঞানবাদ নহে,কিন্তু মরমিয়াবাদ,—ভাবাবেশ-প্রধান এবং সাক্ষাৎ উপলব্ধিমূলক ধর্ম্ম, যাহা দর্শনশাস্ত্রের ন্যায়বিচারের সম্পূর্ণ বাহিরে। হৃদয়ের বিচার ও মস্তিষ্কের বিচার এক নহে। অতএব, যাহা দ্বিতীয়টার নিকট বিরোধ-দোষদুষ্ট, তাহা প্রথমটার নিকট সেরূপ না হইতেও পারে।

শেষ প্রশ্ন এই যে, ঈশ্বরের সহিত মানবের মিলন, অথবা মুক্তি, বর্ত্তমান জীবনেই সম্ভবপর কি না? অধিকাংশ সূফীর মতেই, ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব।

তাঁহারা বলেন যে, প্রত্যেক সূফীর একমাত্র কর্ত্তব্য ঈশ্বরের সহিত পূর্ণ মিলিত হওয়া; বর্ত্তমান্ জীবনেই, পার্থিব দেহেই। তজ্জন্য স্থূলদেহকে সর্ব্বপ্রথম বশীভূত করিয়া পবিত্রীকৃত করা নিতান্ত প্রয়োজন। সাবিস্তরি প্রমুখ সূফীগণের মতে, সাধারণ মানবপক্ষে ঈদৃশ মিলনাবস্থা বর্ত্তমান জীবনে লভ্য নহে। কারণ ভাবোন্মত্ত সমাধি অবস্থার অবসান হইলেই, একত্ব উপলব্ধিরও অবসান ঘটে, এবং ভেদভ্রমের পুনরুদয় হয়। অন্যান্য সূফীগণও বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরের সহিত মিলনাবস্থা সকলের পক্ষে বর্ত্তমান জীবনে নিত্য নহে। আধ্যাত্মিক উন্মাদনার উচ্চ শিখর হইতে অকস্মাৎ পার্থিব-জীবনের গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হইয়া বহু সূফী তীব্র আক্ষেপ করিয়াছেন। যথা, জীলী বলিয়াছেন: "আমিই ঈশ্বর, আমিই জগতের রাজা, সমগ্র সৃষ্টির উপাদান কেবল আমিই। দৃশ্য জগৎ আমারই। অদৃশ্য জগৎও আমারই। কিন্তু, হায়, আমি ঈদৃশ মহান্ স্বরূপোপলব্ধি হইতে ক্ষুদ্র দাসেও হঠাৎ পরিণত হইয়া যাই"। সাধারণতঃ, সূফীগণের মত এই যে, কেবল ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণই ঈশ্বরের সহিত নিত্য সম্মিলিত, অন্যান্য সাধুগণ নহেন।

সনাতনপন্থী সূফীগণের মতে অবশ্য ঈশ্বরের দর্শন ইহলোকে নহে, পরলোকেই লভ্য।

বেদান্তসম্মত মুক্তিবাদের সহিত উপরি আলোচিত সূফী মুক্তিবাদের তুলনা করিবার পূর্ব্বে, প্রধান বেদান্তসম্প্রদায়ের মুক্তিবাদ সম্বন্ধে অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রদত্ত হইতেছে। ভারতীয় দর্শনের মতে, সংসার দুঃখাগার এবং সংসার হইতে মুক্তিই প্রকৃত মুক্তি। সংসারের মূল কারণ কর্ম্ম। সকাম কর্ম্ম অর্থাৎ ফলেচ্ছু হইয়া কর্ম্ম করিলেই তাহার ফল ভোগ করিতেই হইবে। তজ্জন্য সংসারে জন্মগ্রহণ আবশ্যক। নূতন জন্মে পুনরায় নূতন কর্ম্ম সম্পাদিত হয়, তাহাদের ফলও ভোগ করিবার জন্য পুনরায় জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়। এইরূপে ক্রমাগত সকাম কর্ম্ম, জন্ম, নব কর্ম্ম, পূর্ণ জন্ম, ইত্যাদি ভাবে জীব

অনাদি, অনন্ত সংসারচক্রে বিঘূর্ণিত হইতে থাকে। ঈদৃশ সংসারচক্র হইতে মুক্তিলাভই মোক্ষ। এই বিষয়ে সকল ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ই একমত। অর্থাৎ, মুক্তি কি নহে—সংসারাবস্থা নহে, দুঃখাবস্থা নহে—এই বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। কিন্তু মুক্তি কি, ইহার প্রকৃত স্বরূপ কি, সে সম্বন্ধে বহু মতভেদ আছে। এস্থলে কেবল বেদান্তের কথাই আলোচনীয়।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, প্রধান বেদান্তসম্প্রদায় পাঁচটী। শঙ্করপ্রমুখ, কেবলাদ্বৈতবাদিগণের মতে, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জীব ও জগৎ মিথ্যা মায়ামাত্র। সুতরাং ব্রহ্মের সহিত একত্ব উপলব্ধিই চরম পুরুষার্থ বা মোক্ষ। "অধ্যাস"ই বন্ধের কারণ। এক বস্তুর গুণাবলী অপর এক ভিন্ন বস্তুর উপর ভ্রমপূর্ব্বক আরোপের নাম "অধ্যাস"। যথা, রজ্জুর উপর সর্পের গুণাবলী ভ্রমক্রমে আরোপ করিয়া রজ্জুস্থলে সর্প প্রত্যক্ষ করার নাম "অধ্যাস।" এইরূপে, ব্রহ্মেও বিশ্বচরাচরের অধ্যাস হইয়াছে ; এবং রজ্জুস্থলে দৃষ্ট সর্পের ন্যায় ব্রহ্মস্থলে দৃষ্ট জীবজগৎও মিথ্যা। কর্ম্মবশে জীব দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ ও বুদ্ধিরূপ "উপাধি"র সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া সংসারে জন্মগ্রহণ করে। "উপাধি" অভিন্ন, অবিভাজ্য বস্তুতে ভেদ-প্রতীতির কারণ। যথা, আকাশ এক, অভিন্ন, অবিভাজ্য সমগ্র সত্তা। কিন্তু ঘটান্তর্গত আকাশ মহাকাশ হইতে আপাতভিন্ন। সুতরাং ঘট আকাশের "উপাধি।" সংসারী জীব দেহমনের ধর্ম্ম আত্মায় অধ্যাস বা আরোপ করিয়া অশেষ দুঃখভাগী হয়। অর্থাৎ, সে দেহ মন প্রভৃতিকে আত্মা বলিয়া ভ্রমে পতিত হয়, এবং নিজকে অপরাপর জীব ও ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া মনে করে। যথা, এক ঘটান্তর্গত আকাশ অপর এক ঘটান্তর্গত আকাশ ও মহাকাশ হইতে প্রকৃতরূপে অভিন্ন হইলেও ঘটরূপ উপাধি দ্বারা ভিন্ন প্রতীত হয়। কিন্তু ঘট দুইটী চূর্ণ করিলেই, সেই দুই ঘটান্তর্গত আকাশ ও মহাকাশে বিন্দুমাত্রও ভেদ থাকে না।' সমভাবে, দেহেন্দ্রিয়রূপ উপাধির অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়ে আত্মার অধ্যাসের বিলয় হইলেই জীবের সহিত জীবের, ও জীবের সহিত ব্রহ্মের কোনোরূপ ভেদ থাকে না—

সকলই এক অখণ্ড ব্রহ্মসত্তা হইয়া যায়। এস্থলে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, উপাধির অস্তিত্বই কেবল বন্ধের কারণ নহে, আত্মায় উপাধির অধ্যাসই প্রকৃত কারণ। তজ্জন্য অধ্যাসের অভাবই মুক্তি, উপাধির বিলয় হউক আর নাই হউক। দেহেন্দ্রিয়বিশিষ্ট জীবও মুক্তিলাভ করিতে পারে, যদি সে তাহার আত্মার প্রকৃত স্বরূপ অবগত হইয়া, দেহ-মনের ধর্ম্ম আত্মায় আর আরোপ না করে। ঈদৃশ মুক্তির নাম "জীবন্মুক্তি"—অর্থাৎ জীবিত অবস্থাতেই, বর্ত্তমান দেহ-পাতের পূর্ব্বেই মুক্তিলাভ। প্রকৃতপক্ষে অবশ্য অধ্যাসের অবসানই উপাধিরও অবসান। কারণ দেহ-মন প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলেও অধ্যাসমুক্ত জ্ঞানীর নিকট তাহারা "উপাধি" অথবা ভেদকারক নহে। অপর এক প্রকারের ও মুক্তির কথা অন্যান্য সম্প্রদায় বলেন। তাহার নাম "বিদেহ-মুক্তি", অর্থাৎ—বর্ত্তমান দেহপাতের পর, স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর ধ্বংস হইবার পরেই, মুক্তিলাভ। শঙ্করের মতে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানিগণ এই জগতেই মুক্তিলাভ করিতে, অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত স্বীয় অভিন্নতা সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে পারেন। অতএব, শঙ্করের মতে, মুক্তি জীবের জীবত্ব বা 'আমিত্বে'র সম্পূর্ণ বিনাশ। মুক্ত জীব স্বয়ং ব্রহ্ম। তজ্জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন (ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৬-৮) "তৎ ত্বম অসি" : "তিনিই (ব্রহ্ম) তুমি (জীব)।"

রামানুজপ্রমুখ বিশিষ্টাদ্বৈত সম্প্রদায়ের মতে, জীবজগৎ মিথ্যা, মায়ামাত্র নহে, কিন্তু ব্রহ্মের পরিণাম, গুণ ও অংশরূপে ব্রহ্মেরই ন্যায় সত্য। জীব-জগৎ ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ অভিন্নও নহে, কিন্তু স্বরূপতঃ অভিন্ন, ধর্ম্মতঃ ভিন্ন। যথা, কারণ ও কার্য্য স্বরূপতঃ অভিন্ন, কিন্তু ধর্ম্মতঃ ভিন্ন। মৃৎপিণ্ড (কারণ) মৃৎস্বরূপ, মৃণ্ময় ঘটও (কার্য্য) মৃৎস্বরূপ, অতএব স্বরূপতঃ উভয়ে অভিন্ন। কিন্তু মৃত্তিকা গোলাকৃতি এবং ইহা দ্বারা জল আহরণ করা যায় না : মৃণ্ময় ঘট ডিম্বাকৃতি এবং ইহা দ্বারা জলাহরণ করা যায়। অতএব উভয়ের গুণ ও কার্য্যক্ষমতা ভিন্ন। তজ্জন্য ইহারা ধর্ম্মতঃ ভিন্ন। ব্রহ্ম কারণ, জীবজগৎ কার্য্য ; অতএব ব্রহ্ম ও জীবজগৎ স্বরূপতঃ অভিন্ন, গুণতঃ ভিন্ন।

রামানুজের মতে মুক্তি জীবের জীবত্বের বিনাশ নহে, পরিপূর্ণ বিকাশ। 'জীবত্বের' বিকাশ অর্থ জীবের স্বরূপ ও গুণের চরমোৎকর্ষ। জীব জ্ঞানানন্দস্বরূপ, কিন্তু বদ্ধাবস্থায় জীবের ঈদৃশ স্বরূপের পূর্ণ অভিব্যক্তি সম্ভবপর হয় না, সুতরাং বদ্ধজীব অজ্ঞ ও দুঃখভাগী। পুনরায়, জীব জ্ঞাতা, কর্ত্তা ও ভোক্তা—কিন্তু এই সকল গুণেরও পরিপূর্ণ বিকাশ বদ্ধাবস্থায় হইতে পারেনা। বদ্ধজীবের জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভোগশক্তি অতি অল্প। তজ্জন্য সে জ্ঞাতা হইয়াও অজ্ঞ বা অল্পজ্ঞ, কর্ত্তা হইয়াও ক্ষুদ্রশক্তি, ভোক্তা হইয়াও দুঃখী। মুক্তজীবই কেবল জ্ঞাতা ও সর্ব্বজ্ঞ, কর্ত্তা ও সর্ব্বশক্তি, ভোক্তা ও পূর্ণ আনন্দময়। এইরূপে জীব পূর্ণ আত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয়। 'ব্রহ্মস্বরূপ' প্রাপ্তির অর্থ ব্রহ্মসাদৃশ্যলাভ। মুক্তজীব ব্রহ্মেরই ন্যায় সচ্চিদানন্দস্বরূপ, এবং ব্রহ্মের অন্যান্য সকল গুণভাগী হয়। কেবল দুইটী বিষয়ে ব্রহ্ম হইতে ভিন্নই থাকে। প্রথমতঃ ব্রহ্ম বিভু, মুক্তজীবও অণু। দ্বিতীয়তঃ, ব্রহ্ম জগতের স্রষ্টা, পালক ও ধ্বংসকর্ত্তা, কিন্তু মুক্ত জীব সৃষ্ট্যাদি শক্তিবিহীন। অতএব মুক্ত জীব ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও পৃথক্‌সত্তাবান্। অর্থাৎ মুক্তজীব ব্রহ্মসদৃশ, ব্রহ্মাধীন সত্তা। ঈশ্বর ও জীবের শাশ্বত সম্বন্ধ উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধ। মুক্তজীবও ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন; সর্ব্বশক্তিমান্ হইয়াও ব্রহ্মাশ্রিত ও ব্রহ্ম পরিচালিত; সর্ব্বজ্ঞ, আপ্তকাম ও সর্ব্বানন্দময় হইয়াও ব্রহ্মের একনিষ্ঠ সেবক ও ভক্ত। অতএব, রামানুজের মতে 'জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন,' ইহার অর্থ এই নহে যে, জীবের স্বীয় স্বরূপ ব্রহ্মস্বরূপে লোপ প্রাপ্ত হয়। ইহার অর্থ এই যে, জীব ব্রহ্মসদৃশ সচ্চিদানন্দস্বরূপ ও অপরাপর ঐশ্বরিক গুণবিমণ্ডিত হয়, কিন্তু পৃথক্ স্বরূপবান্ই থাকে। ব্রহ্মসদৃশ ও ব্রহ্মান্তর্গত হইলেও জীব পৃথক্‌সত্তাবান্, অবশ্য স্বাধীন সত্তাবান্ নহে, পরাধীন সত্তাবান্।

রামানুজ বিদেহমুক্তিবাদী। তাঁহার মতে, প্রথমতঃ দেহেন্দ্রিয়বিশিষ্ট জীব ব্রহ্মজ্ঞ ও আত্মজ্ঞ হইলেও, দেহমনের ধর্ম্ম, অবস্থা প্রভৃতি দ্বারা আক্লিষ্ট

না হইয়াই পারে না। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, বেদনা প্রভৃতি প্রকৃতপক্ষে দেহ মনেরই ধর্ম্ম, আত্মার নহে, তথাপি জ্ঞানীও ক্ষুৎপিপাসা-ক্লিষ্ট হন ও বেদনা ভোগ করেন। দ্বিতীয়তঃ, জীবের স্বরূপ ও গুণের পূর্ণ বিকাশই মুক্তি, কিন্তু ঈদৃশ বিকাশ দেহবিশিষ্ট জীবের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। দেহ-মনোবদ্ধ জীব ব্রহ্মের ন্যায় সচ্চিদানন্দস্বরূপ ও অসংখ্য্য কল্যাণগুণমণ্ডিত হইতেই পারে না। অতএব দেহশৃঙ্খলমুক্ত জীবই প্রকৃত মুক্ত।

নিম্বার্কপ্রমুখ দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণের মতে, জীব জগৎ ব্রহ্ম হইতে স্বরূপতঃ গুণতঃ উভয়তঃই ভিন্নাভিন্ন। নিম্বার্কের মতে, কার্য্য কারণ হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন ও অভিন্ন উভয়ই; এবং ধর্ম্মতঃও ভিন্ন ও অভিন্ন উভয়ই। যথা মৃণ্ময় ঘট মৃৎপিণ্ড হইতে স্বরূপতঃ অভিন্ন, কারণ উভয়েই মৃত্তিকা-স্বভাব। তাহা সত্ত্বেও ঘট ঘটই, পিণ্ড নহে; অতএব ঘটস্বরূপ পিণ্ড-স্বরূপ হইতে ভিন্নও নিশ্চয়ই। পুনরায়, পিণ্ডের ও ঘটের গুণ ও কার্য্যা-বলী ভিন্ন; ইহা সত্ত্বেও মৃত্তিকাগত ধর্ম্ম উভয়েই বিদ্যমান বলিয়া ইহারা ধর্ম্মতঃও অভিন্ন। অতএব কার্য্য ও কারণ, জগৎ ও ব্রহ্ম স্বরূপতঃও ভিন্নাভিন্ন, ধর্ম্মতঃও ভিন্নাভিন্ন।

মুক্তিবিষয়ে নিম্বার্ক ও রামানুজ একমত। মুক্তজীব ব্রহ্মসদৃশ মাত্র, ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন নহে, এবং পৃথক্‌সত্তাবান। নিম্বার্কও বিদেহমুক্তিবাদী।

মধ্বপ্রমুখ দ্বৈতবাদিগণের মতে, জীবজগৎ ব্রহ্ম হইতে নিত্যভিন্ন। ব্রহ্ম নিয়ন্তা, জীবজগৎ নিয়ম্য, ব্রহ্ম উপাস্য, জীব উপাসক; এবং নিয়ন্তা নিয়ম্য, উপাস্য ও উপাসক সর্ব্বদাই পরস্পর ভিন্ন। মধ্বের মতে, নিম্ন-লিখিত পঞ্চবিধ ভেদ অনাদি ও নিত্য।— (১) জীবেশ্বর ভেদ। অনুপ্রমাণ ও সৃষ্ট্যাদিশক্তিহীন জীব ঈশ্বর হইতে বদ্ধ, মুক্তি সকল অবস্থাতেই সম্পূর্ণ ভিন্ন। (২) জড়েশ্বর ভেদ। অচেতন জগৎও ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। (৩) জীব ভেদ। একজীব অন্য জীব হইতে ভিন্ন। (৪) জড়জীব ভেদ। জীব জগৎ হইতে ভিন্ন। (৫) জড় ভেদ। জড় বস্তুর এক অংশ অন্য অংশ হইতে ভিন্ন।

ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের ভেদ নিত্য বলিয়া, মুক্ত জীবগণও ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ও পরস্পর ভিন্ন। মুক্তি জীবের জীবত্বের বিনাশ নহে, পরিপূর্ণ বিকাশ। মুক্তি ব্রহ্মস্বরূপত্ব লাভ নহে। মুক্তজীব কেবল ব্রহ্মসদৃশ হয় মাত্র। মুক্তজীবও ব্রহ্মের সেবক, উপাসক ও ব্রহ্মাধীন। মধ্বের মতে, ব্রহ্ম ও জীবের অভেদ-জ্ঞান মুক্তির কারণ ত নহেই, উপরন্তু জীবের অনন্ত নরকবাসের কারণ। কোনও প্রার্থী যদি নৃপতির নিকট নৃপতিপদই প্রার্থনা করে, তাহা হইলে সে স্বীয় প্রার্থিত বস্তু লাভ করা দূরে থাকুক, নৃপতি কর্তৃক নিহত হয়; কিন্তু বিনীতভাবে রাজার সেবা করিলেই সে রাজপ্রসাদ লাভ করে। তদ্রূপ, ক্ষুদ্র জীব সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্মের সমান হইবার স্পর্দ্ধা করিলে অন্ধতমস্ নরকগামী হয়। মধ্বও বিদেহমুক্তিবাদী।

বল্লভপ্রমুখ শুদ্ধাদ্বৈতবাদিগণের মতে, ব্রহ্মই স্বয়ং জীবজগদ্রূপে আবির্ভূত হন্। অতএব ব্রহ্ম ও জীবজগৎ অভিন্ন। জীবজগৎ ব্রহ্মের অংশ, কার্য্য ও ব্রহ্মাত্মক বলিয়া ব্রহ্মেরই ন্যায় সত্য ও নিত্য। কার্য্য ও কারণ অভিন্ন। যথা, মৃৎপিণ্ড ও মৃণ্ময় ঘট অভিন্ন, কারণ উভয়েই মৃত্তিকা মাত্র। তদ্রূপ, ব্রহ্ম ও জীবজগৎ ও অভিন্ন। যেরূপ কুণ্ডলীকৃত সর্প ও প্রসারিত সর্প অভিন্ন, তদ্রূপ সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম, এবং সচ্চিৎস্বরূপ জীব ও সৎস্বরূপ জগৎ অভিন্ন। ব্রহ্ম কেবল জীবজগৎ স্রষ্টা নহেন, স্বয়ংই জীবজগৎ। জীব সত্যই ব্রহ্ম, জগৎও সত্যই ব্রহ্ম। শঙ্করের মতে, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জীবজগৎ মিথ্যা, মায়া মাত্র; বল্লভের মতে, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জীবজগৎ মিথ্যা নহে, কিন্তু ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। বল্লভের মতে, দুইটী সত্য বস্তুর ভিতরই অভিন্ন সম্বন্ধ সম্ভব; একটী সত্য ও একটী মিথ্যা বস্তুর ভিতর কোনোপ্রকার সম্বন্ধই সম্ভব নহে। যথা "মৃণ্ময় ঘটই মৃত্তিকা"—এস্থলে দুইটি সত্য বস্তু, 'ঘট' ও 'মৃত্তিকার' ভিতর অভিন্নতা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু "মৃণ্ময় ঘটই মরীচিকা"—এই বাক্যটী অর্থহীন, যেহেতু সত্য 'ঘট' ও মিথ্যা 'মরীচিকা' অভিন্ন হইবে কিরূপে?

তদ্রূপ, "জীবই ব্রহ্ম" এই বাক্যটীর অর্থ এই যে, 'জীব' ও 'ব্রহ্ম' এই সত্য পদার্থদ্বয় অভিন্ন। কিন্তু 'জীব'কে মিথ্যা বলিয়া গ্রহণ করিলে বাক্যটী অর্থহীন হইয়া পড়ে।

মুক্তজীব ব্রহ্মের সহিত স্বীয় অভিন্নত্ব উপলব্ধি করে। কিন্তু মুক্তজীবও পৃথক্‌সত্তাবান্‌ ও ব্রহ্মের দাস। বল্লভও বিদেহমুক্তিবাদী।

(১) উপরি আলোচিত (পৃঃ ৯৮) চারিটী স্থফী মুক্তিবাদের মধ্যে, প্রথমটীর সহিত মধ্বমতের কিয়দংশে সাদৃশ্য আছে। এই প্রথম মতানুসারে, (ক) জীব সর্ব্বদাই ঈশ্বর হইতে স্বরূপতঃ ও গুণতঃ সম্পূর্ণ ভিন্ন। (খ) মুক্ত-জীবও কদাপি ঈশ্বর হইতে অভিন্ন, ঈশ্বরস্বরূপ ও ঈশ্বরগুণমণ্ডিত হইতে পারেন না। (গ) মুক্ত জীব ঈশ্বর হইতে অভিন্ন ত নহেনই, এমন কি ঈশ্বর-সদৃশও নহেন, কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন। (ঘ) মুক্তজীব ঈশ্বর হইতে পৃথক্‌ সত্তাবান্‌, দাসানুদাস ও সর্ব্বাংশে ঈশ্বরাধীন। (ঙ) বদ্ধ ও মুক্ত জীবের মধ্যে প্রভেদ ঈশ্বর হইতে ভিন্নতা ও অভিন্নতা, অথবা ঈশ্বরের সহিত সাদৃশ্যের দিক হইতে নহে—ঈশ্বরাজ্ঞাধীনতার দিক হইতে। বদ্ধজীবও সম্পূর্ণ ঈশ্বরভিন্ন, মুক্তজীবও সম্পূর্ণ ঈশ্বরভিন্ন। কিন্তু বদ্ধজীব স্বতন্ত্র ইচ্ছা ও প্রচেষ্টাশীল, ঈশ্বরাজ্ঞাবহ নহে; মুক্তজীব স্বতন্ত্র ইচ্ছা ও প্রচেষ্টাহীন, ও সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরাজ্ঞাবহ, এইমাত্র প্রভেদ।

মধ্বের মতে, (ক) জীব সর্ব্বদাই ঈশ্বর হইতে স্বরূপতঃ ও গুণতঃ সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই বিষয়ে উভয় মতে প্রভেদ নাই। (খ) মুক্ত জীবও কদাপি ঈশ্বর হইতে অভিন্ন ও ঈশ্বরস্বরূপ হইতে পারে না। কিন্তু মুক্তজীব ঈশ্বরের কোনও কোনও গুণগ্রামে বিভূষিত হয়—যথা মুক্তজীবও ঈশ্বরের ন্যায় দুঃখ-মুক্ত ও আনন্দময়। (গ) মুক্তজীব ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন না হইলেও ঈশ্বর-সদৃশ। উভয়ের মধ্যে গুণসাদৃশ্য আছে। এই বিষয়ে উভয় মতে প্রভেদ আছে। মধ্বের মতে গুণসাদৃশ্য থাকিলেও কিন্তু ভিন্নতার বাধা হয় না। মার্জ্জার ব্যাঘ্রসদৃশ হইলেও ব্যাঘ্র হইতে ভিন্ন পৃথক্‌ জন্তু; তদ্রূপ মুক্তজীব

ব্রহ্মসদৃশ হইলেও ব্রহ্মভিন্ন পৃথক্ সত্তা। (ঘ) এই বিষয়ে উভয় মত এক। উভয় মতেই প্রেমিক-প্রেমিকার সম্পর্ক অপেক্ষা প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কেই অধিক জোর দেওয়া হইয়াছে। ঈশ্বর ও মানবের সম্বন্ধ ভয়, শ্রদ্ধা, সম্ভ্রমমূলক; প্রেমোন্মাদনা বা আবেগমূলক নহে। অন্যান্য স্ফীসম্প্রদায় অবশ্য ভয় অপেক্ষা প্রেম, শ্রদ্ধা অপেক্ষা আবেগ, সম্ভ্রম অপেক্ষা উচ্ছ্বাসের উপরই জোর দিয়াছেন। কিন্তু উক্ত সনাতনপন্থী স্ফীগণ প্রেমোন্মত্ততা অপেক্ষা স্থির ধীর শ্রদ্ধামূলক ভক্তিরই অধিক পক্ষপাতী। তাঁহাদের ন্যায় মধ্বের ভক্তিও ঐশ্বর্য্যপ্রধানা (শ্রদ্ধাপ্রধানা), মাধুর্য্যপ্রধানা (রাগপ্রধানা) নহে। (ঙ) বদ্ধ ও মুক্তজীবের প্রভেদ ভিন্নতা বা অভিন্নতার দিক হইতে নহে, কিন্তু ঈশ্বরসাদৃশ্য ও ঈশ্বরাজ্ঞাবহতা এই উভয় দিক হইতে। বদ্ধজীব ঈশ্বর ভিন্ন, কিন্তু ঈশ্বরসদৃশও নহেন এবং ঈশ্বরাজ্ঞাবহও নহে। মুক্তজীব ঈশ্বর ভিন্ন, কিন্তু ঈশ্বরসদৃশ ও ঈশ্বরাজ্ঞাবহ। এই বিষয়ে উভয় মতের আংশিক (ঈশ্বর সাদৃশ্য সম্বন্ধে) প্রভেদ আছে।

(২) দ্বিতীয় স্ফী মতবাদের সহিত কিয়দংশে বল্লভের মতের সাদৃশ্য আছে। (ক) উভয় মতেই জীবজগৎ ঈশ্বরের অভিব্যক্তিরূপে ঈশ্বর হইতে অভিন্ন হইলেও মিথ্যা নহে, ঈশ্বরেরই ন্যায় সত্য। জীলীর ন্যায় বল্লভও বলিয়াছেন যে, প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরকে জগৎস্রষ্টা ও জগল্লীন বলা যায় না। যেরূপ অগ্নি বিস্ফুলিঙ্গের স্রষ্টা অথবা বিস্ফুলিঙ্গে লীন নহে, কিন্তু স্বয়ংই বিস্ফুলিঙ্গ, যেরূপ সর্প স্বীয় কুণ্ডল স্রষ্টা অথবা কুণ্ডলে লীন নহে, কিন্তু স্বয়ংই কুণ্ডল, তদ্রূপ ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেন নাই, কিন্তু স্বয়ংই জগৎ; ঈশ্বর জগতে লীনও নহেন, কিন্তু স্বয়ংই জগৎ (পৃঃ ২৫)। সুতরাং ঈশ্বর ও জগতের সম্বন্ধকে কারণ-কার্য্য সম্বন্ধ অপেক্ষা অভিব্যক্ত-অভিব্যক্তি সম্বন্ধ বলাই সমীচীন। (খ) উভয় মতের প্রভেদ এই যে, বিজ্ঞানবাদী স্ফীগণের মতে মানব ঈশ্বরের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি, অংশমাত্র নহে। অতএব ঈশ্বর ও মানব অভিন্নই কেবল নহে, সমপরিমাণও। কিন্তু বল্লভের মতে জীব ও জগৎ ঈশ্বরের আংশিক অভিব্যক্তি

মাত্র, পূর্ণ নহেন। ঈশ্বর সচ্চিদানন্দস্বরূপ, সচ্চিদানন্দময়। তিনি অচিন্ত্য শক্তিদ্বারা স্বীয় চিৎ ও আনন্দগুণকে আবৃত করিলে জগৎ, ও কেবল আনন্দ গুণকে আবৃত করিলে জীবের সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ ব্রহ্মের সৎ ও চিদ্‌গুণের আবির্ভাবই বা প্রকাশই জীব এবং তাঁহার সদ্‌গুণের আবির্ভাবই জগৎ। এই রূপে ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ, জীব সচ্চিৎস্বরূপ ও জগৎ সৎস্বরূপ। তজ্জন্য ঈশ্বর ও জীব অভিন্ন হইলেও সমপরিমাণ নহেন, যেরূপ অগ্নি ও বিস্ফুলিঙ্গ অভিন্ন হইলেও অগ্নি বিস্ফুলিঙ্গ হইতে বৃহত্তর। (গ) উভয় মতেই মুক্তজীব ঈশ্বর হইতে অভিন্ন হইলেও পৃথক্‌সত্তাবান্। (ঘ) উভয় মতেই ঈশ্বর ও জীবের নিত্য উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধ। অবশ্য বিজ্ঞানবাদী সূফীগণের মত যে এ বিষয়ে অযৌক্তিক, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে (পৃঃ ১০১)। (ঙ) উভয়-মতেই ঐশ্বর্য্যপ্রধানা ভক্তি অপেক্ষা মাধুর্য্যপ্রধানা ভক্তির স্থানই সমধিক উচ্চ। ঈশ্বর ও মানবের সম্বন্ধ প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ নহে, প্রেমিক-প্রেমিকার সম্বন্ধ।

(৩) তৃতীয় সূফীমতের সহিত অদ্বৈতমতের আপাতদৃষ্ট সাদৃশ্য আছে। (ক) সাবিস্তরির মতে অসতে সৎ পরমাত্মা প্রতিফলিত হইলে জগতের উৎপত্তি হয়। এই অসৎ কিরূপ সে সম্বন্ধে তিনি স্পষ্ট আলোচনা করেন নাই। কিন্তু ইহা শঙ্করের 'মায়ার' তুল্য। শঙ্করের মতে, মায়াশক্তির সাহায্যে ব্রহ্ম মিথ্যা জগৎ সৃষ্টি করেন, যেরূপ নিপুণ মায়াবী অথবা ঐন্দ্র-জালিক এক বস্তুর স্থলে অপর এক বস্তু সৃষ্টি করিয়া দর্শকবৃন্দকে চমৎকৃত করিয়া দেয়। পরবর্ত্তী অদ্বৈতবাদিগণের প্রতিবিম্ববাদ মতে, ব্রহ্ম মায়া বা অবিদ্যায় প্রতিবিম্বিত হইলে জগৎ প্রপঞ্চের উদ্ভব হয়। (খ) সাবিস্তরির মতে সৎ পরমেশ্বর জগতে সত্যই পরিণত হন না, কিন্তু পরিণত হইয়াছেন বলিয়া প্রতীত হন মাত্র। ইহা শঙ্করের বিবর্ত্তবাদের অনুরূপ। কারণ হইতে সত্য কার্য্যোৎপত্তির নাম 'পরিণাম'। কারণে মিথ্যা কার্য্য প্রতীতির নাম 'বিবর্ত্ত'। যথা, দধি দুগ্ধের পরিণাম, কারণ দুগ্ধ সত্যই দধিতে পরিণত হয়,

এবং কারণ দুগ্ধ ও কার্য্য দধি উভয়েই সমান সত্য। কিন্তু রজ্জুতে সর্প ভ্রম কালে, সর্প রজ্জুর বিবর্ত্ত মাত্র। এস্থলে রজ্জু রজ্জুই থাকে, সর্পে পরিণত হয় না এবং রজ্জুই কেবল সত্য, সর্প নহে। অপরিবর্ত্তনীয় ব্রহ্মও সত্যই জগতে পরিণত হন না, অতএব জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত, পরিণাম নহে। (গ) সাবিস্তরির মতে অসৎ হইতে উদ্ভূত জগৎ সৎ ও অসৎ উভয়ই। শঙ্করের মতেও, জগৎ সদসদ্‌বিলক্ষণ ও অনির্ব্বচনীয়। ইহা সৎ নহে, কারণ সৎ নিত্য, যথা ব্রহ্ম। ইহা অসৎও নহে, কারণ অসৎ প্রত্যক্ষীভূতই হয় না, যথা গগন-কুসুম। অতএব ইহা অনির্ব্বচনীয়। (ঘ) সাবিস্তরির মতে, ব্রহ্মই একমাত্র সৎ, জীব ও জগৎ মিথ্যা, মায়ামাত্র। জীব ও জীবের এবং জীব ও ঈশ্বরের ভেদ ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ। শঙ্করের মতেও এক ঘটান্তর্গত আকাশ যেরূপ অপর এক ঘটান্তর্গত আকাশ ও মহাকাশ হইতে অভিন্ন, তদ্রূপ সকল জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন—ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জীবজগৎ মিথ্যা, মায়ামাত্র। (ঙ) সাবিস্তরি বারংবার জগৎকে স্বপ্ন ও কল্পনাতুল্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু জগদ্‌ভ্রম ও স্বপ্নভ্রমের মধ্যে কোনরূপ প্রভেদ করেন নাই। কিন্তু শঙ্কর জগদ্‌ভ্রম ও স্বপ্নভ্রমের ভিতর বিশেষ প্রভেদ স্থাপন করিয়াছেন, এবং তাঁহার মতে জগৎ মিথ্যা সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা গগন-কুসুমের ন্যায় শূন্য অথবা স্বপ্নের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী নহে। অদ্বৈতবাদিগণ ত্রিবিধ সত্তার উল্লেখ করিয়াছেন—প্রাতিভাষিক, ব্যবহারিক ও পারমার্থিক। এই মতের নাম "সত্তাত্রৈবিধ্যবাদ"। এস্থলে সর্ব্বশুদ্ধ চারিটী পক্ষ সম্ভবপর হয়। প্রথমতঃ, অসৎ অথবা তুচ্ছ, অর্থাৎ যাহা কদাপি প্রত্যক্ষ করা যায় না ; যথা গগন-কুসুম। দ্বিতীয়তঃ, প্রাতিভাসিক সত্তা অর্থাৎ যাহা প্রথমে সত্যরূপে প্রত্যক্ষীভূত হয়, কিন্তু পরে শীঘ্রই অপর প্রত্যক্ষদ্বারা বাধিত বা মিথ্যা প্রমাণিত হইয়া যায় ; যথা—স্বপ্ন, রজ্জুতে সর্পভ্রম ; স্বপ্ন জাগ্রৎপ্রত্যক্ষ দ্বারা এবং সর্প প্রত্যক্ষ রজ্জুপ্রত্যক্ষ দ্বারা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। তৃতীয়তঃ, ব্যবহারিক সত্তা, অর্থাৎ যাহা প্রথমে সত্যরূপে প্রত্যক্ষ হয়, পরে ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাধিত হয়, যথা জগৎ। চতুর্থতঃ,

পারমার্থিক সত্তা, অর্থাৎ যাহা কদাপি বাধিত হয় না ; যথা ব্রহ্ম। এস্থলে প্রাতিভাসিক ও ব্যবহারিক সত্তা 'সত্তা' নামে অভিহিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে 'মিথ্যা'। 'মিথ্যা' শব্দের অর্থ, যাহা প্রথমে প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু পরে বাধিত হইয়া যায় ; অর্থাৎ যাহা আকাশ-কুসুমের ন্যায় অসৎ অথবা অপ্রত্যক্ষস্বরূপও নহে ; পুনরায় ব্রহ্মের ন্যায় অবাধিতস্বরূপও নহে ; কিন্তু প্রথমে প্রত্যক্ষ, পরে বাধিত। প্রাতিভাসিক ও ব্যবহারিক উভয়েই মিথ্যা হইলেও উভয়ের মধ্যে ভেদ আছে। প্রাতিভাসিক অপেক্ষাকৃত অল্পস্থায়ী, অর্থাৎ অধিক শীঘ্র বাধিত হইয়া যায়। প্রত্যহ প্রত্যূষে স্বপ্নভ্রমের অবসান ঘটে, এবং রজ্জুতে দৃষ্ট সর্পও শীঘ্রই বিলীন হইয়া যায়। কিন্তু ব্যবহারিক অতিদীর্ঘকালস্থায়ী, জন্মজন্মান্তরব্যাপী, এবং ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে ইহার বিনাশ নাই। অতএব অদ্বৈত মতে জগৎ মিথ্যা হইলেও স্বপ্ন বা কল্পনাতুল্য নহে। এই বিষয়ে সাবিস্তরির সহিত ইহার প্রভেদ বিদ্যমান।

ইহা ব্যতীতও ধর্ম্মের দিক হইতে শঙ্করের সহিত সাবিস্তরির মূলগত প্রভেদ। তাহা নিম্নে আলোচিত হইতেছে। ("সূফী মরমিয়াবাদ" দেখুন)।

(৪) চতুর্থ সূফী মতের সহিত রামানুজ ও নিম্বার্ক মতের কিয়দংশে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। (ক) রূমী ও হাল্লাজের মতে জীব ঈশ্বর হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন, কিন্তু ধর্ম্মতঃ অভিন্ন। রামানুজের মতে, জীব ঈশ্বর হইতে স্বরূপতঃ অভিন্ন, কিন্তু ধর্ম্মতঃ ভিন্ন। কিন্তু বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, উভয় মতের পার্থক্য কেবল শব্দগত, অর্থগত নহে। প্রথমতঃ, রূমীর মতে, জীব ঈশ্বর হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন নহে, কারণ তাহা হইলে উভয়ের মিলন ও গুণতঃ অভিন্নত্ব সম্ভব নহে। যথা, অঙ্গ অঙ্গী হইতে ভিন্ন-স্বরূপ ও পৃথক সত্তাবান্ নিশ্চয়ই, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও অঙ্গী হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বরূপও নহে। পুনরায়, রামানুজের মতে জীব ঈশ্বর হইতে স্বরূপতঃ অভিন্ন সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণ অভিন্ন নহে, কারণ তাহা হইলে জীব পৃথক্ সত্তাবান্ হইতে পারে না। অতএব রূমীর স্বরূপতঃ ভিন্নতা ও রামানুজের স্বরূপতঃ

অভিন্নতার অর্থ একই অর্থাৎ স্বরূপতঃ ভিন্নাভিন্নতা। দ্বিতীয়তঃ, রূমীর মতে জীব ঈশ্বর হইতে ধর্ম্মতঃ অভিন্ন সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণ অভিন্ন হইতেই পারে না, কিঞ্চিৎ অভিন্ন, কিঞ্চিৎ ভিন্ন এই মাত্র সম্ভব। যথা, অগ্নিতপ্ত লৌহ অগ্নির সকল গুণই প্রাপ্ত হয় না, এবং স্বীয় সকল গুণও পরিত্যাগ করে না। পুনরায় রামানুজের মতে, জীব ধর্ম্মতঃ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন নহে, কারণ অণুত্ব ও সৃষ্টিকর্তৃত্ববিহীনতা ব্যতীত আর সকল গুণেই সে ব্রহ্মের তুল্য। এ ক্ষেত্রেও কিঞ্চিৎ ভিন্নত্ব ও কিঞ্চিৎ অভিন্নত্বই কেবল সম্ভব। অতএব রূমীর ধর্ম্মতঃ অভিন্নতা ও রামানুজের ধর্ম্মতঃ ভিন্নতার অর্থ একই, অর্থাৎ ধর্ম্মতঃ ভিন্নাভিন্নতা। অতএব প্রকৃতপক্ষে রূমী, রামানুজ ও নিম্বার্কের মত একই। বস্তুতঃ নিম্নলিখিত মতত্রয়ে শব্দগত পার্থক্য থাকিলেও অর্থগত পার্থক্য নাই—

	স্বরূপ	গুণ
(১) রূমী	ভিন্ন	অভিন্ন = ভিন্নাভিন্ন
(২) রামানুজ	অভিন্ন	ভিন্ন = ভিন্নাভিন্ন
(৩) নিম্বার্ক	ভিন্নাভিন্ন	ভিন্নাভিন্ন = ভিন্নাভিন্ন

(খ) ইঁহাদের সকলের মতেই, ঈশ্বর ও জীবের নিত্যসম্পর্ক উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধ। রূমী ও নিম্বার্কের মতে ইহা প্রেমিক-প্রেমিকার সম্পর্ক, ইঁহাদের ভক্তি মাধুর্য্য-প্রধানা। কিন্তু রামানুজের মতে ইহা সেব্য-সেবক, রাজা-প্রজার সম্পর্ক, এবং রামানুজীয় ভক্তি ঐশ্বর্য্যপ্রধানা, আবেগবহুল নহে। ইহা জ্ঞানজা ভক্তি, জ্ঞানেরই চরমোৎকর্ষ মাত্র (ধ্রুবা স্মৃতি), প্রেমজা নহে।

চারিটী প্রধান সূফী মুক্তিতত্ত্বের সহিত সাধারণভাবে প্রধান পঞ্চ বেদান্ত-সম্প্রদায়োপদিষ্ট মুক্তিতত্ত্বের তুলনা করা হইল। এক্ষণে, মুক্তিতে জীবের স্বরূপ বিলোপ প্রাপ্ত হয় কি না, সে বিষয়ে বেদান্তের মত আলোচিত হইতেছে।

(১) এই মতবাদ (পৃঃ ৯৯ দেখুন) দার্শনিক দিক্ হইতে বেদান্তে দৃষ্ট হয় না। শঙ্করের মতে, জীবের ব্রহ্মে স্বরূপ লোপ অথবা লোপ না পাইবার প্রশ্নই উঠে না, কারণ জীবই স্বয়ং ব্রহ্ম। অন্যান্য বৈষ্ণব বৈদান্তিকগণের মতে, জীব ব্রহ্মাশ্রিত হইলেও পৃথক্ সত্তাবান্, তাহার স্বরূপ বিলুপ্ত হয় না।

(২) মুক্তজীবও ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ সত্তা—ইহা শঙ্কর ব্যতীত অপর সকল বৈদান্তিকেরই মত। এই বিষয়ে তাঁহারা এই শ্রেণীর স্থফীগণের সহিত একমত। (পৃঃ ১০১ দেখুন)

স্থফী মুক্তিতত্ত্ব ও ঈশ্বরের সহিত জীবজগতের সম্বন্ধ বিষয়ে বেদান্ত মুক্তিতত্ত্ব ও ব্রহ্মের সহিত জীবজগতের সম্বন্ধ তত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনার পরে, উভয় মতবাদের মূলগত পার্থক্য নির্ণয় অত্যাবশ্যক।

প্রথমতঃ, বৈদান্তিকগণের মতে দুঃখের আত্যন্তিকী নিবৃত্তি, অর্থাৎ সংসার-চক্র অথবা জন্ম পুনর্জন্ম হইতে নিস্তার মুক্তির প্রথম সোপান। দ্বিতীয় সোপান ব্রহ্মসম্মেলিত আনন্দঘন অবস্থা। স্থফীগণের মতেও বিরহজনিত শোকতাপ নিবৃত্তি মুক্তির প্রথম সোপান। কিন্তু স্থফীগণ সাধারণতঃ জন্মান্তরবাদী ও কর্ম্মফলবাদী নহেন। তাঁহাদের মতে, বর্ত্তমান জীবনই প্রথম ও শেষ। এই জীবনে ঈশ্বরের সহিত মিলন হইলে বিরহক্লেশের নিবৃত্তি হইবে। অথবা মৃত্যুর পরে স্বর্গেই তাঁহার সহিত মিলন হইবে। পুনর্জন্ম নাই। স্থতরাং, স্থফীগণের মতে মুক্তি জন্মজন্মান্তর হইতে উদ্ধার নহে, কারণ জীব স্বর্গেই গমন করুক অথবা নরকগামীই হউক, ইহাই তাহার একমাত্র জন্ম। বৈদান্তিকগণের মতে কিন্তু স্বর্গ ও মোক্ষ সম্পূর্ণ ভিন্ন। স্বর্গসুখও ঐহিক সুখের ন্যায় অশাশ্বত। মৃত্যুর পরে জীব সূক্ষ্মদেহ সংবলিত হইয়া, পুণ্য ও পাপের ফলে, স্বর্গ বা নরকে সুখ বা দুঃখ ভোগ করিয়া, পুনরায় পৃথিবীতেই প্রত্যাবর্ত্তন করে। তাহার সূক্ষ্মদেহ পুনরায় স্থূলদেহেন্দ্রিয়বিশিষ্ট হয়। কিন্তু মোক্ষের পর সূক্ষ্মদেহও ধ্বংসীভূত হইয়া যায়, এবং পুনর্জন্ম হয় না। অতএব

স্ফীগণের মতে,জীবের দুইটী অবস্থা, মর্ত্ত্য, ও স্বর্গ বা নরক। বৈদান্তিকগণের মতে ইহার তিনটী অবস্থা—মর্ত্ত্য, স্বর্গ বা নরক, ও ব্রহ্মলোক (মোক্ষ)।

স্ফীগণের মতেও মুক্তির দ্বিতীয় সোপান ঈশ্বরের সহিত সম্মেলিত অপূর্ব্ব আনন্দোন্মত্ত অবস্থা। কিন্তু এই প্রকার আনন্দে ও বেদান্তোপদিষ্ট আনন্দে স্বভাবগত প্রভেদ। (নিম্নে দেখুন পৃঃ ১১৬)।

দ্বিতীয়তঃ, স্ফীমতের সহিত বেদান্তমতের আরও গুরুতর প্রভেদ এই যে, বেদান্তের উক্ত মুক্তিতত্ত্ব দর্শনমূলক, কিন্তু স্ফীমতবাদের মুক্তিতত্ত্ব ধর্ম্মমূলক, দর্শনমূলক নহে। শঙ্কর যখন বলিতেছেন "আমিই ব্রহ্ম," রামানুজ বা নিম্বার্ক যখন বলিতেছেন "আমি ব্রহ্ম হইতে ভিন্নাভিন্ন," মধ্ব যখন বলিতেছেন "আমি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন," বল্লভ যখন বলিতেছেন "আমি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন"—এই সকলই স্থির জ্ঞানের ফল, অবশ্য সাধারণ তর্ক বা বিচারবুদ্ধি মূলক জ্ঞান নহে, প্রজ্ঞা বা অনুভবমূলক জ্ঞান (নিম্নে দেখুন) তাহা হইলেও, ইহা আবেগ-মূলক মর্ম্মোচ্ছ্বাস মাত্র নহে। কিন্তু রূমী যখন বলিতেছেন "আমিই তিনি," বায়াজিদ্ যখন বলিতেছেন "আমিই ঈশ্বর", হাল্লাজ যখন বলিতেছেন "আমিই সত্য"—এই সকল উক্তি দার্শনিক চিন্তা প্রসূত নহে, ভাবারূঢ় মিলন অবস্থার মর্ম্মোচ্ছ্বাসমাত্র, মরমী ভক্তের উক্তি মাত্র, দার্শনিকের নহে। অবশ্য স্ফীদর্শনও (বিশ্বাত্মবাদী স্ফী) ঈশ্বর ও মানবের ঐক্যস্থাপন করিয়াছে (পৃঃ ৯১)। কিন্তু ঈদৃশ ঐক্য উপলব্ধিজ্ঞানে নহে, ভাবাবেশেই সম্ভব। ঈশ্বরের সহিত মিলন হইলে ভক্তের প্রাণে যে প্রগাঢ় ভাবাবেশ, সুতীব্র প্রেমোন্মাদনা ও উচ্ছলিত বিহ্বলতার সঞ্চার হয়, তাহারই আবেগে তিনি সমগ্র বিশ্বজগৎই ঈশ্বরময় দর্শন করেন। ঈদৃশ ভাবালুতা হইতেই উক্ত ঐক্যমূলক উপলব্ধি হয়, স্থির চিন্তা, জ্ঞান বা উপাসনা হইতে নহে (পৃঃ ১২৪ দেখুন)। বৈদান্তিকগণ ব্রহ্মের সহিত একত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন স্থির, শান্ত জ্ঞানে ; স্ফীগণ ঈশ্বরের সহিত একত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন আবেগচঞ্চল প্রেমে। অতএব শঙ্করের "আমিই ব্রহ্ম" ও স্ফীগণের "আমিই ঈশ্বর" আপাতদৃষ্টিতে

একার্থক বোধ হইলেও, বস্তুতঃ সম্পূর্ণ ভিন্নার্থক। শঙ্করের ব্রহ্ম হইতে অভিন্নতা জ্ঞান,শ্রবণ,মনন ও নিদিধ্যাসনজাত বলিয়া চিরস্থায়ী। তজ্জন্য শঙ্করের মতে ব্রহ্ম-জ্ঞানোদয়ের পরে ঐক্যোপলব্ধি হইলে তাহার আর আকস্মিক বিনাশ নাই, ব্রহ্মত্ব হইতে জীবত্বে আকস্মিক রূঢ় পতনও নাই। যাহা স্থির, অচঞ্চল জ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রোথিত, তাহার আকস্মিক আবির্ভাবও যেরূপ নাই, আকস্মিক তিরোভাবও তদ্রূপ অসম্ভব। কিন্তু সূফীগণের ঐক্যোপলব্ধি ভাবাবেশমূলক বলিয়া ক্ষণস্থায়ী ও অনিত্য, ভাবাবেশ অন্তর্হিত হইলে ঐক্যোপলব্ধিও তিরোহিত হয়। এই সম্বন্ধে বহু সূফী বহু বিলাপ ও আক্ষেপ করিয়াছেন। ভাবাবেশ ও প্রেমোন্মাদনা অন্তর্হিত হইলেই পূর্ব্ববৎ ভেদজ্ঞান অথবা ভেদাভেদজ্ঞানের আবির্ভাব হয় (পৃঃ ১০২)। অতএব বৈদান্তিকগণের দর্শন ও জ্ঞানমূলক অভেদোপলব্ধি এবং সূফীগণের ধর্ম্মও আবেগমূলক অভেদোপলব্ধির মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। সূফীগণের উপলব্ধি কেবল বৈষ্ণব মরমী ভক্তগণের উপলব্ধির ন্যায়, ইহাকে বৈদান্তিক-গণের উপলব্ধির তুল্য বলা ভ্রম। যথা, ভাবাবেশাকুলা রাধা সকলই কৃষ্ণময় দর্শন এবং নিজকেও কৃষ্ণের সহিত অভিন্ন বলিয়া অনুভব করেন। ইহাই মরমী উপলব্ধি, দার্শনিক উপলব্ধি নহে। (নিম্নে "সূফী মরমিয়াবাদ" দেখুন)।

তৃতীয়তঃ, বেদান্তমুক্তির ন্যায় সূফীমুক্তিও পরিপূর্ণ আনন্দময় অবস্থা। কিন্তু উভয় আনন্দের স্বরূপ এক নহে। শঙ্করের মুক্তাত্মা আনন্দময় নহেন, স্বয়ং ব্রহ্মরূপে আনন্দ বা আনন্দস্বরূপ। বৈষ্ণব বৈদান্তিকগণের মুক্তাত্মা আনন্দস্বরূপ ও আনন্দময় উভয়ই। ব্রহ্মস্বরূপ মুক্তাত্মার আনন্দ ঈশ্বরসম্মেলিত ভক্তের আনন্দ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। প্রথমটী সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক, আবেগ (emotion) লেশহীন। ইহা পরিপূর্ণ সত্তা ও জ্ঞানের ফল, প্রেম বা প্রীতির নহে। অর্থাৎ ইহা প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞানের নির্বাধ স্ফূর্ত্তি মাত্র, আবেগ নহে। দ্বিতীয়টী আবেগবহুল, প্রীতিমূলক ও ব্যক্তিগত সম্বন্ধজাত। ঈশ্বরের সহিত ভক্তের নিত্য ব্যক্তিগত সম্বন্ধ, এবং ভাবকালে ভক্ত ঈশ্বরের সহিত একত্ব

অনুভব করিলেও, এই সম্বন্ধের অভাব ঘটে না। রামানুজ-প্রমুখ বৈদান্তিক-গণের জ্ঞানজ আনন্দও স্ফী মরমিয়াগণের প্রেমজ আনন্দ হইতে পৃথক্‌স্বরূপ। রামানুজ ও মধ্বের মতে, ঈশ্বর ও ভক্তের সম্বন্ধ জ্ঞেয়-জ্ঞাতা সম্বন্ধ। ঈশ্বর-জ্ঞান হইতে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি বা শ্রদ্ধা, এবং তাহা হইতে আনন্দের উদয়। ইহা শঙ্করের আনন্দের ন্যায় জ্ঞানস্বরূপ না হইলেও জ্ঞানমূলক। অর্থাৎ ইহা ভাববিশেষ সন্দেহ নাই, কিন্তু রস নহে, উচ্ছ্বাস, আবেশ বা উন্মাদনা নহে, শান্ত অনুভূতি মাত্র। স্ফী 'আনন্দের' ন্যায় ইহা মধুররসাকুল নহে। নিম্বার্ক ও বল্লভোপদিষ্ট মধুর আনন্দের সহিতই কেবল স্ফী ভক্তগণের আনন্দোন্মাদনার তুলনা সম্ভব। কিন্তু এস্থলেও ইঁহাদের মতবাদ অতীন্দ্রিয়বাদ মাত্র, মরমিয়াবাদ (Emotional Mysticism) নহে (নিম্নে দেখুন)। এস্থলেও পরবর্ত্তী বৈষ্ণব মরমিয়াবাদের সহিতই কেবল স্ফী মরমিয়াবাদের প্রকৃত তুলনা চলে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সাধনমার্গ

উপরে স্ফীভক্তগণের চরমোদ্দেশ্য অথবা ঈশ্বরের সহিত মিলনাবস্থার বিষয়ে আলোচনা করা হইল। এক্ষণে প্রশ্ন এই, ঈদৃশ উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় কি? স্ফীগণের মতে, 'মরমিয়া মার্গ'ই (তারিকাৎ) একমাত্র উপায়। ঈশ্বরমিলনেচ্ছু ভক্তের পক্ষে এই "মার্গই" অবলম্বন করা অত্যাবশ্যক। তজ্জন্য স্ফীগণ মানবের ঈশ্বরলাভের প্রচেষ্টাকে ঈশ্বরাভিমুখে "পর্যটন", এবং প্রচেষ্টাবান্ সাধনমার্গগামী ভক্তকে "পর্য্যটক" নামে অভিহিত করেন। ঈশ্বরের সহিত মানবের পরম বিচ্ছেদকে স্ফীগণ সপ্ত সহস্র যবনিকা বা পরদার সহিত তুলনা করিয়াছেন। এই সপ্ত সহস্র যবনিকা মানবকে ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। ইহাদের মধ্যে অভ্যন্তরবর্ত্তী অর্দ্ধসংখ্যক যবনিকা আলোকোজ্জ্বল, বহির্বর্ত্তী অর্দ্ধসংখ্যক তামসকৃষ্ণ। জন্মগ্রহণ করিবার সময় মানব আলোক

হইতে অন্ধকারে গমন করে, এবং প্রতি তামসকৃষ্ণ যবনিকার মধ্য দিয়া গমন করিবার সময় এক একটী ঐশ্বরিকগুণ পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক এক একটী মানবীয় গুণে ভূষিত হয়। পুনরায়, ঈশ্বরের নিকট প্রত্যাবর্ত্তনের সময়, মানব অন্ধকার হইতে আলোকে গমন করে, এবং প্রত্যেক আলোকোজ্জ্বল যবনিকার ভিতর দিয়া গমন করিবার সময় এক একটী মানবীয় গুণ পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক এক অকটী ঐশ্বরিক গুণে বি ভূষিত হয়।

সূফীগণের মতে ঈশ্বরমিলনেচ্ছু ভক্ত প্রথম হইতেই "পর্য্যটক" শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে না। তজ্জন্য, তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথমে গুরুর (শেখ বা পীর) নিকট গমনপূর্ব্বক সাধনমার্গের গূঢ়তত্ত্ব শিক্ষা করিতে হয়। অবশ্য গুরু শিক্ষার্থীকে প্রথমেই শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন না, কিন্তু তিনবৎসর কাল তাঁহাকে নিজের নিকট রাখিয়া তাঁহার উপযুক্ততা পরীক্ষা করেন। প্রথম বৎসর, শিক্ষার্থীকে পর-সেবাব্রত গ্রহণ করিতে হয়। দাসভাবে ধনী-দরিদ্র-নির্ব্বিশেষে মানবের সেবাই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য হয়। দ্বিতীয় বৎসর তিনি একপ্রাণে ঈশ্বরারাধনায় নিযুক্ত থাকেন। এই সময়ে, নিষ্কামভাবে ভগবানের উপাসনাই তাঁহার এক-মাত্র কর্ত্তব্য। তৃতীয় বৎসর, তিনি স্বীয় হৃদয়কে উন্নত করিতে সচেষ্ট হন। আত্মোন্নতিই এই বৎসরে তাঁহার প্রধান কাম্য। পরসেবা, ঈশ্বরোপাসনা ও আত্মোন্নতি—এই তিন বিষয়ে দীক্ষার্থী যথার্থ পারদর্শিতা দেখাইতে পারিলে, গুরু তাঁহাকে সূফীসম্প্রদায়ে দীক্ষিত করেন। অর্থাৎ তিনি তাঁহাকে সূফী-সম্প্রদায়ের চিহ্নস্বরূপ "তালি দেওয়া পরিচ্ছদে" (মুরাক্কাৎ) ভূষিত করেন। ইহা স্বেচ্ছাবলম্বিত দারিদ্র্যব্রতের প্রতীক। অতঃপর ঈদৃশ পরিচ্ছদ হইতেই তিনি সূফীরূপে পরিজ্ঞাত হইবেন। সূফীগণ ঈদৃশ সাম্প্রদায়িক পরিচ্ছদের বিভিন্ন অংশকে বিভিন্ন গুণ ও আধ্যাত্মিক অবস্থার প্রতীকরূপে গ্রহণ করেন। যথা, গুণের দিক্ হইতে ইহার গলদেশ ধৈর্য্য, হস্তদ্বয় ভয় ও আশা, মধ্যদেশ আত্মোৎসর্গ, এবং তলদেশ বিশ্বাস ও অকপটতার প্রতীক। আধ্যাত্মিক অবস্থার দিক্ হইতে, ইহার গলদেশ মানবসংস্পর্শাভাব, হস্তদ্বয় নিষ্ঠা ও

জিতেন্দ্রিয়তা, মধ্যদেশ ধ্যানাবস্থা ও তলদেশ ঈশ্বরের সহিত ঐক্যাবস্থার প্রতীক। স্ফীগণের পক্ষে ঈদৃশ পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করা অতীব দূষণীয়। গুরুকর্ত্তৃক উক্তরূপে দীক্ষিত হইবার পরই, ঈশ্বরমিলনেচ্ছু ভক্তকে "পর্য্যটক" নামে অভিহিত করা হয়, পূর্ব্বে নহে।

সাধনমার্গের বিভিন্ন সোপান (stages)

সাধনমার্গে বিভিন্ন সোপান আছে। ইহাদের সংখ্যা ও বিশেষ লক্ষণ সম্বন্ধে স্ফীগণের মধ্যে বহু মতভেদ বিগ্যমান। সাধারণতঃ তাঁহাদের মতে, সাধনমার্গের সপ্ত সোপান। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, স্ফীগণের মতে, মানব ও ঈশ্বরের মধ্যে সপ্ত সহস্র যবনিকার আবরণ, অবশ্য রূপক অর্থে। সাধনমার্গগামী "পর্য্যটক" প্রতি সোপান অতিক্রম করিলে, দশ সহস্র যবনিকা উত্তোলিত হইয়া যায়, অর্থাৎ তিনি ক্রমান্বয়ে ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হন। কোনও কোনও স্ফীর মতে—অনুতাপ, সংযম, বৈরাগ্য, দারিদ্র্য, ধৈর্য্য, ঈশ্বরে বিশ্বাস ও সন্তোষ—এই সপ্ত সোপান। মতভেদে, অনুতাপ, আত্মসংযম, বৈরাগ্য, অতীন্দ্রিয়, অধ্যাত্মজ্ঞান, প্রেম, সমাধি ও মিলন—এই সপ্ত সোপান। নিম্নে ইহাদের কয়েকটীর সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রদত্ত হইতেছে।

সকল সম্প্রদায়ের স্ফীগণের মতেই, "অনুতাপ"ই নৈতিক জীবনের প্রথম সোপান। অনুতাপদগ্ধ মানবই জগদ্বিরাগী ও ঈশ্বরানুরাগী হয়, এবং প্রথম পার্থিব ভোগসুখে বীতস্পৃহ হইয়া আধ্যাত্মিক চিন্তায় মনোনিবেশ করে। অনুতাপ দ্বিবিধ—ভয়জ ও প্রেমজ। কেহ কেহ ঈশ্বরের দণ্ডের ভয়ে ভীত হইয়াই পাপ-পথ পরিত্যাগ করে, এবং কৃত পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়। কিন্তু কেহ কেহ ঈশ্বরের অপার করুণার কথা চিন্তা করিয়া লজ্জিত হইয়াই অনুতাপ করে। এই দ্বিতীয় প্রকার অনুতাপই বহুগুণে শ্রেয়ঃ।

অনুতাপের ফলেই "আত্মসংযম" প্রচেষ্টার উদ্ভব। আধ্যাত্মিক জীবনের প্রারম্ভেই জড় আত্মাকে (নাফ্স্) (পৃঃ ৭৫ দেখুন) বশীভূত ও পবিত্র করা

অবশ্য প্রয়োজন। পার্থিব ও দৈহিক ভোগসুখ লালসা মানবকে সাধনপথ ভ্রষ্ট করে। মানব দেহবান্ হইলেও পশুর ন্যায় দেহসর্ব্বস্ব নহে। উপরন্তু, আত্মাই মানবের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, আত্মোন্নতিই মানবের শ্রেষ্ঠ কাম্য। তজ্জন্য দৈহিক সংযম অত্যাবশ্যক। সুফীগণ দৈহিকসংযমের নানাবিধ উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা, উপবাস, জীর্ণবস্ত্রপরিধান, বিলাসিতাত্যাগ, স্বেচ্ছায় দৈহিক ও মানসিক ক্লেশবরণ, ইত্যাদি। হাতিম্ আসাম্ নামক জনৈক সুফীর মতে, প্রত্যেক সুফীর চতুর্ব্বিধ মৃত্যুবরণ করা কর্ত্তব্য। যথা—(১) শ্বেত-বর্ণ মৃত্যু, অথবা উপবাস দ্বারা ক্ষুৎপিপাসা দমন, (২) কৃষ্ণবর্ণ মৃত্যু, অথবা স্বেচ্ছায় দুঃখবরণ, ও বিপদে ধৈর্য্য। (৩) রক্তবর্ণ মৃত্যু, অথবা আত্মসংযম। (৪) হরিদ্বর্ণ মৃত্যু, অথবা জীর্ণবস্ত্র পরিধান ও বিলাসিতা ত্যাগ।

"বৈরাগ্য" সংযমের নিত্যসহচর। 'বৈরাগ্য' অর্থ ধনৈশ্বর্য্যের অভাবই কেবল নহে, ধনৈশ্বর্য্যের প্রতি লোভেরও অভাব (পৃঃ ৬)। সুফীগণ সমস্ত পার্থিব বিষয়ে অনাসক্ত, ঈশ্বরই তাঁহাদের একমাত্র ধনরত্ন, একমাত্র কাম্য, অপর কিছু কাম্য তাঁহাদের নাই। এস্থলে একটী কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। বৈরাগ্য সুফী সাধনের প্রধান স্তম্ভ হইলেও, ইহার অর্থ জগতেরপ্রতি ঘৃণা ও সম্পূর্ণরূপে সংসার পরিত্যাগ নহে। অবশ্য প্রাচীন সুফীগণ সন্ন্যাস ব্রতাবলম্বীই শুধু ছিলেন না, মনুষ্যবিদ্বেষী ও সংসারত্যাগীও ছিলেন। তাঁহারা মানবের প্রতি প্রেম, দয়া, বাৎসল্য, শ্রদ্ধা প্রভৃতি মনুষ্যোচিত ভাবসমূহ সমূলে পেষণ করিয়া বিনষ্ট করিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন—এই সমস্ত তাঁহাদের নিকট ঘৃণার বস্তুই ছিল। তজ্জন্য তাঁহারা মনুষ্যসঙ্গ এবং সন্তানস্নেহ, বন্ধু-প্রীতি প্রভৃতি ভাব সযত্নে পরিহার করিয়া চলিতেন। কিন্তু পরবর্ত্তী সুফীগণের নিকট 'বৈরাগ্য' স্বার্থপ্রচোদিত কামনা ও প্রচেষ্টার অভাবই মাত্র সূচনা করিত; মানবের প্রতি প্রেম, দয়া প্রভৃতি গুণের অভাব নহে। উপরন্তু, তাঁহাদের মতে, পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক উভয় বিষয়েই অপরকে যথাসাধ্য সাহায্য করাই প্রতি সুফীর অবশ্য কর্ত্তব্য*। জামী বলিয়াছেন,—"পার্থিব প্রেমে

পরাঙ্মুখ হইও না।" অতএব, প্রকৃতপক্ষে, বৈরাগ্য বা ত্যাগের অর্থ সংসার পরিত্যাগ নহে, বাসনা পরিত্যাগ ; ঈশ্বরানুরাগ অর্থ মনুষ্যে বিরাগ নহে, পার্থিব সুখে বিরাগ।

"দারিদ্র্য" বৈরাগ্যের ফল। ইহাও সূফী সাধনের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। সূফীগণ স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যবরণই কেবল করিতেন, তাহাই নহে, সকল ভোগেচ্ছাকেও সমূলে উৎপাটিত করিতেন। কোনো কোনো সূফী সম্প্রদায় "নিন্দামার্গ" (মালামাৎ) নামক মার্গবিশেষও অনুসরণ করিতেন। অর্থাৎ তাঁহারা দেশাচার ও সামাজিক নিয়মাদি ভঙ্গ করিয়া স্বেচ্ছায় লোকনিন্দা, রাজদণ্ড, পরিহাস, ঘৃণা প্রভৃতি সাদরে বরণ করিতেন। তাঁহাদের মতে, কেবল ধনৈশ্বর্য্য ও ধনলোভেচ্ছা বর্জ্জন করিলেই প্রকৃত দরিদ্র হওয়া যায় না। সঙ্গে সঙ্গে, আত্মম্ভরিতাও অবশ্য বর্জ্জনীয়। ইহাই প্রকৃত দারিদ্র্য, প্রকৃত দীনতার লক্ষণ। আমাদের ঈশ্বরের নিকট গমন করিতে হইবে দীন-হীন, সর্ব্বহারা ভিক্ষুকরূপে। কিন্তু আত্মম্ভরিতা মানব ও ঈশ্বরের মধ্যে অতি দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান, এবং আত্মম্ভরিতা দূরীকরণের একমাত্র উপায় জগতের নিন্দা ও অপমান ভাজন হওয়া। স্বদেশবাসী, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের নিন্দা ও অপমান আমাদের আত্মম্ভরিতার শেষ বীজটুকুও নিঃশেষে ধ্বংস করিবার পরই, আমরা সর্ব্বহারা রিক্তের ন্যায় ভগবানের চরণে আত্ম-নিবেদন করিতে পারি। কিন্তু সকল সম্প্রদায়ের সূফীগণ এই মার্গ সমর্থন করেন নাই। তাঁহাদের মতে, প্রথমতঃ জগতের নিন্দাভাজন হইতে হইলে সর্ব্বদাই জগতের কথাই চিন্তা করিতে হয়, এবং ঈশ্বরের ধ্যানে ব্যাঘাত হয়। অতএব, জগতের নিন্দা বরণ করিবার প্রচেষ্টায় বৃথা কালক্ষেপ না করিয়া, জগতের নিন্দা-প্রশংসাকে সমভাবে তুচ্ছ করিয়া ঈশ্বরারাধনাতেই কালক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। দ্বিতীয়তঃ, দেশাচার ও সামাজিক রীতি-নীতি লঙ্ঘন সময়বিশেষে প্রয়োজন হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহাই যদি সূফীগণের বিশেষ লক্ষণ বলিয়া গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে প্রকৃত দোষিগণের সহিত সূফীগণের কোনই প্রভেদ

থাকিবে না, এবং বহু দুষ্ট ব্যক্তিও "নিন্দামার্গ" অনুসরণ করিবার ছলে পাপ-কার্য্যে রত হইবে।

"ধৈর্য্য" দারিদ্র্যের সহকারী অঙ্গ। ঈশ্বরলাভের জন্য দুঃখ-দারিদ্র্য অকাতরে, শান্তভাবে সহ্য করার নামই ধৈর্য্য। ধৈর্য্য প্রগাঢ় ঈশ্বর-বিশ্বাসের ফল। প্রেমস্বরূপ, পরম করুণাবান্ দয়াময় ঈশ্বরের বিধি-বিধান সর্ব্বদাই মানবের প্রকৃত মঙ্গলের জন্যই—ঈদৃশ বিশ্বাসই ধৈর্য্যের মূল ভিত্তি।

"ঈশ্বরে বিশ্বাস" ধৈর্য্যের মূলগত কারণ। সকল অবস্থাতেই আনন্দের সহিত ভগবানের বিধান মস্তকোপরি গ্রহণ, দৃঢ় বিশ্বাস হইতেই সম্ভব হয়। প্রাচীন সূফীগণের ঈশ্বর-বিশ্বাস তাঁহাদিগকে অলস, নিশ্চেষ্ট নিষ্ক্রিয়াবাদীতে পরিণত করিয়াছিল। (পৃঃ ৫ দেখুন)। তাঁহাদের ধারণা ছিল যে, ঈশ্বরে আত্মসমর্পণই মানবের একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম, অন্য কোনো কর্ত্তব্য তাহার নাই। কিন্তু পরবর্ত্তী সূফীগণ ঈশ্বর-বিশ্বাসী হইয়াও স্ব স্ব কর্ম্মপ্রচেষ্টা পরিত্যাগ করেন নাই।

"সন্তোষ" ঈশ্বর বিশ্বাসের ফল। স্বাধীন, স্বতন্ত্র ইচ্ছা সম্পূর্ণ পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক ঈশ্বরেচ্ছাতেই সর্ব্বদা পরিচালিত হওয়াই সন্তোষের লক্ষণ।

উপরিউক্ত সাধনসমূহ ধর্ম্ম জীবনের প্রাথমিক সোপান অথবা আরম্ভ মাত্র, পরিসমাপ্তি বা উচ্চতম অবস্থা নহে। এই সকল সোপান ক্রমশঃ অতিক্রম করিয়াই, মানব অবশেষে উচ্চতর ও কঠিনতর সাধনের জন্য প্রস্তুত হয়। ঈদৃশ উচ্চ সোপান চতুর্ব্বিধ—অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক জ্ঞান, প্রেম, সমাধি ও মিলন।

অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক জ্ঞান (১) (মারিফাৎ) ইন্দ্রিয়জ অথবা বিচার-বুদ্ধিপ্রসূত জ্ঞান (ইলম্) হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন (নিম্নে দেখুন)। ইহা মস্তিষ্ক-প্রসূত নহে, হৃদয়-প্রসূত। ইহা ঈশ্বরানুগ্রহে তাঁহারই দ্বারা আলোকিত ও উদ্বুদ্ধ হৃদয়জ

(১) gnosis

ঈশ্বর-স্বরূপ সম্বন্ধীয় প্রত্যক্ষ অনুভূতি বিশেষ। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, হৃদয় ঈশ্বরের সমগ্র গুণাবলীরই প্রতিচ্ছবি (পৃঃ ৭৫ দেখুন)। তজ্জন্য প্রথমতঃ উপরি উক্ত সাধন দ্বারা হৃদয়কে নির্ম্মল করিতে হইবে, যাহাতে ইহা ঈশ্বরের আলোক প্রাপ্ত হইতে পারে। যেরূপ মলিন দর্পণে সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত হওয়া অসম্ভব, তদ্রূপ পাপকামনা,—কলুষিত হৃদয়ে ঈশ্বরের আলোক বা ঈশ্বরের গুণাবলী প্রতিবিম্বিত হইতে পারে না। কিন্তু নিষ্পাপ, নির্ম্মল হৃদয়ে ঈশ্বরের সমগ্র স্বরূপ ও গুণাবলী পূর্ণ প্রতিফলিত হয়—ইহারই নাম "ঐশ্বরিক আলোক"। মানবহৃদয়ে ঈদৃশ আলোক প্রতিভাসিত হইলে, সে ঈশ্বরের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করে,—ইন্দ্রিয়, মন, মস্তিষ্ক ও বুদ্ধির সাহায্য ব্যতীতই। যেরূপ দর্পণে সূর্য্য প্রতিবিম্বিত হইলে, ক্ষুদ্র দর্পণও সমগ্র সূর্য্যকে হৃদয়ে ধারণ করে, তদ্রূপ মানবহৃদয়ে পরমাত্মস্বরূপ প্রতিবিম্বিত হইলে, হৃদয় সমগ্র ঈশ্বরসত্তাকে ধারণ করিয়া উহা প্রত্যক্ষ অনুভব করে। ঈদৃশ হৃদয়জনিত প্রত্যক্ষ উপলব্ধিই অতীন্দ্রিয় অধ্যাত্ম-জ্ঞান। ঈদৃশ জ্ঞানের উদয় হইলে ভক্ত ঈশ্বরের সহিত স্বীয় একত্ব সাক্ষাৎ উপলব্ধি করে। তৎসত্ত্বেও, এই অবস্থায় ভেদজ্ঞানের কণামাত্র অবশিষ্ট থাকে—অর্থাৎ জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞানের ভেদ। এই স্তরে পরমেশ্বরের সহিত মানবের জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয় সম্বন্ধ বলিয়া, মানব পরমেশ্বরের সহিত একত্ব উপলব্ধি করিলেও, জ্ঞাতৃরূপে পৃথক্ সত্তাবান্ থাকে।

"প্রেম" অতীন্দ্রিয় অধ্যাত্ম জ্ঞানের ভাবাবেগময় রূপ। সূফীধর্ম্মের মূলতত্ত্ব প্রেম। সূফীগণ ঈশ্বর-মানবের সম্বন্ধকে প্রেমিক-প্রেমিকার সম্বন্ধের অনুরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। 'প্রেমের' অসংখ্য লক্ষণ বা সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে, কিন্তু সূফীগণ সাধারণতঃ ইহা এক সাক্ষাৎ উপলব্ধব্য অথচ অনির্ব্বচনীয় পরমতত্ত্ব-রূপেই গ্রহণ করেন। প্রেম ও অতীন্দ্রিয় অধ্যাত্মজ্ঞান বস্তুতঃ এক,—উভয়েই ঈশ্বরসম্বন্ধীয় সাক্ষাৎ অনুভবের কারণ; কিন্তু প্রেম আবেগপ্রধান, অতীন্দ্রিয় অধ্যাত্মজ্ঞান আবেগহীন। ঈশ্বর ও মানবের মিলনসেতু প্রেম। কিন্তু এ'স্থলেও

অতীন্দ্রিয় অধ্যাত্মজ্ঞানের ন্যায়, ভেদজ্ঞানের কণামাত্র অবশিষ্ট থাকে—প্রেমিক, প্রিয় ও প্রেমের প্রভেদ। প্রেম প্রেমিক ও প্রিয়ের মধ্যে যেন ব্যবধানের সৃষ্টি করে। জ্ঞাতার ন্যায় প্রেমিকও দুই ভিন্ন বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক সূচনা করে। জ্ঞেয় না থাকিলে জ্ঞাতা, প্রিয় না থাকিলে প্রেমিক অসম্ভব। অতএব, যতকাল ভক্ত জ্ঞাতা ও প্রেমিক, ততকাল তিনি ঈশ্বরের সহিত একত্ব উপলব্ধি করিলেও, পৃথক সত্তাবানই থাকেন।

"সমাধি" অথবা উন্মাদনাই সাধনমার্গের উচ্চতম সোপান। এই অবস্থায়, ভেদজ্ঞানের লেশমাত্রও থাকে না, ভাবোন্মত্ত ভক্তের পৃথক সত্তা ঈশ্বরে বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং তিনি ঈশ্বরের সহিত সম্পূর্ণ একত্ব উপলব্ধি করেন। এই অবস্থাকে "উচ্চতর অতীন্দ্রিয় অধ্যাত্মজ্ঞান" নামে অভিহিত করা হয়।

এই অবস্থাই ঈশ্বরের সহিত পরিপূর্ণ মিলনের কারণ। অতএব ঈশ্বরের সহিত মিলন, তাঁহার সহিত অভেদোপলব্ধি, ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষমূলক, বিচারবুদ্ধিজাত, এমন কি অতীন্দ্রিয় অধ্যাত্মজ্ঞানমূলক বা প্রেমমূলক নহে—উন্মাদনামূলক। ইন্দ্রিয়সমূহ পার্থিব বস্তুজাত গ্রহণেই কেবল সমর্থ, কিন্তু অনন্ত, অসীম পরমাত্মার প্রত্যক্ষ তাহাদের সাধ্যাতীত। বিচারবুদ্ধি দ্বারা প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্ভবপরই নহে। অনুমান স্বভাবতঃই পরোক্ষ। যথা—"পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ"—পর্ব্বতে ধূম দৃষ্ট হইতেছে, অতএব পর্ব্বতে অগ্নিও আছে। এস্থলে পর্ব্বতে ধূমের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ জ্ঞানমূলক, কিন্তু পর্ব্বতে অগ্নির অস্তিত্ব পরোক্ষ জ্ঞানমূলক। এস্থলে অগ্নি প্রত্যক্ষ দৃষ্টীভূত হইতেছে না, কিন্তু প্রত্যক্ষদৃষ্ট ধূমজ্ঞান হইতে অনুমিত হইতেছে মাত্র। অতএব অনুমান, তর্ক বিচারবুদ্ধি প্রভৃতি দ্বারা প্রত্যক্ষজ্ঞান অলভ্য। (নিম্নে "সূফী মরমিয়াবাদ" দেখুন"।) অতীন্দ্রিয় অধ্যাত্মজ্ঞান প্রত্যক্ষজ্ঞান সন্দেহ নাই, তথাপি এস্থলেও জ্ঞাতা-জ্ঞেয় সম্বন্ধ থাকার জন্য ঈশ্বরের সহিত সম্পূর্ণ স্বরূপোপলব্ধির কিঞ্চিৎ বাধা জন্মে। প্রেমও তথৈব চ। কিন্তু ভাবোন্মাদনাময় সমাধি অবস্থাতে ভক্ত ঈশ্বরকে জানেনও না, তাঁহার প্রতি প্রেমাসক্তও হন না কিন্তু স্বয়ংই ঈশ্বরে পরিণত হন। এস্থলে

তাঁহার ঈশ্বরের জ্ঞান ও ঈশ্বরের জন্য প্রেম পর্য্যন্ত নাই, কারণ তিনি স্বয়ংই ঈশ্বর হইয়া গিয়াছেন। অতএব ঈশ্বরের সহিত ঈদৃশ অভেদ উপলব্ধি দর্শনমূলক নহে, পরিপূর্ণভাবে ভাবোন্মত্ত অবস্থার ফল। এই বিষয়ে স্থফীগণের ঐক্যোপলব্ধির সহিত শঙ্করের ঐক্যোপলব্ধির মূলগত প্রভেদ। (পৃঃ ১১৬)

"সোপান" ও "অবস্থা"

স্থফীগণ "সোপান" (stages or stations) এবং "অবস্থা"য় (states) প্রভেদ করেন। "সোপান" (মাকাম্) অর্থ সাধনমার্গান্তর্গত বিভিন্ন নৈতিক সাধনা, "অবস্থা" (হাল্) অর্থ মানসিক আধ্যাত্মিক ভাববিশেষ। "সোপান" স্বপ্রচেষ্টালভ্য ; "অবস্থা" ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে হৃদয়ে আবির্ভূত হয়, এবং মানবের স্বায়ত্ত অথবা স্বপ্রচেষ্টালব্ধ নহে। যথা—ভয়, আশা, শান্তি, নিশ্চয়তা ইত্যাদি।

ভগবৎপ্রসাদ

স্থফীগণের মতে, ঈশ্বরের প্রসাদ বা অনুগ্রহই ঐহিক পারলৌকিক সকল উদ্দেশ্যসিদ্ধির মূল কারণ। উপরি উক্ত নৈতিক সাধনাবলী বা ধর্ম্মমার্গের "সোপান" স্বপ্রচেষ্টালভ্য হইলেও, পরিশেষে তাহা ভগবদনুগ্রহেরই ফল। ঈশ্বর কৃপাপূর্ব্বক মানবের নিকট তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ না করিলে তাঁহাকে উপলব্ধি করা ক্ষুদ্র মানবের অসাধ্য। অতএব, অতীন্দ্রিয় অধ্যাত্মজ্ঞান, প্রেম, সমাধি ও মিলন সকলই পরিশেষে ঈশ্বরপ্রসাদলভ্য। ইহা ব্যতীত, অনুতাপপ্রমুখ প্রাথমিক সাধনাবলীও ঈশ্বরকৃপারই ফল। এই মতবাদ স্থফীগণের ঈশ্বরেচ্ছাবাদেরই (Determinism) ফল। ইহা নিম্নে আলোচিত হইতেছে।

প্রশ্ন হইতে পারে, ঈশ্বরানুগ্রহের কারণ কি ? কি কারণ বশতঃ কেহ কেহ ঈশ্বরের অনুগ্রহভাজন, অপরে নহে ? এ সম্বন্ধে স্থফীগণ দ্বিমত। প্রথম মতানুসারে (কালাবাধী প্রভৃতি), আমরা ঈশ্বরের নিকট কিছুই অধিকাররূপে দাবী করিতে পারি না, কিন্তু অনুগ্রহরূপে ভিক্ষা করিতে পারি মাত্র। তজ্জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহ, দান প্রভৃতির কারণ আমাদের সৎকার্য্যাবলী নহে;

ঈশ্বরের স্বেচ্ছাচার মাত্র (নিম্নে দেখুন পৃঃ ১২৭)। দ্বিতীয় মতানুসারে (জীলী প্রভৃতি), আমাদের সৎকার্য্যাবলীর জন্য আমরা ঈশ্বর হইতে অনুগ্রহ দাবীই করিতে পারি, ভিক্ষা নহে। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ হইলেও স্বেচ্ছাচারী নহেন, এবং তাঁহার অনুগ্রহ অকারণে বর্ষিত হয় না। মানবের যথাসাধ্য অকপট প্রচেষ্টার পুরস্কার-স্বরূপই তিনি তাঁহাদিগকে স্বয়ং সাহায্য-দানে অগ্রসর হন।

বেদান্তমতে, অনুতাপ, সংযম, বৈরাগ্য, দারিদ্র্য, ধৈর্য্য, ইত্যাদি সাধন-মার্গের প্রথম সোপান মাত্র। ইহারা নিষ্কাম কর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত। ঈদৃশ কর্ম্ম ও শাস্ত্রোপদিষ্ট নিত্য, নৈমিত্তিক কর্ম্মের যথাযথ সম্পাদন দ্বারা চিত্তমল প্রক্ষালিত হয়, এবং নির্ম্মল চিত্তই সাধন-মার্গের প্রথম প্রয়োজন। সকল বৈদান্তিকগণের মতেই, অবিদ্যা বা অজ্ঞান বন্ধের মূলীভূত কারণ, অতএব বিদ্যা বা জ্ঞানই মুক্তির কারণ। শঙ্করের মতে, জীব ও ব্রহ্মের অভেদ জ্ঞানই মুক্তির একমাত্র উপায়। 'শ্রবণ', 'মনন' ও 'নিদিধ্যাসন' দ্বারা অবশেষে সাক্ষাৎ ব্রহ্মোপলব্ধি হইলে মুক্তিলাভ হয়। ("সূফী মরমিয়াবাদ" দেখুন)। বৈষ্ণব বৈদান্তিকগণের মতে, ব্রহ্মজ্ঞান ও তৎসহ ভক্তি ও উপাসনা দ্বারা ভগবৎপ্রসাদ লব্ধ হইলে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার, ব্রহ্মোপ-লব্ধি বা মুক্তিলাভ হয়। সকল বৈদান্তিকগণেরই মতে, ঈদৃশ উপলব্ধি বিচারবুদ্ধি-লভ্য জ্ঞান নহে, অতীন্দ্রিয় জ্ঞান। তাহা হইলেও, ইহা সূফী অতীন্দ্রিয়-জ্ঞানের তুল্য নহে (নিম্নে "সূফী মরমিয়াবাদ" দেখুন)।

শঙ্করের মুক্তিতে ভগবৎপ্রসাদের প্রয়োজন নাই। বস্তুতঃ, পারমার্থিক [illegible] হইলেই, জীব স্বীয় ব্রহ্মত্ব সাক্ষাৎ উপলব্ধি করে। কিন্তু বৈষ্ণব বৈদান্তিকগণের মতে, ঈশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতীত মুক্তি নাই। অবশ্য, ঈদৃশ অনুগ্রহ কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি ও উপাসনা লভ্য। প্রকৃত ভক্তকে মুক্তির উপযোগী বলিয়া মনে করিলে, ঈশ্বর তাঁহার নিকট স্বীয় স্বরূপ প্রকটিত করেন।

ঈশ্বরেচ্ছাবাদ ও স্বাধীনেচ্ছাবাদ

সংক্ষেপে, ঈশ্বরেচ্ছাবাদ (Determinism) অনুসারে প্রাকৃতিক ঘটনার ন্যায় মানবের কার্য্যাবলীও সম্পূর্ণ ঈশ্বরেচ্ছা প্রসূত, অর্থাৎ পূর্ব্ব হইতেই ঈশ্বর-প্রণোদিত ও ঈশ্বর-নির্দ্ধারিত। মানবের স্বাধীন ইচ্ছা বা কর্ম্মপ্রবৃত্তি বলিয়া কিছুই নাই। মানব যাহা করিয়াছে, যাহা করিতেছে ও যাহা করিবে, তাহা সকলই ঈশ্বর পূর্ব্ব হইতে নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। স্বাধীনেচ্ছাবাদ (Free Will) অনুসারে, মানব স্বাধীনেচ্ছাবান্, বিচার-বুদ্ধিশীল, চেতন প্রাণী। অতএব জড-বস্তুর ন্যায় মানব পরচালিত হইতে পারে না। সুতরাং মানবের কার্য্যাবলী স্বাধীন চিন্তা ও ইচ্ছা প্রসূত—মানব স্বাধীন কর্ত্তা।

সুফীগণ সাধারণতঃ ঈশ্বরেচ্ছাবাদী, এবং ঈশ্বরেচ্ছা ও স্বাধীনেচ্ছার সমন্বয় সাধনে বহু ব্যর্থ চেষ্টাও করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে কালাবাধীর মত আলোচনীয়। তাঁহার মতে, ঈশ্বর যেরূপ মানবের স্বরূপ ও গুণাবলীর স্রষ্টা, তদ্রূপ তাহার কর্ম্মাবলীরও স্রষ্টা। সুতরাং মানব কর্ত্তা হইলেও স্বাধীন কর্ত্তা নহে। উপরন্তু, তাহার ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সকল কর্ম্মই ঈশ্বর পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। কালাবাধী উক্ত মতবাদের জন্য নিম্নলিখিত প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন :—

(১) কোরাণে লিখিত আছে—"ঈশ্বর সর্ব্বস্রষ্টা" (সুরা ১৩-১৭)। অতএব তিনি মানবের কর্ম্মসমূহেরও স্রষ্টা বা নির্দ্ধারক। (২) বিচার পূর্ব্বকও একই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। মানব যে ঈশ্বরের দাস, ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত সত্য। কিন্তু দাস কদাপি স্বাধীন কর্ত্তা হইতেই পারে না। (৩) স্বরূপ ও গুণাবলী অপেক্ষা কর্ম্মাবলী অধিক সংখ্যক। অতএব ঈশ্বর মানবের স্বরূপ ও গুণাবলীরই মাত্র স্রষ্টা, এবং মানব স্বয়ং স্বীয় কর্ম্মাবলীর স্রষ্টা হইলে,মানবের সৃষ্টিই ঈশ্বরের সৃষ্টি হইতে শ্রেয়ঃ হইয়া পড়ে। অর্থাৎ, মানবই ঈশ্বরাপেক্ষা অধিকতর শক্তিমান্ ও দক্ষতাসম্পন্ন হয়। কিন্তু দাস কিরূপে প্রভু হইতে উচ্চ হইবে? (৪) কোরাণের মতে ঈশ্বর কেবল সর্ব্বস্রষ্টাই নহেন, তিনি

ব্যতীত অপর স্রষ্টাও কেহ আর নাই (সুরা ১৩-১৭)। অতএব, মানব স্বীয় কর্ম্মস্রষ্টা হইতে পারে না। সর্ব্বদোষশূন্য পরমাত্মা কিজন্য পাপ-কর্ম্মও সৃষ্টি করিয়াছেন? এই প্রশ্নের উত্তরে কালাবাধী কোরাণের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর যদি দুষ্ট স্বরূপের স্রষ্টা হইতে পারেন, তাহা হইলে, তিনি দুষ্ট কার্য্যও সৃজন করিতে পারেন।

পুনরায়, প্রশ্ন হইতে পারে, সকল কর্ম্মই যদি ঈশ্বরেচ্ছাপ্রসূত হয়, তাহা হইলে মানব স্বীয় কর্ম্মের জন্য দায়ী নহে, এবং তজ্জন্য পুরস্কার্য্য অথবা দণ্ডার্হও নহে। অতএব, নীতি-বিচারের লোপ হয়। কিন্তু, যদি মানব স্বাধীনেচ্ছা-বান্ হয়, তাহা হইলেও ঈশ্বরের প্রভুত্বের হানি হয়। কালাবাধী ইহার নিম্নলিখিতরূপ সমাধান করিয়াছেন। ঈশ্বর সকল কর্ম্মেরই স্রষ্টা। 'অকস্মাৎ কম্পনের' ন্যায় স্বতঃ সংঘটিত (involuntary), এবং বিভিন্ন পন্থার মধ্যে একটীর নির্ব্বাচনের ন্যায় স্বেচ্ছাকৃত (voluntary) কর্ম্ম সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারী। কিন্তু উক্ত উভয়বিধ কর্ম্মের মধ্যে প্রভেদ এই যে, প্রথম ক্ষেত্রে ঈশ্বর কেবল কার্য্যটীরই সৃষ্টি করেন; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, তিনি কার্য্য এবং তৎসঙ্গে স্বাধীন ইচ্ছারও সৃষ্টি করেন। যথা—আকস্মিক প্রচণ্ড শব্দ হইলে, একব্যক্তি তৎক্ষণাৎ লম্ফপ্রদান করিল। এস্থলে, ঈশ্বর পূর্ব্ব হইতেই 'লম্ফ'রূপ কার্য্যটী নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু পুনরায় পথিমধ্যে একটী স্বর্ণালঙ্কার পড়িয়া আছে, একব্যক্তি উহা দর্শন করিল, তুলিয়া লইবে কি না ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিল, অবশেষে স্বাধীনভাবেই উহা চুরি করিয়া পলায়ন করিতে কৃতসংকল্প হইল। এস্থলে, ঈশ্বর 'চৌর্য্য'রূপ কার্য্যটী, তৎসঙ্গে সেই ব্যক্তির চৌর্য্যসম্বন্ধীয় স্বাধীনেচ্ছাও সৃষ্টি করিয়াছেন, কারণ এস্থলে সেই ব্যক্তি স্বাধীন চিন্তা দ্বারাই চৌর্য্য-রূপে কার্য্যে রত হইল।

উক্ত মতবাদের কেবল এই অর্থই হইতে পারে যে, ঈশ্বরের দিক্ হইতে 'চৌর্য্য'রূপ কার্য্যটী পূর্ব্বনির্দ্ধারিত, কারণ সেই ব্যক্তি উপস্থিতক্ষেত্রে কি ভাবে

কার্য্য করিবে, তাহা তিনি প্রথম হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু সেই ব্যক্তির দিক্ হইতে ইহা স্বাধীনেচ্ছাপ্রসূত, কারণ সে নিজেই ইতস্ততঃ করিল, চিন্তা করিল, ইচ্ছা করিল, অবশেষে স্বাধীনভাবেই 'গ্রহণ' ও 'বর্জ্জন' এই দুইটী কার্য্যের মধ্যে, একটী, অর্থাৎ 'গ্রহণ', নির্ব্বাচন পূর্ব্বক চৌর্য্যে রত হইল। এক্ষেত্রে কেহই তাহাকে বাহির হইতে বলপ্রয়োগ করিয়া এই কার্য্যে রত করায় নাই, সে নিজেই ইহা করিয়াছে। কালাবাধী বলিয়াছেন যে বাধ্যবাধকতার (Compulsion) অর্থ এই যে, যে কর্ম্ম আমরা করিতে অনিচ্ছুক, তাহাই করিতে বাধ্য হইতেছি ; অথবা যে কর্ম্ম আমরা করিতে ইচ্ছুক, তাহাই আমরা করিতে বাধাপ্রাপ্ত হইতেছি। যথা, একটী বালক পাঠ শিক্ষা করিতে চাহে না, খেলা করিতেই ইচ্ছুক, কিন্তু পিতার শাসনের ভয়ে সে পাঠে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এস্থলে 'পাঠ'রূপ কার্য্যটী স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কার্য্য নহে, স্বেচ্ছাবিরুদ্ধ বাধ্যতামূলক কার্য্য। কিন্তু পিতার শাসনের ভয় না থাকিলেও যদি সে স্বেচ্ছায় পাঠে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলেই উহা স্বাধীনেচ্ছা-প্রসূত কার্য্য। কিন্তু বালকের দিক্ হইতে, বালকের নিকট ইহা স্বাধীনেচ্ছা-প্রসূত কার্য্য হইলেও, প্রকৃতপক্ষে ইহা ঈশ্বরনির্দ্ধারিত, কারণ প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরই তাহার ইচ্ছা বা প্রবৃত্তির জনক, সে স্বয়ং নহে। অতএব ঈশ্বর অবশ্য আমাদের সাক্ষাৎ অনুভূত ইচ্ছার বিরুদ্ধে কর্ম্মে নিয়োজিত করেন না। তিনি কেবল আমাদের হৃদয়ে ইচ্ছা, প্রবৃত্তি প্রভৃতি রোপণ করেন, এবং এই সকল হইতেই পরে কার্য্যের স্বয়ং উদ্ভব হয় এবং কোনরূপ বাধ্যবাধকতা আমরা অনুভব করি না। কালাবাধী স্বেচ্ছাকৃতকর্ম্মের কারণসমূহ ব্যাখ্যাপূর্ব্বক ইহা স্পষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মানবের দিক্ হইতে স্বেচ্ছাকৃত কর্ম্মের কারণ ত্রিবিধ—হস্ত, পদ প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়, কর্ম্মশক্তি ও কর্ম্মেচ্ছা।। যথা—কুম্ভকার ঘট নির্ম্মাণ করে। ইহা স্বেচ্ছাকৃত কর্ম্ম। এস্থলে, প্রথমতঃ, তাহার প্রয়োজনীয় ইন্দ্রিয়সমূহ থাকা আবশ্যক ; দ্বিতীয়তঃ, তাহার ঘটনির্ম্মাণের শক্তিও তুল্য আবশ্যক ; তৃতীয়তঃ, ঘটনির্ম্মাণের জন্য তাহার ইচ্ছাও থাকা

প্রয়োজন। এস্থলে এই তিনপ্রকার কারণই ঈশ্বরের দ্বারাই নির্ণীত। তিনি ইন্দ্রিয়াদি সৃষ্টি করেন, শক্তি সৃষ্টি করেন, ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, তৎপরে নিরস্ত হন, এবং স্বয়ং আর হস্তক্ষেপ না করিয়া, প্রকৃত কার্য্যটাকে এই সকল পূর্ব্বসৃষ্ট কারণসমূহ হইতে স্বতঃই উদ্ভূত হইতে দেন।

অতএব সংক্ষেপে, কালাবাধীর মতে, ঈশ্বর প্রত্যক্ষভাবে বা সাক্ষাদ্‌ভাবে মানবকে কার্য্য করিতে বাধ্য করেন না, তিনি কেবল মানবমনে কতিপয় ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির সৃষ্টি করেন যাহা হইতে কার্য্যটী স্বতঃই উদ্ভূত হয়। ঈশ্বর স্বাধীন ইচ্ছার সৃষ্টি করেন, এবং স্বাধীন ইচ্ছা হইতে স্বাধীন কর্ম্মের উদয় হয়। অতএব তত্ত্ববিদ্যার দিক্ হইতে ঈশ্বরই সকল কর্ম্মের স্রষ্টা, কারণ কর্ম্ম স্বাধীনেচ্ছাপ্রসূত এবং স্বাধীনেচ্ছা ঈশ্বরপ্রসূত। কিন্তু মনোবিদ্যার দিক্ হইতে মানব স্বয়ংই কর্ম্মের স্রষ্টা, কারণ সে স্বয়ং স্বীয় কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারিত করে। এইরূপে কালাবাধী ঈশ্বরেচ্ছাবাদের সহিত স্বাধীনেচ্ছাবাদের সমন্বয় স্থাপনের প্রচেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, ঈশ্বরই সর্ব্বকর্ম্মস্রষ্টা হইলেও মানব স্বাধীন কর্ত্তা, কারণ সে কোনরূপ বাধ্যবাধকতা অনুভব করে না, উপরন্তু এইরূপই অনুভব করে যে, সে নিজেই নিজের কর্ম্মপন্থা স্থির করিতেছে।

মানব স্বাধীনকর্ত্তা বলিয়া সে স্বয়ং তাহার কর্ম্মের জন্য দায়ী এবং তজ্জন্য কর্ম্মের পুরস্কার ও দণ্ডও তাহারই প্রাপ্য। পুণ্যের পুরস্কার স্বর্গ, পাপের শাস্তি নরক। কিন্তু কালাবাধীর মতে মানব পুণ্যকর্ম্মের জন্য পুরস্কার দাবী করিতে পারে না, ভিক্ষা করিতে পারে মাত্র। মানবের নিজ যোগ্যতা বা অযোগ্যতার কোনই প্রশ্ন এস্থলে উঠে না—ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রশ্নই কেবল উঠে। যদি বলা হয়, মানব পুরস্কারযোগ্য, মানব পুণ্যার্জ্জন করিয়াছে, অতএব অবশ্যই স্বর্গ তাহার প্রাপ্য, তাহা হইলে ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তার হানি হয়। অর্থাৎ, সেস্থলে ঈশ্বর মানবকে পুণ্যকর্ম্মের জন্য পুরস্কৃত করিতে বাধ্য, ইচ্ছা থাকুক আর নাই থাকুক, কিন্তু এরূপ বাধ্য- বাধকতা সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের পক্ষে অসম্ভব। অতএব তিনি ইচ্ছা করিলে পুণ্য-

বান্‌কে দণ্ডিত ও পাপীকে পুরস্কৃত করিতেও পারেন। মানব ঈশ্বরের দাস, এবং দাসের প্রভুর নিকট দাবী কিছুই নাই—প্রভু তাহাকে যাহা দান করেন তাহা স্বীয় ইচ্ছানুসারে ভিক্ষারূপে মাত্র, দাসের স্বোপার্জ্জিত অধিকাররূপে নহে। অতএব স্বোপার্জ্জিত পুণ্যের জন্য মানবের ঈশ্বরের অনুগ্রহে অধিকার কিছুই জন্মে না, এবং ঈশ্বরও তাহাকে অনুগৃহীত করিতে বাধ্য নহেন। তিনি যথেচ্ছা অনুগ্রহ ও নিগ্রহ করেন, পাপ ও পুণ্যানুসারে নহে। অতএব তিনি যদি সকল পুণ্যাত্মগণকে দণ্ডিত ও সকল পাপিগণকে পুরস্কৃত করেন, তাহা হইলেও তাঁহার অন্যায় হয় না। অবশ্য যদিও ঈশ্বর পুণ্যাত্মগণকে দণ্ডিত ও পাপিগণকে পুরস্কৃত করিতে পারেন, তথাপি তিনি তাহা করেন না, কারণ, তিনি স্বয়ং পুণ্যের পুরস্কার ও পাপের শাস্তি ঘোষণা করিয়াছেন। ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে পারেন না। তজ্জন্যই জগতে পুণ্যের ফল পুরস্কার, পাপের ফল দণ্ড। প্রশ্ন হইতে পারে—ঈশ্বর এরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন কেন? উত্তর এই যে, তাঁহার প্রতিজ্ঞার প্রথম কারণ নীতিধর্ম্মের উন্নতি—কারণ পুণ্যের ফল পুরস্কার হইলে মানব স্বতঃই পুণ্যপথে প্রবৃত্ত হইবে। দ্বিতীয়তঃ, ইহা তাঁহার অসীম করুণারই পরিচায়ক। তিনি পুরস্কার প্রদানে বাধ্য নহেন, অথচ পুরস্কার প্রদান করিতেছেন—ইহা তাঁহার সহৃদয়তার প্রমাণ।

অতএব কালাবাধী উক্ত মতবাদের দ্বারা ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব ও সর্ব্ব-করুণাময়ত্ব প্রমাণ করিতে প্রচেষ্টা করিয়াছেন। প্রথমতঃ, ঈশ্বর সর্ব্বশক্তি-মান্ প্রভু, সুতরাং তিনি নৈতিক বা আধ্যাত্মিক কোন প্রকার নিয়মকানুনের দ্বারাই আবদ্ধ নহেন, এবং পুণ্য ও পাপের জন্য পুরস্কার ও দণ্ডপ্রদান করিতেও বাধ্য নহেন। দ্বিতীয়তঃ, বাধ্য না হইলেও, তিনি করুণাবশতঃ পুণ্যাত্মগণকে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। যদি তিনি ব্যধ্য হইয়া পুণ্যের পুরস্কার প্রদান করিতেন, তাহা হইলে, তাহা তাঁহার করুণার পরিচায়ক হইত না। কিন্তু তিনি এতদ্রূপে বাধ্য নহেন, তথাপি মানবগণকে স্বেচ্ছায় কৃপা করেন—ইহা তাঁহার অসীম করুণারই লক্ষণ।

কালাবাধীর মতবাদ অবশ্য যুক্তিসঙ্গত নহে। তাঁহার মতে, মানব নিজেকে নিজে স্বাধীনকর্ত্তা বলিয়া মনে করে, এবং তজ্জন্যই সে প্রকৃতই স্বাধীনকর্ত্তা। স্বাধীনকর্ত্তা বলিয়া সে স্বয়ং স্বীয় কর্ম্মের জন্য দায়ী, এবং এতদ্রূপে পুরস্কারার্হ ও দণ্ডার্হ। কিন্তু সে নিজে নিজেকে স্বাধীনকর্ত্তা বলিয়া মনে করিলেও, ঈশ্বর জানেন যে সে প্রকৃতই তাহা নহে—কারণ যে সকল ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি তিনি স্বয়ংই পূর্ব্ব হইতে তাহার মনে বপন করিয়াছিলেন, সেই সকল ইচ্ছা ও প্রবৃত্তিবিশেষ হইতেই কর্মের উদ্ভব হয়। অতএব যেহেতু ঈশ্বর জানেন যে সে প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন কর্ম্মী নহে, সেহেতু তিনি তাহাকে তাহার কর্ম্মের জন্য দায়ীও করিতে পারেন না, বিচারও করিতে পারেন না। হাল্লাজ এই প্রশ্নের সমাধান করিতে অসমর্থ হইয়া হতাশভাবে বলিয়াছেন, "ঈশ্বর তাহার হস্তদ্বয় পশ্চাতে বন্ধন করিয়া তাহাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু বলিলেন, 'সাবধান জলে ভিজিও না'।" যদি ঈশ্বর তাহাকে হস্তপদ শৃঙ্খলিত করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপই করেন, তাহা হইলে তিনি পুনরায় তাহাকে জলে না ভিজিতে আদেশ করিতে পারেন কিরূপে, এবং আদেশ পালন না করিলে দণ্ডিতও করিতে পারেন কোন ন্যায়বিচার অনুসারে? ঈশ্বর যদি কেবল স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবার শক্তিরই সৃষ্টি করিতেন, এবং মানবকে সেই শক্তি অনুসারে কার্য্য করিতে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিতেন, তাহা হইলেই কেবল মানবের কর্ম্ম প্রকৃতই স্বাধীন কর্ম্ম হইত। কিন্তু কালাবাধীর মতে ঈশ্বর স্বাধীন কর্ম্মের শক্তিমাত্র, অর্থাৎ বিভিন্ন কর্ম্মপন্থার মধ্যে একটীকে স্বেচ্ছায় নির্ব্বাচনের শক্তিমাত্র, সৃষ্টি করেন না। উপরন্তু তিনি শেষ নির্ব্বাচন বা প্রবৃত্তিই স্বয়ং সৃষ্টি করেন। এবং কর্ম্ম প্রবৃত্তিই যদি ঈশ্বর নির্দ্ধারিত হয়, কার্য্যটীও তাহাই, স্বেচ্ছাকৃত নহে।

দ্বিতীয়তঃ, ঈশ্বর যদি পুণ্যকর্ম্মের জন্য পুরস্কার প্রদানে বাধ্যই থাকেন, তাহা হইলে উহা তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তার হানিকারক নহে। ঈশ্বর কেবল সর্ব্বশক্তিমান্ই নহেন, ন্যায়পরায়ণও নিশ্চয়। তাঁহার ন্যায়পরায়ণস্বরূপই তাঁহাকে ন্যায়ের অমোঘ বিধানদানে বাধ্য করে, অপর কোনও বহিঃস্থ শক্তি

নহে। অতএব ইহা তাঁহার দুর্ব্বলতার পরিচায়ক নহে। যথা, সন্তানগণের পিতার স্নেহে অধিকার আছে, ইহা তাহারা দাবীই করিতে পারে, ভিক্ষা নহে। কিন্তু তজ্জন্য পিতা দুর্ব্বলস্বভাব হইয়া পড়েন না। উপরন্তু, পিতাকে 'পিতা' বলা হয় এই জন্যই কেবল যে, তিনি সন্তানগণকে স্নেহ করিতে বাধ্য,—ইহাই তাঁহার স্বরূপ।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, (পৃঃ ১২৬) সকল সূফীগণ উক্ত মতবাদ গ্রহণ করেন না।

বৈদান্তিকগণ সকলেই কর্ম্মবাদী। ন্যায়ের অমোঘ বিধানানুসারে, কর্ম্ম-কর্ত্তাই স্বয়ং কর্ম্মের ফলাফলের জন্য দায়ী, এবং কর্ম্মের ফল, ভাল অথবা মন্দ, তাহাকেই ভোগ করিতে হয়, বর্ত্তমান জীবনে অথবা জন্মান্তরে। কর্ম্মের ফল সম্পূর্ণ উপভুক্ত না হইলে মুক্তি নাই। ভারতীয় জন্মজন্মান্তরবাদ ঈদৃশ কর্ম্ম-বাদেরই ফল। অতএব কর্ম্মের ফল জীবের প্রাপ্য, ইহাতে তাহার পূর্ণ অধিকার, ইহা সে দাবীই করিতে পারে, ভিক্ষা নহে। স্বয়ং ঈশ্বরও কর্ম্মের ফল অবহেলা করিতে পারেন না, উপরন্তু তিনি জীবের কর্ম্মানুসারেই সৃষ্টি করেন।

এ স্থলে একটী আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। বেদান্তমতে, ব্রহ্ম জীবের অন্তর্য্যামী। তাহা হইলে, কর্ম্মের মূলে যে প্রবৃত্তি, তাহা তাঁহার দ্বারাই নির্দ্ধারিত, এবং জীব স্বীয় কর্ম্মের জন্য দায়ী নহেন। ইহার উত্তর এই যে, ব্রহ্ম অন্তর্য্যামী হইলেও নির্ব্বিকার সাক্ষী মাত্র। তিনি স্বয়ং কর্ম্মকর্ত্তা নহেন, তজ্জন্য ভোক্তাও নহেন। ঋগ্বেদে (১-১৬৪-২০) জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে সমবৃক্ষাশ্রয়ী, পরস্পর সংযুক্ত, সখ্যভাবাপন্ন পক্ষিদ্বয়ের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে একজন (জীবাত্মা) মিষ্ট ফল ভক্ষণ করে, অপর জন (পরমাত্মা) ভক্ষণ না করিয়া কেবল দর্শন করে। পরমেশ্বর জীবকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি প্রদান করিয়া তাহার কর্ম্ম প্রবৃত্তিতে মুখ্যতঃ হস্তক্ষেপ করেন না।

চতুর্ব্বিধ অধ্যাত্মালোক

জীলী চতুর্ব্বিধ অধ্যাত্ম-আলোকের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। ভক্ত ক্রমান্বয়ে ঈদৃশ আলোক লাভ করিয়া ঈশ্বরের সহিত পূর্ণসম্মিলিত হন। অর্থাৎ পরমাত্মা জগতে অবতরণ করিয়া পুনরায় মানবের দ্বারা স্বীয় সত্তায় আরোহণ করেন—ঈশ্বর হইতে মানব, মানব হইতে ঈশ্বর—এই বৃত্ত সমাপ্ত হয় (পৃঃ ৭৯)। এইরূপে, পরমাত্মার জগতে অবতরণের ত্রিবিধ স্তর (পৃঃ ৫২) অনুযায়ী মানবের ঈশ্বরে আরোহণের চতুর্ব্বিধ স্তর। চতুর্ব্বিধ আলোক নিম্নলিখিত রূপ :—

(১) কার্য্যালোক বা ঐশ্বরিক কার্য্যাবলী সম্বন্ধীয় আলোক। ঈদৃশ আলোক-প্রাপ্ত ভক্ত উপলব্ধি করেন যে, ঈশ্বরই একমাত্র কর্ম্মকর্ত্তা, এবং তজ্জন্য তিনি স্বীয় স্বতন্ত্র ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন পূর্ব্বক ঈশ্বরেচ্ছা ও আদেশানুসারেই পরিচালিত হন। ঈদৃশ আলোকের বিভিন্ন স্তরভেদ আছে। সর্ব্বোচ্চ স্তরে, ভক্ত প্রথমে ঈশ্বরের ইচ্ছা, পরে তাঁহার কর্ম্ম উপলব্ধি করেন। তজ্জন্য, এ স্থলে ভক্ত ভগবানের ইচ্ছানুসারী হইয়া তাঁহার আদেশ অমান্য করিতে পারেন। ঈদৃশ আদেশ অমান্য ঈশ্বরের চক্ষে দূষণীয় নহে। এ স্থলে সূফীগণ ঈশ্বরের 'ইচ্ছা' ও 'আদেশে'র মধ্যে প্রভেদ করেন, এবং ইচ্ছাকেই আদেশ অপেক্ষা উচ্চে স্থান দেন। 'আদেশ' অর্থ কোরাণোপদিষ্ট ধর্ম্মাচার প্রভৃতি। কিন্তু 'ইচ্ছা' আদেশাপেক্ষা বলবতী বলিয়া সাধক বাহ্যিক আচারানুষ্ঠান অবহেলা করিতে পারেন।

(২) নামালোক বা ঐশ্বরিক নাম সম্বন্ধীয় আলোক। ভক্ত ঐশ্বরিক নামবিশেষ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিলে, তাঁহার স্বীয় স্বতন্ত্র সত্তা বিলুপ্ত হয়, এবং কেহ ঈশ্বরকে সেই নামে আহ্বান করিলে, ভক্তই উত্তর প্রদান করেন, কারণ ঈশ্বরের নামই তাঁহার নাম হইয়া যায়। ভক্ত 'সাংশ একত্বের' স্তর হইতে 'নিরংশ একত্বে'র স্তরে (পৃঃ ৫৩), এবং মানব-স্বরূপ "ধ্বংসের" (ফানা) স্তর হইতে ঈশ্বরস্বরূপে "স্থিতি"র স্তরে (বাকা) (পৃঃ ৯৪) উন্নীত হইলে,

ভক্তকে আহ্বান করিলে, ঈশ্বরই স্বয়ং উত্তর প্রদান করেন। ভক্ত উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে আরোহণ করিলে, ঈশ্বরও ভক্তের নিকট ক্রমোচ্চ নামসমূহ ক্রমান্বয়ে অভিব্যক্ত করেন। 'বিশেষ' নামই 'সামান্য' নামাপেক্ষা উচ্চস্তর-গত। এইরূপে 'সত্তা', 'এক', 'করুণাময়', 'প্রভু', 'রাজা', 'সর্ব্বজ্ঞ', 'সর্ব্বশক্তি' প্রভৃতি নাম ক্রমান্বয়ে ভক্তের নিকট অভিব্যক্ত হয়। অবশেষে, ঈশ্বরের সমগ্র নামাবলীই ভক্তের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়।

(৩) গুণালোক বা ঐশ্বরিক গুণাবলী সম্বন্ধীয় আলোক। ঈশ্বর যে সময়ে স্বীয় স্বরূপ, গুণ বা নাম ভক্তের নিকট প্রকাশ করেন, সেই সময়ে তিনি ভক্তের মানব-স্বরূপত্ব বিনষ্ট করিয়া (ফানা) তৎস্থলে "পবিত্র আত্মা" (রূহুল্ কুদস্) (পৃঃ ৭৬) সংস্থাপন করেন। ইহা ঈশ্বরের স্বরূপ, কিন্তু তৎসত্ত্বেও, ভক্তকে ঈশ্বরের অবতাররূপে পরিগণনা করা অনুচিত, কারণ পবিত্র আত্মা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এবং ঈশ্বর হইতে পৃথক্‌কৃতও নহে, মানবের সহিত সংযুক্তও নহে (পৃঃ ৮৮)। ঈশ্বর স্বীয় সত্তা ব্যতীত অপর কাহারও নিকট স্বীয় স্বরূপ বা গুণাবলী ব্যক্ত করেন না। তজ্জন্যই, ভক্তের নিকট স্বীয় গুণাবলীর আলোক প্রকাশিত করিবার পূর্ব্বে, ঈশ্বর ভক্তের মানবত্বের স্থলে স্বীয় ঈশ্বরত্ব সংস্থাপন করেন। ঈশ্বরের প্রধান গুণসপ্তক। (পৃঃ ৩৪) ভক্তের নিকট প্রকাশিত হইলে ভক্তের বিভিন্ন প্রকার উপলব্ধি হয়। 'প্রাণ' গুণের প্রকাশ হইলে ভক্ত ঈশ্বর যে সকল প্রাণীর প্রাণ, এই তথ্য উপলব্ধি করেন। 'জ্ঞান' গুণের প্রকাশ হইলে তিনি ঈশ্বরের জ্ঞানই যে সকল বস্তু-জাতের স্বরূপনির্ণায়ক, এই তথ্য উপলব্ধি করেন। 'সংকল্প' গুণের প্রকাশ হইলে তিনি মানবেচ্ছা ও ঈশ্বরেচ্ছার অভেদত্ব উপলব্ধি করেন। 'বল' গুণের অভিব্যক্তি হইলে, তিনি উপলব্ধি করেন যে, বিশ্বচরাচর ঈশ্বরের জ্ঞানস্থিত হইয়াও অনিত্য। (পৃঃ ৬৭)। 'শ্রবণ' গুণের অভিব্যক্তি হইলে, ভক্ত দেবদূত, জীবজন্তু, উদ্ভিদ ও ধাতব পদার্থের ভাষা শ্রবণ করেন। 'বাক্য' গুণের প্রকাশ হইলে তিনি ঈশ্বরাদেশ সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হন। 'দর্শন' গুণের প্রকাশ হইলে তিনি দূরস্থ দ্রব্য দর্শনে সমর্থ হন।

(৪) সত্তালোক বা ঐশ্বরিক স্বরূপসম্বন্ধীয় আলোক। ইহা পরমাত্মার নিগু‍র্ণ, নামহীন, নির্ব্বিশেষ শুদ্ধ স্বরূপের অভিব্যক্তি। ইহাই সর্ব্বোচ্চ আলোক। ভক্ত ঈদৃশ আলোক লাভে ধন্য হইলে তিনি ঈশ্বরের সহিত মিলিত হইয়া পূর্ণমানবত্ব লাভ করেন। তিনি সমগ্র পৃথিবীর মেরুদণ্ডস্বরূপ হন, এবং ঈশ্বরের সমগ্র গুণাবলী তাঁহাতে পুনরভিব্যক্ত হয় (পৃঃ ৭৯)। তিনিই সাধুশ্রেষ্ঠ, এবং ঈশ্বরপ্রতিনিধিরূপে প্রণম্য। সমগ্র জগৎচরাচরই তাঁহার আজ্ঞাবহ হয়। এইরূপে তিনি নিগুণ সত্তালোক প্রাপ্ত হইয়া, ঈশ্বরের সহিত স্বীয় অভিন্নতা উপলব্ধি করেন। কিন্তু জীলীর মতে, ঈদৃশ অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি ক্ষণস্থায়ী মাত্র। ঈদৃশ ভাবারূঢ় সমাধি অবস্থাতেই কেবল ঈদৃশ অভিন্নোপলব্ধি হয়, অন্য সময়ে নহে। (পৃঃ ১২৪)। জীলীর মতে "দিব্যমানব" মহম্মদই কেবল সাক্ষাৎ ভাবে ঈদৃশ "সত্তালোক" প্রাপ্ত হন, এবং বিভিন্ন যুগের সাধুগণ ইহা মহম্মদেরই নিকট হইতে প্রাপ্ত হন, সাক্ষাৎ ঈশ্বরের নিকট হইতে নহে। (পৃঃ ৮১)। সুতরাং ঈশ্বর সর্ব্বভূতের স্বরূপ হইলেও, কেবল মহম্মদই তাঁহার স্বরূপ, অপরে নহে।

মরমী ভক্তের ত্রিবিধ পর্য্যটন

সাবিস্তরি প্রমুখ সূফীগণ মরমী ভক্তের ত্রিবিধ পর্য্যটনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। (১) ঈশ্বর হইতে পর্য্যটন—এই সময়ে ঈশ্বর জগতে অবতরণ করেন, অর্থাৎ জগৎপ্রপঞ্চরূপে অভিব্যক্ত হন, এবং মানব ঈশ্বর হইতে ভিন্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করে। (২) ঈশ্বরাভিমুখে পর্য্যটন—এই সময়ে মানব ঈশ্বরে আরোহণ করে, অর্থাৎ সাধনমার্গাবলম্বন পূর্ব্বক ঈশ্বরের সহিত পূর্ণসম্মিলিত হয়। প্লোটিনাসের ভাষায় ইহা "একাকীর প্রতি একাকীর অধিরোহণ"—বিচ্ছিন্ন প্রেমিকদ্বয়ের পুনঃসম্মিলন। (৩) ঈশ্বর হইতে ঈশ্বরের সহিত পর্য্যটন—এই সময়ে পূর্ণমানব, ঈশ্বরের সহিত পুনরায় একত্বপ্রাপ্ত হইয়া মানবসেবার নিমিত্ত সংসারেই পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করে। অর্থাৎ, প্রথমতঃ, ভক্ত ঈশ্বরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সংসারে জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিতীয়তঃ, তিনি সংসার

পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঈশ্বরের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তৃতীয়তঃ, তিনি লোকশিক্ষার জন্য সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কোনও কোনও ভক্ত কেবল মাত্র প্রথম পর্য্যটনদ্বয়ই সম্পাদন করেন। অর্থাৎ তাঁহারা ঈশ্বরারাধনায় এরূপ নিমগ্ন হইয়া থাকেন যে, তাঁহারা সংসারে আর প্রত্যাবর্ত্তন করেন না। অধ্যাত্মানন্দমত্ত সমাধিমগ্ন সাধুবৃন্দ এই শ্রেণীভুক্ত। ইঁহাদের প্রকৃতপক্ষে "পূর্ণ মানব" নামে অভিহিত করা যায় না, কারণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে (পৃঃ ৮১) পূর্ণমানবের নৈতিক কার্য্যও রহিয়াছে। কোনও কোনও ভক্ত ত্রিবিধ পর্য্যটনই সম্পাদন করেন। তাঁহারা প্রেমোন্মাদনাঘন সমাধি অবস্থা হইতে স্থির ধীর সাধারণ অবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ঈশ্বরদূত ধর্ম্মপ্রচারকগণ ও সমাধি-উত্থিত সাধুবৃন্দ এই শ্রেণীর। ইঁহারাই মানবসেবী "পূর্ণমানব" বা সিদ্ধপুরুষ।

পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ পর্য্যটন অনুসারে মানবের ত্রিবিধ অবস্থা। যথা—ইবনুল ফারিদের মতে, মানবের ত্রিবিধ অভিজ্ঞতা নিম্নলিখিত রূপ :—(১) সাধারণ অভিজ্ঞতা। ইহাকে "স্থিরতা" নামে অভিহিত করা হয়। এই অবস্থায় মানব নিজকে পরমেশ্বরভিন্নরূপে প্রতীতি করে। (২) অসাধারণ অভিজ্ঞতা। ইহাকে "উন্মাদনা" নামে অভিহিত করা হয়। ভাবোন্মত্ত সাধু এই অবস্থায় স্বীয় সত্তা ঈশ্বরসত্তায় বিলুপ্ত করিয়া দেন। এই অবস্থায়, ভক্ত স্বীয় সত্তা ও ঈশ্বরসত্তার ভিতর কোনরূপ প্রভেদ উপলব্ধি করেন না। (৩) অসাধারণোত্তর, লোকোত্তর অভিজ্ঞতা। ইহার নাম "মিলনজাত স্থিরতা"। এই অবস্থায় ভাবোন্মত্ত সাধু পূর্ব্ববৎ ধীর, স্থির অবস্থা ফিরিয়া পান, কিন্তু তৎসত্ত্বেও ঈশ্বরের সহিত সম্মেলনাবস্থা নিত্যই উপলব্ধি করেন। তিনি ঈশ্বরের সহিত স্বীয় অভিন্নতা ও ঈশ্বর হইতে স্বীয় ভিন্নতা এবং ঈশ্বরকে জগল্লীন ও জগদ্‌বহির্ভূত উভয়রূপেই অনুভব করেন। (পৃঃ ৮১, ১১৬)। তজ্জন্যই ঈশ্বরের সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত প্রেমমূলক সম্বন্ধ সম্ভবপর হয়। ঈদৃশ অবস্থা অতীব দুর্লভ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাময়িক ভাবোন্মাদনার

পরে, ভক্ত সাধারণ অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে পুনঃপ্রবেশ করেন। কিন্তু অতি অল্পসংখ্যক ক্ষেত্রেই ভক্ত ভাবোন্মত্ত অবস্থা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, সাধারণ অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে নহে, ভেদজ্ঞানের ক্ষেত্রে নহে, কিন্তু লোকোত্তর ঐক্যজ্ঞানের ক্ষেত্রে (পৃঃ ৮৩)। প্রথম অবস্থাকে "প্রথম ধীরাবস্থা", ও তৃতীয় অবস্থাকে "দ্বিতীয় ধীরাবস্থা" নামে অভিহিত করা হয়। প্রথম অবস্থায় মানব স্বতন্ত্র সত্তাবান্, ঈশ্বর হইতে ভেদে বিশ্বাসী, ঈশ্বর-পরাঙ্মুখ ও জগৎসর্ব্বস্ব। দ্বিতীয় অবস্থায়, ভক্ত ঈশ্বরস্বরূপে বিলুপ্ত, ঈশ্বরের সহিত অভিন্নতা উপলব্ধিমান্, জগদ্‌বিমুখ ও ঈশ্বরসর্ব্বস্ব। তৃতীয় অবস্থায়, ভক্ত ঈশ্বরের সহিত মিলিত হইয়াও স্বতন্ত্র সত্তাবান্, ঈশ্বরের সহিত অভিন্নতা উপলব্ধি করিয়াও ঈশ্বরভিন্ন, ঈশ্বরসর্ব্বস্ব হইয়াও জগদ্‌বিমুখ নহেন, জগতে ঈশ্বরের বাণী প্রচারক ও ধর্ম্মগুরু। এই শেষোক্ত অবস্থাই শ্রেষ্ঠ অবস্থা। অতএব অধিকাংশ সূফীদের মতে, সংসারত্যাগ পূর্ব্বক ঈশ্বরলাভই মানবের চরম কাম্য নহে। মানবের সেবাও সমভাবে প্রয়োজন। ঈশ্বর হইতে সাক্ষাৎপ্রাপ্ত বাণী জনসমাজে প্রচারপূর্ব্বক অন্যান্য ঈশ্বরমিলনেচ্ছু ভক্তগণকে সাধনমার্গে সাহায্য করাও ঈশ্বরসম্মিলিত ভক্তের অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব পরবর্ত্তী সূফীগণ যে নিষ্ক্রিয়াবাদ ও মানববিদ্বেষবাদ প্রচার করিয়াছেন, এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত (পৃঃ ১২০)।

বেদান্তও নিষ্ক্রিয়াবাদ ও মানববিদ্বেষবাদ প্রচার করে নাই। এসম্বন্ধেও অনেকের মনে ভ্রান্ত ধারণা আছে। অনেকের ধারণা বেদান্তমতে জগৎ শূন্য, মায়ামরীচিকা মাত্র। তজ্জন্য জাগতিক সকল বিষয়ে উদাসীনতা, জীবন-যুদ্ধে পরাঙ্মুখতা ও পরিপূর্ণ নিষ্ক্রিয়তা, এবং মানববিদ্বেষই বেদান্তের চরম লক্ষ্য। সমগ্র ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধেও কেহ কেহ উক্ত আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু এই মত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। ভারতীয় দার্শনিকগণ অবশ্য বর্ত্তমান জগৎকেই মানবের চরম লক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই, উপরন্তু জন্মজন্মান্তর হইতে মুক্তিকেই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ

করিয়াছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও, তাঁহারা জগতের প্রয়োজনীয়তাও অস্বীকার করেন নাই। তাঁহাদের মতে, বর্ত্তমান পার্থিব জগতের সাহায্যেই আধ্যাত্মিক জগতে উন্নীত হওয়া সম্ভব। সাধনা ব্যতীত সিদ্ধি অসম্ভব—মুক্তি সহজপ্রাপ্য নহে, উপরন্তু শত শত জন্মের প্রাণান্ত চেষ্টার ফল। তজ্জন্য বর্ত্তমান জগতেই সাধনায় প্রবৃত্ত হওয়া অত্যাবশ্যক। এই সাধনার দুইটী দিক—আত্মস্বরূপ বিকাশ এবং মানবসেবা, অথবা, অপরাপর মুমুক্ষুগণের সাধন পথে যথাসাধ্য সাহায্য ও বিশ্বপ্রেম। অতএব ভারতীয় দর্শনে নিষ্ক্রিয়াবাদ ও মানববিদ্বেষ-বাদের স্থান নাই।

অদ্বৈতবাদিগণ জগৎকে মিথ্যা বলিয়া গ্রহণ করিলেও, ব্যবহারিক জগতের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন নাই। সাধারণ মানব ব্যবহারিক জগতের ভিতর দিয়াই পারমার্থিক স্তরে উন্নীত হয়, কর্ম্ম ও ধর্ম্মের ভিতর দিয়াই শুদ্ধ জ্ঞানের স্তর প্রাপ্ত হয়। আত্মার সাধনা ও শিক্ষা এই ব্যবহারিক জগতেই সম্ভব, এবং সাধনা দ্বারাই ব্রহ্ম লভ্য। নিষ্কাম কর্ম্মই চিত্তশুদ্ধির কারণ, এবং শুদ্ধচিত্তেই কেবল ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় সম্ভব। অতএব শাস্ত্রোপদিষ্ট নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম, যজ্ঞ, দান, ধ্যান, জনসেবা প্রভৃতি কর্ম্ম মুক্তির প্রথম সোপান। জীবন্মুক্তও লোকশিক্ষার জন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। অতএব মুমুক্ষু ও মুক্ত যে সকল কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক নিষ্ক্রিয় অলস জীবন যাপন করেন, এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

ভারতীয় দর্শনের মতে, মুক্তির জন্য সংসার ত্যাগও অত্যাবশ্যক নহে। ভারতীয় দার্শনিকগণ কর্ম্মের মূল প্রবৃত্তিরই উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। যিনি কামনাবাসনাহীন, স্বার্থশূন্য, নিষ্কাম কর্ম্মী, যিনি ফল-লাভেচ্ছা ব্যতীতই স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম পালনে রত থাকেন, তিনি গৃহীই হউন আর সন্ন্যাসীই হউন, মুক্তির পূর্ণ অধিকারী। অপর পক্ষে যিনি স্বার্থসর্ব্বস্ব, অহং-মম ভাবের দাস, তিনি গৃহীই হউন্ আর সন্ন্যাসীও হউন, মুক্তির অধিকার তাঁহার নাই।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে ভারতীয় দর্শন জগতের প্রতি ঘৃণা ও মানব-বিদ্বেষ প্রচার করে নাই। উপরন্তু, মানবসেবাই ইহার সাধনমার্গের অত্যাবশ্যক অঙ্গ। অবশ্য পার্থিব বস্তুতে আসক্তি বর্জ্জনীয়, কিন্তু 'আসক্তি' ও 'ঘৃণা' এক নহে। সাধক সম্পূর্ণ নিরাসক্ত ভাবেই জগতের সেবা করিবেন। "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই"—এই চরম সত্যই ভারতীয় দার্শনিক-গণ সগৌরবে প্রচার করিয়াছিলেন। মানুষই ব্রহ্ম, মানুষের সেবার দ্বারাই ব্রহ্মলাভ, মানুষই চরম তত্ত্ব। এই বিষয়ে সূফীগণের সহিত বৈদান্তিক ও অন্যান্য ভারতীয় দার্শনিকগণের সম্পূর্ণ ঐক্য বিদ্যমান। বিখ্যাত সূফী বায়াজিদ্ বলিয়াছেন যে, বিশ্বপ্রেম ঈশ্বর-প্রেমেরই অনিবার্য্য ফল। তাঁহার মতে, ঈশ্বরভক্ত সাধকের তিনটী লক্ষণ—সমুদ্রের ন্যায় বদান্যতা, সূর্য্যের ন্যায় পরদুঃখকাতরতা, পৃথিবীর ন্যায় নম্রতা। অর্থাৎ তাঁহার দান সমুদ্রের ন্যায় অসীম ও নিত্য, তাঁহার দয়া সূর্য্যালোকের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী, এবং সর্ব্বংসহা পৃথিবীরই ন্যায় তাঁহার ধৈর্য্য ও বিনয়। বায়াজিদ্ সম্বন্ধে একটী গল্প প্রচলিত আছে যে, একদা তিনি একস্থানে বীজ ক্রয় করেন, এবং সেই স্থান হইতে অপর স্থানে গমন করিবার সময় বীজের কিয়দংশ সঙ্গে লইয়া যান। গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইয়া তিনি দেখেন যে, বীজের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি পিপীলিকাও চলিয়া আসিয়াছে। "হায়! আমি না জানিয়া ইহাদের গৃহচ্যুত ও আত্মীয়বর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছি"—এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সেই সকল পিপীলিকা সঙ্গে লইয়া কয়েক শত মাইল পুনরায় পর্য্যটন করিয়া পূর্ব্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই সকল গল্প হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, সূফীগণ কিরূপ বিশ্ব-প্রেমিক ও অহিংসাব্রতাবলম্বী ছিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আচারানুষ্ঠান ও ক্রিয়াপদ্ধতি

অধিকাংশ সূফীই উপাসনা (নামাজ), তীর্থযাত্রা প্রমুখ বাহ্যিক আচারা-

নুষ্ঠান অপেক্ষা আন্তরিক পবিত্রতার উপরই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। সনাতন ইস্‌লামপন্থী সূফীগণের মতে অবশ্য কোরাণানুমোদিত ও মহম্মদোপদিষ্ট আচারানুষ্ঠান ও ক্রিয়াপদ্ধতি অবহেলা করা অতীব অন্যায় ; এবং ঈশ্বরমিলনেচ্ছু সাধক ও ঈশ্বরসম্মিলিত ভক্ত উভয়েরই পক্ষে ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য এবং সমভাবে বাধ্যতামূলক। কিন্তু অধিকাংশ সূফীই তত্ত্বকে (হাকিকাৎ) ধর্ম্মাচার (শারিয়াৎ) অপেক্ষা উচ্চে স্থান দিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে, প্রথমতঃ—বাহ্যিক ধর্ম্মাচার ও নিয়ম পালন সম্পূর্ণ বৃথা, যদি তাহার সঙ্গে সঙ্গে আন্তর সদ্‌গুণাবলীও বিদ্যমান না থাকে। রূমী বলিয়াছেন, "মূর্খগণই মস্‌জিদের যশঃকীর্ত্তন করে, কিন্তু হৃদয়মধ্যস্থ প্রকৃত মন্দিরকে অবহেলা করে।"

দ্বিতীয়তঃ—বহু সূফীর মতে, প্রত্যহ পাঁচবার নামাজ, হাজযাত্রা প্রভৃতি বাধ্যতামূলক বাহ্যিক ধর্ম্মাচার অপেক্ষা ধ্যান, সমাধি প্রভৃতি অধিক প্রয়োজনীয়। তজ্জন্য, বহু সূফীগণ স্বেচ্ছায় এই সকল বাহ্যিক আচারানুষ্ঠান অবহেলা করিতেন। কথিত আছে যে, নবসূফীধর্ম্মের অন্যতম প্রধান আচার্য্য ধুল্ নন্ মিশ্রী প্রায়ই প্রাত্যহিক নামাজ উপেক্ষা করিতেন। অপর এক বিখ্যাত সূফী বায়াজিদ্ বলিয়াছেন যে, অপবিত্রমনার তীর্থযাত্রা, পরিব্রাজন প্রভৃতি ধর্ম্মাচার সম্পূর্ণ অর্থহীন ও ব্যর্থ। তিনি বলিয়াছেন : "প্রথমবার তীর্থযাত্রায় গমন করিয়া আমি কেবল মস্‌জিদই দেখিলাম ; দ্বিতীয়বার মস্‌জিদ ও মস্‌জিদের অধীশ্বরকেও দেখিলাম , তৃতীয়বার কেবল অধীশ্বরকেই দেখিলাম"। পুনরায় : "দরবেশগণের অর্থহীন পরিব্রাজন কেবল এই প্রমাণই করে যে, তাঁহাদের ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি নাই, কারণ মাত্র দুই পদ ভ্রমণ করিলেই সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়—স্বার্থবুদ্ধি হইতে দূরে এক পদ, ঈশ্বরাদেশের প্রতি অপর পদ"। বিখ্যাত সূফী হুজ্‌য়িরি অন্যান্য বিষয়ে সনাতন ইস্‌লামপন্থী হইলেও এবং বাহ্যিক ধর্ম্মাচারানুষ্ঠান সাধারণ ব্যক্তি এবং সাধু ও ভক্তগণের পক্ষে সমান বাধ্যতামূলক বলিয়া মনে করিলেও, তীর্থযাত্রা সম্বন্ধে

অপরাপর সূফীগণেরই মতানুসারী ছিলেন। তাঁহার মতে, তীর্থযাত্রা দ্বিবিধ, বাহ্যিক ও আন্তরিক। মক্কা প্রভৃতি তীর্থভ্রমণ বাহ্যিক, এবং ঈশ্বরমিলনাভি-মুখে ভ্রমণ আন্তরিক তীর্থযাত্রা। আন্তরিক তীর্থযাত্রাই অধিক প্রয়োজন, এবং ইহা ব্যতীত বাহ্যিক তীর্থযাত্রা সম্পূর্ণ ব্যর্থ। গৃহত্যাগ করিয়া তীর্থযাত্রা নিরর্থক হয়, যদি না প্রথমে পাপ ত্যাগ করা হয়। ঈশ্বরকে মস্‌জিদে অন্বেষণ করাও ব্যর্থ হয়, যদি না প্রথমে তাঁহাকে হৃদয়েই অন্বেষণ করা হয়। অতএব বাহ্যিক তীর্থযাত্রার সহিত আন্তরিক তীর্থযাত্রাও না করিলে, উহা ব্যর্থ হয়। হুজ্‌য়িরির মতে, অতএব তীর্থযাত্রা প্রকৃতপক্ষে দ্বিবিধ—ঈশ্বরের নিকট হইতে অনুপস্থিতি, ঈশ্বরের নিকট উপস্থিতি। মক্কাতেও ঈশ্বরের নিকট অনুপস্থিত ব্যক্তি গৃহেও ঈশ্বরের নিকট অনুপস্থিত ব্যক্তি অপেক্ষা কোনো অংশেই শ্রেয়ঃ নহেন। এবং মক্কাতেও ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত ব্যক্তি গৃহেই ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত ব্যক্তি অপেক্ষা কোনো অংশেই শ্রেয়ঃ নহেন। অতএব ঈশ্বরের নিকট উপস্থিতিই প্রকৃত তীর্থযাত্রা—মক্কাতেই হউক অথবা গৃহেই হউক।

তৃতীয়তঃ, কোনো কোনো সূফীর মতে, ধর্ম্মাচার ও নিয়ম পালন যে কেবল নিষ্প্রয়োজনীয়, তাহাই নহে অনিষ্টজনকও বটে, কারণ ইহা দ্বারা ভ্রান্ত ভেদজ্ঞান দৃঢ়ীভূত হয়, এবং তজ্জন্য অভেদোপলব্ধির বাধা ঘটে। স্যাবিস্তরি বলিয়াছেন যে, আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথম অবস্থাতেই কেবল বাহ্যিক আচারা-নুষ্ঠান প্রয়োজন। কিন্তু ভক্ত যতই সাধনমার্গে উচ্চে আরোহণ করেন, ততই এই সকল আচার ও নিয়ম তাঁহার পক্ষে অনাবশ্যক হইয়া পড়ে; শুধু তাহাই নহে, ইহারা তাঁহার ঈশ্বরের সহিত অভেদত্ব উপলব্ধির পথেও বাধাস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। কারণ, কর্ম্ম পৃথক্ সত্তাবান্ কর্ত্তার পক্ষেই সম্ভবপর। সুতরাং, যতকাল ভক্ত কর্ম্মে রত থাকেন, ততকাল তিনি নিজকে ঈশ্বর হইতে পৃথক রূপেই দর্শন করেন। অতএব সাধনমার্গের উচ্চস্তরে বাহ্যিক আচারানুষ্ঠানরূপ কর্ম্মপরিত্যাগ অত্যাবশ্যক, নতুবা ঈশ্বরের সহিত পূর্ণমিলন ও ঈশ্বরের সহিত

অভিন্নত্বোপলব্ধি অসম্ভব হইয়া পড়ে। ঈশ্বরের সহিত সম্মিলিত ভক্তের কোনোরূপ বাহ্যিক আচারানুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই। কিন্তু ভক্ত যখন এইরূপ ঈশ্বরের সহিত সম্মিলিত হইয়া লোকশিক্ষার জন্য পুনরায় সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করেন (পৃঃ ১৩৬) সেই সময়ে অবশ্য স্বীয় প্রয়োজন না থাকিলেও তিনি লোক-শিক্ষার জন্যই যথাযথ ধর্ম্মাচারানুষ্ঠানে রত হন। আবুখেয়র্ প্রভৃতি সূফী সঙ্গে বাহ্যিক আচারানুষ্ঠান এবং সাম্প্রদায়িক ভেদবিচার প্রকৃত ধর্ম্মজীবনের বিরোধী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। সাবিস্তরিও বলিয়াছেন, "তোমার সম্মুখ হইতে যবনিকা উত্তোলিত হইলে সাম্প্রদায়িক শৃঙ্খলও ছিন্ন হইয়া যাইবে। ধর্ম্মসংক্রান্ত নিয়ম কেবল 'অহং পদার্থের(১) পক্ষেই প্রযোজ্য।"

শঙ্করের মতেও সাধনমার্গের প্রারম্ভেই কেবল কর্ম্মের প্রয়োজন। সম্পূর্ণ নিষ্কামভাবে শাস্ত্রোপদিষ্ট নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মসমূহের যথাযথ সম্পাদন করিলে চিত্ত নির্ম্মল হয়, এবং নির্ম্মল চিত্তেই কেবল জ্ঞানের উদয় সম্ভব। তজ্জন্য, প্রারম্ভে কর্ম্মদ্বারা চিত্তের নির্ম্মলতা লাভ মুমুক্ষুর পক্ষে অত্যাবশ্যক। কিন্তু তৎপরে আর কর্ম্মের প্রয়োজন নাই—জ্ঞানই মুক্তির উপায়, কর্ম্ম নহে। এক্ষেত্রে কর্ম্ম যে কেবল নিষ্প্রয়োজনীয় তাহাই নহে, অনিষ্টকরও। কারণ কর্ম্ম ভেদমূলক, কিন্তু ব্রহ্মের সহিত অভেদজ্ঞানই মুক্তির একমাত্র কারণ। কিন্তু ব্রহ্মের সহিত একত্ব উপলব্ধি করিবার পর, জীবন্মুক্ত লোকশিক্ষার জন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। এবিষয়ে শঙ্করের মতবাদের সহিত সাবিস্তরির মতবাদের পূর্ণ সাদৃশ্য বিদ্যমান্। রামানুজ, নিম্বার্ক প্রমুখ অন্যান্য বৈদান্তিকগণের মতেও নিষ্কাম কর্ম্ম চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানের সহায়তা করে মাত্র, কিন্তু স্বয়ং জ্ঞানের অথবা মোক্ষের কারণ নহে। অতএব নিষ্কাম কর্ম্ম মোক্ষের সাক্ষাৎ সাধন নহে, পরোক্ষ উপায় মাত্র। ভাস্কর-প্রমুখ জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়-বাদিগণের মতে অবশ্য জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ের সমন্বয়ই মোক্ষের কারণ, কেবল জ্ঞান অথবা কেবল কর্ম্ম নহে।

(১) ঈশ্বর হইতে ভিন্ন ব্যবহারিক সত্তা। শঙ্করের মতবাদ তুলনা করুন।

বেদান্তে বাহ্যিক ক্রিয়া অপেক্ষা কর্ম্মের মূলে যে প্রবৃত্তি তাহার উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। তজ্জন্য বেদান্তে 'সকাম' ও 'নিষ্কাম' —এই উভয়বিধ কর্ম্মের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। যে কর্ম্ম কর্ত্তা ফল-ভোগেচ্ছু হইয়াই সম্পাদন করে তাহাই সকাম কর্ম। ঈদৃশ সকাম কর্ম্মের ফলভোগ কবিবার জন্য কর্ত্তাকে বারংবার সংসারে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়। সকাম কর্ম্মের ফল দ্বিরূপ—স্বর্গে বা নরকে উপভোগ্য এবং পৃথিবীতে উপভোগ্য। মৃত্যুর পরে স্বর্গে বা নরকে যথাযথ প্রথম প্রকার কর্ম্মের ফলভোগ করিয়া, জীব দ্বিতীয় প্রকার কর্ম্মের ফলভোগের নিমিত্ত পৃথিবীতে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। স্বর্গ মোক্ষ নহে, স্বর্গ হইতেও পুনরাবর্ত্তন আছে। কিন্তু মোক্ষই সংসারচক্র হইতে সম্পূর্ণ ও শাশ্বত মুক্তি। অতএব সকাম কর্ম্ম মোক্ষের উপায় নহে, উপরন্তু জন্মজন্মান্তরেরই কারণ মাত্র। 'নিষ্কাম কর্ম্ম' ফলভোগেচ্ছাহীন কর্ম্ম। ইহাই কেবল মোক্ষের প্রথম সোপান।

সূফীগণের ক্রিয়াপদ্ধতি

সূফীগণের আচারানুষ্ঠানের মধ্যে "দিকর্" অথবা স্মরণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। "দিকর্" অর্থ একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরের নাম জপ। সূফীগণ ইহাকে সাধারণ নামাজ অপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন। "জপ" দ্বিবিধ— উচ্চৈঃস্বরে ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন (দিকর্ জালী) এবং নিম্নস্বরে অথবা নীরবে ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন (দিকর্ খাফী)। ইহাদের পদ্ধতি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কোনো কোনো সূফীর মতে, ইহা নিম্নলিখিত রূপ।

(১) উচ্চৈঃস্বরে নাম কীর্ত্তন। (ক) ভক্ত সাধারণভাবে উপবিষ্ট হইয়া বামপার্শ্ব হইতে কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে আল্লা নাম উচ্চারণ করেন। (খ) উপাসনাকালে যেভাবে উপবিষ্ট হন্, সেইভাবে উপবিষ্ট হইয়া তিনি প্রথমে দক্ষিণ জানু, পরে বামপার্শ্ব হইতে অধিকতর উচ্চৈঃস্বরে 'আল্লা' নাম উচ্চারণ

করেন। (গ) জানু-উপরি উপবিষ্ট হইয়া তিনি প্রথমে দক্ষিণ জানু, পরে বাম পার্শ্ব হইতে অধিকতর উচ্চৈঃস্বরে 'আল্লা' নাম উচ্চারণ করেন। (ঙ) পূর্ব্বেরই ন্যায় উপবিষ্ট হইয়া, তিনি প্রথমে বাম জানু, তৎপরে দক্ষিণ জানু, তৎপরে বাম পার্শ্ব, পরিশেষে সম্মুখ হইতে অধিকতর উচ্চৈঃস্বরে 'আল্লা' নাম উচ্চারণ করেন। (ঙ) মক্কাভিমুখে উপাসনাকালের ন্যায় উপবিষ্ট হইয়া, তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নাভিদেশ হইতে বাম স্কন্ধ পর্য্যন্ত 'লা' শব্দ; তৎপরে যেন মস্তিষ্ক হইতে 'ইলাহা' শব্দ; এবং বাম পার্শ্ব হইতে 'ইল্লাল্লা' শব্দ উচ্চারণ করেন।

(২) নিম্নস্বরে বা নীরবে নাম কীর্ত্তন। (ক) চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ভক্ত হৃদয় দ্বারা 'আল্লা শ্রবণ করেন', 'আল্লা দর্শন করেন', 'আল্লাই জ্ঞাতা'—এই শব্দত্রয় উচ্চারণ করেন। প্রথম শব্দটী যেন নাভিদেশ হইতে বক্ষ পর্য্যন্ত, দ্বিতীয়টী বক্ষ হইতে মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত, তৃতীয়টী মস্তিষ্ক হইতে স্বর্গ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। (খ) তিনি নিম্নস্বরে প্রথমে দক্ষিণ জানু হইতে বাম পার্শ্ব পর্য্যন্ত 'আল্লা' নাম উচ্চারণ করেন। (গ) প্রতি প্রশ্বাসের সহিত 'লা ইলাহা', এবং প্রতি নিশ্বাসের সহিত 'ইল্লাল্লা' শব্দ উচ্চারণ করেন।

ঈশ্বর হইতে আলোক প্রাপ্ত হইবার জন্যই ভক্ত ঈদৃশভাবে ঈশ্বরের নাম জপ করেন। গাজালীর মতে, প্রারম্ভে ভক্ত ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করেন। তৎপরে তিনি জিহ্বা চালনা বন্ধ করেন, এবং নীরবে বারংবার নাম চিন্তা করেন। অবশেষে নামের শব্দ, বর্ণ প্রভৃতি হৃদয় হইতে বহির্গত করিয়া তিনি কেবল ভাবটীই হৃদয়ে ধারণ করেন। এই অবস্থায় ভক্ত স্বীয় ইচ্ছা, নির্ব্বাচন, প্রচেষ্টা প্রভৃতি পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক ঈশ্বরে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেন, এবং ঈশ্বর তাঁহার নিকট স্বীয় আলোক প্রকাশিত করেন। বহু স্ফীর মতে, ঈদৃশ নামজপ সাধনমার্গের সর্ব্বোচ্চ অবস্থা বা 'সমাধি' অবস্থা (পৃঃ ১২৪) প্রাপ্তির অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায়। বারংবার ঈশ্বরের নাম জপ করিলে অবশেষে ঈশ্বর-স্বরূপে ভক্তের সত্তার বিলোপ হয়, এবং ভক্ত ঈশ্বরের সহিত একত্বোপলব্ধি করেন। নামজপের প্রথমাবস্থায়, ভক্ত নিজের বিষয় বিস্মৃত হইয়া ঈশ্বরের

চিন্তাতেই নিমগ্ন হইয়া থাকেন। কিন্তু ইহার শেষাবস্থায়, ভক্ত ঈশ্বরচিন্তন-রূপ কার্য্যটীও বিস্মৃত হন, এবং ঈশ্বরের সহিত একীভূত হইয়া যান।

অবশ্য প্রকৃতপক্ষে 'সমাধি' অবস্থা ঈশ্বরেরই দান এবং তজ্জন্য অন্য কোনও বহিরুপায়জাতি নহে। কিন্তু কার্য্যতঃ নামজপ প্রমুখ উপায়বিশেষকে সমাধি-প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ উপায়রূপে নির্দ্দেশ করা হয়। তদ্ব্যতীত, সঙ্গীত, নৃত্য প্রভৃতি কৃত্রিম উপায় দ্বারাও সূফীগণ সময়ে সময়ে সমাধি অবস্থা প্রাপ্তির চেষ্টা করিতেন।

নামজপ ব্যতীত সূফীগণ কোরাণের শ্লোকাবলীর ধ্যানও করেন। যথা, "তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ, ব্যক্ত ও অব্যক্ত, যিনি সকল বস্তু জানেন" (৫৭-৩), "তুমি যাহাই হও, তিনি তোমার সঙ্গেই আছেন" (৫৭-৪) ইত্যাদি শ্লোক তাঁহারা বারংবার ধ্যান করেন।

সূফীগণ নানাবিধ প্রাণায়াম, বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ধ্যান প্রভৃতি যোগ-নির্দ্দিষ্ট সাধনও অভ্যাস করেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সূফী মরমিয়াবাদ বা অতীন্দ্রিয়বাদ

উপরি উক্ত বিবরণী হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, সূফী মতবাদে জগৎসৃষ্টি-প্রক্রিয়া প্রভৃতি দার্শনিক তত্ত্বালোচনার অভাব না থাকিলেও ইহা প্রকৃতপক্ষে বিচারবুদ্ধিমূলক নহে। অতএব ইহা দর্শনও নহে, সাধারণ ধর্ম্ম-তত্ত্বও নহে, কারণ উভয়েই বিচারবুদ্ধিমূলক, কিন্তু অতীন্দ্রিয়বাদ। অতীন্দ্রিয়বাদ মতে, মানবের বিচারবুদ্ধি ব্যতীত অপর একটী উচ্চতর শক্তি আছে যাহা দ্বারা সে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় প্রত্যক্ষ জ্ঞান, অনুভূতি বা উপলব্ধি লাভে ধন্য হইতে পারে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, (পৃঃ ১২৪) সূফীগণের মতে, ঈদৃশ ঈশ্বরোপলব্ধি মস্তিষ্ক-প্রসূত নহে, হৃদয়প্রসূত। মানবহৃদয় ঈশ্বরের দর্পণস্বরূপ

এবং ঈশ্বরের সমগ্র স্বরূপ বা গুণাবলী এই দর্পণে প্রতিফলিত হয়। ঈদৃশ প্রতিফলনকে 'ঈশ্বরদত্ত আলোক' নামে অভিহিত করা হয়। ভক্তের হৃদয় এতদ্রূপে ঐশ্বরিক আলোকে আলোকিত হইলে, তিনি তৎক্ষণাৎ ঈশ্বরের স্বরূপ সাক্ষাৎ অনুভব বা উপলব্ধি করেন। বুদ্ধিবিচারলব্ধ জ্ঞান হইতে ঈদৃশ জ্ঞানের প্রভেদ নির্দ্দেশ করিবার জন্য সূফীগণ ইহাকে "উন্মাদনা" এবং বুদ্ধিবিচারলব্ধ জ্ঞানকে "স্থিরতা" নামে অভিহিত করেন। "উন্মাদনা" কালে বুদ্ধিবিচারশক্তি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়, এবং হৃদয় ঈশ্বর হইতে সাক্ষাৎ ভাবে আলোকপ্রাপ্ত হইবার সুযোগ পায়। "স্থিরতা" জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের প্রভেদসূচক এবং আবেগহীন—এস্থলে ভিন্ন জ্ঞাতা সম্পূর্ণ ভিন্ন জ্ঞেয়কে বাহির হইতে বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা স্থির ও নৈর্ব্যক্তিকভাবে জানিতেছে। "উন্মাদনা" জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের একতাসূচক ও আবেগবহুল—এস্থলে জ্ঞেয় জ্ঞাতার উপর প্রতিফলিত হইয়া একত্ব প্রাপ্ত হইতেছে, এবং অপূর্ব্ব ভাবাবেগের সৃষ্টি করিতেছে (পৃঃ ১২৩ দেখুন)।

অন্যান্য অতীন্দ্রিয়বাদিগণের ন্যায় সূফীগণও একস্বরে বুদ্ধিবিচারশক্তির তুচ্ছতা প্রচার করিয়াছেন। সাবিস্তরি বলিয়াছেন যে, বুদ্ধি কেবল পার্থিব বস্তুজাতই উপলব্ধি করিতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের একত্ব উপলব্ধি ইহার সাধ্যাতীত। অনুমান দ্বারা আমরা প্রত্যক্ষদৃষ্ট বা জ্ঞাত সত্য হইতে অপ্রত্যক্ষ বা অজ্ঞাত সত্যে উপনীত হইতে পারি। যথা, প্রত্যক্ষদৃষ্ট 'ধূম', হইতে অপ্রত্যক্ষ 'অগ্নি'র অস্তিত্ব অনুমান করি। সাধারণ পার্থিব জীবনে অনুমান প্রমাণরূপে পরিগণিত হইলেও, অপার্থিব আধ্যাত্মিক বিষয়ে ইহা ব্যর্থ। কারণ, এস্থলে পার্থিব জগৎই প্রত্যক্ষদৃষ্ট বা জ্ঞাত সত্য, ঈশ্বর অপ্রত্যক্ষ ও অজ্ঞাত সত্য। কিন্তু জগৎ ঈশ্বর হইতে নিম্নস্তরীয়, এবং নিম্ন হইতে উচ্চে, অল্প হইতে অধিকে উপনীত হওয়া অসম্ভব। সাধারণ ক্ষেত্রে, জ্ঞাত তথ্য ও অজ্ঞাত সিদ্ধান্ত উভয়ই একস্তরগত—উভয়ই সসীম, অনিত্য, পার্থিব বস্তু। কিন্তু সসীম, অনিত্য ও পার্থিব জগৎ হইতে অসীম, নিত্য ও অপার্থিব ঈশ্বরে

উপনীত হওয়া অনুমানের সাধ্যাতীত। বুদ্ধিবিচার দ্বারা ঈশ্বরোপলব্ধির প্রচেষ্টা ক্ষীণ প্রদীপালোক দ্বারা প্রভাত সূর্য্য প্রত্যক্ষের প্রচেষ্টার ন্যায়ই হাস্যকর। তজ্জন্যই, বুদ্ধিবিচারগর্ব্বিত দার্শনিকবৃন্দ ঈশ্বর সম্বন্ধে নানা ভ্রান্ত মতবাদের প্রপঞ্চনা করিয়াছেন। যথা, তাঁহারা পৃথিবীকে নিত্য ও স্বতন্ত্র এবং ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ জগদ্‌বহির্ভূত বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ, সাবিস্তরির মতে "দার্শনিকের চক্ষুদ্বয় দ্বৈত দর্শন করে,—তিনি ঈশ্বরের একত্ব দর্শনে অক্ষম।" দার্শনিক জগৎ ও ঈশ্বরকে পরস্পরভিন্ন তত্ত্বদ্বয় বলিয়া মনে করেন, প্রকৃতপক্ষে উভয়ে অভিন্ন। সাধারণ প্রত্যক্ষ ও অনুমান ভেদবিষয়ক। অতএব, বুদ্ধি ঈশ্বরোপলব্ধিতে অক্ষম। ইহা ঈশ্বরের করুণার কথাই কেবল চিন্তা করিতে পারে, তাঁহার স্বরূপের বিষয় নহে। ঈশ্বরের স্বীয় আলোক দ্বারাই কেবল তাঁহার স্বরূপোপলব্ধি করা সম্ভব, এবং "এই আলোকে বুদ্ধি আপাদমস্তক দগ্ধ হইয়া যায়।" অতএব বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইলেই, ঈশ্বরজ্ঞানের উদয় হয়, পূর্ব্বে নহে। স্বীয় তুচ্ছতা ও শক্তিহীনতা উপলব্ধি করাই বুদ্ধির শ্রেষ্ঠ কার্য্য।

রূমীর মতেও বুদ্ধি ঈশ্বরোপলব্ধি বিষয়ে সম্পূর্ণ অপারগ। প্রথমতঃ, বুদ্ধি দেশ ও কালে সীমাবদ্ধ পার্থিব বস্তুজাতই কেবল জানিতে সমর্থ, কিন্তু ঈশ্বর দেশাতীত ও কালাতীত, অসীম ও অনন্ত। দ্বিতীয়তঃ, বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞান আপেক্ষিক (relative), অর্থাৎ তুলনা ও প্রভেদমূলক। যথা, অন্ধকার ভিন্নরূপেই আলোকের জ্ঞান হয়। কিন্তু সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মার বাহিরে কিছুই নাই যাহার সহিত তাঁহার তুলনা বা যাহা হইতে তাঁহার প্রভেদ করা যাইতে পারে। তৃতীয়তঃ, বুদ্ধি স্বয়ং ঈশ্বরসৃষ্ট বলিয়া স্রষ্টাকে জানিতে অপারগ। চতুর্থতঃ, বুদ্ধি জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়রূপ ভেদমূলক, এবং তজ্জন্য ঈশ্বরের অভেদত্ব উপলব্ধি বিষয়ে অক্ষম। রূমী বলিয়াছেন, "বুদ্ধির চক্ষুর বক্রতা তাহাকে দ্বৈতদর্শনে বাধ্য করে।" অতএব বুদ্ধি দ্বারা সাক্ষাৎ ঈশ্বরোপলব্ধি অসম্ভব। শাস্ত্রপাঠ অথবা বুদ্ধি দ্বারা আমরা ঈশ্বরের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে পারিলেও উহ

প্রত্যক্ষ উপলব্ধি নহে। যেরূপ "গো", "লা", "প" এই তিনটী বর্ণদ্বারা গোলাপের সৌন্দর্য্য, পেলবতা ও সুগন্ধ উপলব্ধি করা অসম্ভব, তদ্রূপ পুস্তক বা অনুমানলব্ধ জ্ঞান দ্বারাও ঈশ্বরের স্বরূপোপলব্ধি অসম্ভব। রূমী বলিয়াছেন, "তোমার হৃদয়েই মহম্মদলব্ধ জ্ঞানের আকর প্রত্যক্ষ কর—পুস্তক ও শিক্ষকের সাহায্য ব্যতীতই।" জামীও বলিয়াছেন: "তোমার গ্রন্থাবলী বন্ধ কর, ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগী হও ও অনুতাপ কর।"

বৈদান্তিকদের মতেও কেবলমাত্র বিচারবুদ্ধির সাহায্যে ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তি অসম্ভব। সাধারণ মানব প্রথমতঃ শাস্ত্রের সাহায্যেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে। তজ্জন্য ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্মকে "শাস্ত্রযোনি" (১-১-৩) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। শাস্ত্রের সাহায্যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের নাম "শ্রবণ"। মুমুক্ষু সদ্‌গুরুর নিকট হইতে শাস্ত্রোপদিষ্ট ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রবণ করেন, যথা, "তৎ ত্বমসি" (ছান্দোগ্য ৬-৮) "তিনিই তুমি", "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (এই সকলই ব্রহ্ম) ইত্যাদি। তৎপরে তিনি স্বীয় বিচারবুদ্ধির সাহায্যে গুরূপদিষ্ট তত্ত্বের চিন্তন, বিচার ও নির্দ্ধারণ করেন। ইহার নাম "মনন"। সর্ব্বশেষে তিনি উক্ত তত্ত্ব, অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের অভেদতত্ত্ব, অনবরত ধ্যান বা চিন্তা করেন। ইহার নাম "নিদিধ্যাসন"। "নিদিধ্যাসন" দ্বারাই সাক্ষাৎ ব্রহ্মোপলব্ধি হয়। "শ্রবণ" অপর হইতে লব্ধ অপ্রত্যক্ষ জ্ঞান মাত্র, সাক্ষাৎ অনুভব নহে। মুমুক্ষু এই ক্ষেত্রে জীব ও ব্রহ্মের অভেদত্ব জ্ঞেয় তথ্যরূপে জানেন মাত্র, যেরূপ তিনি নীলাৎপলের নীলত্ব ও জলের তরলত্ব জানেন, কিন্তু সাক্ষাৎ উপলব্ধি করেন না। "মনন"ও সেই তত্ত্বের বিষয় চিন্তা, আলোচনা ও সত্যাসত্য বিচার মাত্র। মননের দ্বারা পূর্ব্বগৃহীত তত্ত্বে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে এবং সংশয় বিদূরিত হয়। কিন্তু বিশ্বাস ও উপলব্ধি এক নহে। বিশ্বাসকে সাক্ষাৎ জ্ঞানে পরিণত করিতে হইলে, সেই তত্ত্বের অনবরত ধ্যান্ প্রয়োজন। ধ্যান দ্বারাই সাক্ষাৎ উপলব্ধি সম্ভব। অতএব ব্রহ্মজ্ঞানে বিচারবুদ্ধির প্রয়োজন থাকিলেও, উহা প্রারম্ভ মাত্র, শেষ নহে। বিচারও পরোক্ষ জ্ঞান। আলোচক বা বিচারক আলোচ্য বা

বিচার্য্য তত্ত্বকে জ্ঞেয়রূপে জানেন মাত্র, উপলব্ধি করেন না। ক্রমাগত বিচারে একগ্রতার হানি হয়, এবং ভেদজ্ঞান দৃঢ়ীভূত হয়। অতএব, বিচার দ্বারা আলোচ্য তত্ত্বে বিশ্বাস স্থাপিত হইলে বিচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক তত্ত্বের ধ্যানে নিযুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য। একাগ্রচিত্তে ধ্যান দ্বারা অভেদতত্ত্বের সাক্ষাৎ উপলব্ধি হইলেই ভ্রান্ত ভেদজ্ঞান বিদূরিত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপত্ব লাভ হয়। এই উপলব্ধি সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষমূলক। শ্রবণ ও মনন দ্বারা ঈদৃশ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষের উদয় হয় না, তজ্জন্য ভেদজ্ঞানও বিদূরিত হয় না। কারণ ভেদজ্ঞান মিথ্যা হইলেও প্রত্যক্ষমূলক, এবং এক প্রত্যক্ষই অপর প্রত্যক্ষের দূরীকরণ করিতে পারে, অপর কিছু নহে। যথা, একব্যক্তি সন্ধ্যাকালে সর্পকে রজ্জু বলিয়া ভ্রম করিতেছে। অর্থাৎ এস্থলে তাহার সর্পপ্রত্যক্ষ হইতেছে। কেহ যদি তাহাকে বলে, 'তুমি ভ্রমে পতিত হইয়াছ, উহা ত সর্প নহে, রজ্জু মাত্র'—তাহা হইলে সে তাহার বাক্য 'শ্রবণ' করে, অর্থাৎ আপাততঃ সত্য বলিয়া গ্রহণ করে। তৎপরে সে এই বিষয়ে চিন্তাও করে : 'এই গৃহ মধ্যে সর্প আসিবে কিরূপে ? চতুর্দ্দিকে বনজঙ্গলও ত নাই। অতএব উহা রজ্জুই, সর্প নহে।' ইহা 'মনন'। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তাহার সর্প প্রত্যক্ষের অবসান ঘটে না, সে রজ্জুকে পূর্ব্ববৎ সর্পরূপেই প্রত্যক্ষ করিতে থাকে। অতএব কেবল বিশ্বাস দ্বারা মিথ্যা প্রত্যক্ষের নিবারণও হয় না, সত্য প্রত্যক্ষের উদয়ও হয় না। কিন্তু যদি সে আলোকবর্ত্তিকা আনয়ন করিয়া বস্তুটীর নিকটবর্ত্তী হইয়া উহা প্রত্যক্ষ করে, তাহা হইলে সে রজ্জুকে রজ্জু রূপেই প্রত্যক্ষ করে, এবং এই সত্য রজ্জুপ্রত্যক্ষের দ্বারাই মিথ্যা সর্পপ্রত্যক্ষ নিবারিত হয়, বিশ্বাস দ্বারা নহে। তদ্রূপে অভেদপ্রত্যক্ষ বা উপলব্ধি দ্বারাই মিথ্যা ভেদপ্রত্যক্ষ নিবারিত হয়, বিচারালোচনা দ্বারা নহে। অবশ্য রজ্জুসর্পের দৃষ্টান্ত স্থলে রজ্জু-প্রত্যক্ষ ও সর্পপ্রত্যক্ষ উভয়েই ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ, এবং এক ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ দ্বারা অপর ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ বাধিত হইতেছে। কিন্তু অভেদ-প্রত্যক্ষ স্থলে তাহা সম্ভবপর নহে। এস্থলে ভেদপ্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়জ, কিন্তু

অভেদপ্রত্যক্ষ ধ্যানজ। ধ্যানজ উপলব্ধি ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষকে বাধিত করে। ইহা অদ্বৈতবেদান্ত মত।

রামানুজ প্রমুখ বৈদান্তিকগণের মতেও বিচারবুদ্ধি ও অনুমানপ্রণালী দ্বারা সাক্ষাৎ ব্রহ্মোপলব্ধি সম্ভব নহে। 'শ্রবণ' এবং 'মননের' পরে 'নিদিধ্যাসন' আবশ্যক। রামানুজ প্রভৃতির ধ্যানের সহিত শঙ্করের ধ্যানের মূলগত প্রভেদ। সাধারণতঃ ধর্ম্মতত্ত্বে "ধ্যান" শব্দ ঈশ্বরের উপাসনাবাচক। কিন্তু শঙ্করের মতে, "ধ্যান" অর্থ ঈশ্বরের স্বরূপ চিন্তন নহে, জীবব্রহ্মের ঐক্যচিন্তন। কিন্তু রামানুজ প্রভৃতি "ধ্যান" শব্দ সাধারণ ঈশ্বরোপাসনা অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন। ধ্যান জ্ঞানমূলক। ব্রহ্মের স্বরূপ ও গুণাবলী সম্বন্ধে শাস্ত্রপাঠ ("শ্রবণ") ও বিচারালোচনা ("মনন") দ্বারা পরোক্ষজ্ঞান লাভ হইলে, ব্রহ্মোপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। ব্রহ্ম ভক্তের ধ্যানে প্রীত হইলে তাঁহার নিকট স্বীয় স্বরূপ প্রকটিত করেন। ঈদৃশ ঈশ্বরানুগ্রহলব্ধ সাক্ষাৎকারই মুক্তির কারণ। এই বিষয়েও, রামানুজ প্রভৃতির সহিত শঙ্করের মূলগত প্রভেদ বিদ্যমান, কারণ শঙ্করের মতে, মোক্ষে ঈশ্বরানুগ্রহের কোনরূপ প্রয়োজনীয়তা নাই।

সূফী একতত্ত্ববাদ ও অতীন্দ্রিয়বাদের সহিত অদ্বৈত একতত্ত্ববাদ ও অতীন্দ্রিয়বাদের তুলনা করিলে উভয়ের পার্থক্য স্পষ্ট হইবে। উভয় এক-তত্ত্ববাদ সম্বন্ধে আলোচনা উপরে করা হইয়াছে (পৃঃ ১০)। দার্শনিক দিক্ হইতে বিজ্ঞানবাদী সূফীগণ ঈশ্বর ও জীবজগতের একত্ব, এবং মায়াবাদী সূফী-গণ ঈশ্বরের একত্ব ও জীবজগতের মিথ্যাত্ব প্রপঞ্চনা করিয়াছেন সত্য (পৃঃ ৯১—৯২)। সে সম্বন্ধে তাঁহারা প্রমাণও প্রদান করিয়াছেন। প্রথম শ্রেণীর সূফীগণের মতে, ঈশ্বর জগতে পূর্ণ অভিব্যক্ত হইয়াছেন, অতএব ঈশ্বর ও জগৎ অভিন্ন। দ্বিতীয় শ্রেণীর সূফীগণের মতে, পরমসত্তার অসত্তায় প্রতিবিম্বনই জগৎ, অতএব ঈশ্বরই একমাত্র সত্য, জগৎ নহে। কিন্তু দার্শনিক দিক্ হইতে এইরূপ একতত্ত্ববাদ প্রপঞ্চনা করিলেও, তাঁহাদের একতত্ত্ববাদ ও শঙ্করের একতত্ত্ববাদের মধ্যে মূলগত পার্থক্য বিদ্যমান।

(১) শঙ্করের মতবাদ শুদ্ধ দর্শনমূলক, (intellectual), ধর্ম্মের প্রকৃত ও শাশ্বত স্থান উহাতে নাই। ধর্ম্ম উপাস্য-উপাসক ভেদমূলক। সুতরাং, ব্যবহারিক স্তরেই (পৃঃ ১১১) কেবল ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্ম উপাস্য, জীব উপাসক। কিন্তু পারমার্থিক স্তরে একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, সৃষ্টিও নাই, জীবজগৎও নাই, স্রষ্টা ঈশ্বরও নাই। অতএব এই স্তরে ধর্ম্ম অথবা ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে কোনরূপ ব্যক্তিগত সম্বন্ধ অসম্ভব, কারণ এস্থলে জীবই স্বয়ং ব্রহ্ম, ব্রহ্মোপাসক নহে। কিন্তু সূফীমতবাদ প্রধানতঃ ধর্ম্মমূলক—ইহার মূল কথা দর্শন নহে, ধর্ম্ম। সূফীগণের মতে, ঈশ্বর-মানবের নিত্য সম্বন্ধ সেব্য-সেবক, উপাস্য-উপাসক, প্রেমিক-প্রেমিকার সম্বন্ধ। অতএব যাহা সূফীগণের নিকট পারমার্থিক, শঙ্করের নিকট তাহা ব্যবহারিক মাত্র। সূফীমতবাদ ভক্তিবাদ, শঙ্কর মতবাদ শুদ্ধ জ্ঞানবাদ।

(২) শঙ্করের মতবাদে ভাবাবেগের লেশমাত্র নাই। ভক্তি, প্রেম, বিরহ-জনিত ক্লেশ, মিলনজনিত উচ্ছ্বাস, আবেশ, উন্মাদনা, বিহ্বলতা প্রভৃতি সূফী একতত্ত্ববাদের মূল কথা; কিন্তু শঙ্করের মতবাদে ইহাদের স্থান, পারমার্থিক স্তরে ত দূরের কথা, ব্যবহারিক স্তরে পর্য্যন্ত নাই। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, শঙ্করের মতে পারমার্থিক স্তরে ধর্ম্মের প্রশ্নই উঠে না; অতএব উক্ত ভাবা-বেগেরও প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু ব্যবহারিক স্তরেও, ঈশ্বর ও জীবের সম্বন্ধ সূফীমতের ন্যায় আবেগবহুল প্রেমিক-প্রেমিকার সম্বন্ধ নহে, শ্রদ্ধামূলক উপাস্য-উপাসকের সম্বন্ধ মাত্র। মধুর রসই সূফী একতত্ত্ববাদের হৃদয়স্বরূপ। প্রেমিক-প্রেমিকার যে রাগঘন, ভাববিভোর একত্ব, ইহা সেই একই একত্ব। কিন্তু শঙ্করের একত্ব জ্ঞানের একত্ব—আনন্দস্বরূপ হইলেও, 'রস' বলিতে সূফী-মতবাদে যাহা বুঝায়, তাহার বিন্দুমাত্রও ইহাতে নাই।

(৩) সূফীগণ অবশ্য ভেদমূলক ধর্ম্মের স্তরেই আবদ্ধ থাকেন না, তাঁহারা অতীন্দ্রিয় অনুভব দ্বারা ঈশ্বরের সহিত একত্বও সাক্ষাৎ উপলব্ধি করেন। কিন্তু ঈদৃশ অনুভব সম্পূর্ণ হৃদয়জাত, মস্তিষ্কজাত নহে। ইহাকে "জ্ঞান" বলা হয়

বটে, কিন্তু ইহা প্রকৃতপক্ষে "ভাব" (feeling), "ভাবনা" (thinking) নহে। ভাবারূঢ় অবস্থাতেই ভক্ত ঈশ্বরের সহিত স্বীয় একত্ব উপলব্ধি করেন, অন্য কোনও অবস্থায় নহে। ঈদৃশ একত্বোপলব্ধি বুদ্ধিবিচারপ্রসূত ত নহেই, এমন কি, বুদ্ধি দ্বারা ইহার ধারণা মাত্র করিতে পারা যায় না। বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইলে, মস্তিষ্কের কার্য্য সম্পূর্ণরূপে প্রতিরুদ্ধ হইলে, তৎপরেই অনাবৃত হৃদয়ে ঈশ্বরের আলোক অবতীর্ণ হয় এবং ভক্ত ঈশ্বরের সহিত একত্বোপলব্ধি করেন। অতএব, সূফীগণের মতে, ঈশ্বরের সহিত একত্বোপলব্ধি আবেগমূলক, জ্ঞানমূলক নহে (পৃঃ ১২৪ দেখুন)। কিন্তু শঙ্করের মতে, ঈদৃশ একত্ব জ্ঞানমূলক, আবেগমূলক নহে। অভেদতত্ত্ব ধ্যান দ্বারা যে সাক্ষাৎ উপলব্ধি হয়, তাহা সাধারণ বিচারবুদ্ধিমূলক জ্ঞান না হইলেও, জ্ঞানই, জ্ঞানের চরম অবস্থা, ভাবাবেগ নহে। বিচারবুদ্ধিপ্রসূত জ্ঞান ও ঈদৃশ অনুভবপ্রসূত জ্ঞানের মধ্যে প্রকৃতিগত বিরোধ নাই, যেরূপ সূফীগণ বলেন। (নিম্নে দেখুন পৃঃ ১৫৫)। বিচারবুদ্ধিপ্রসূত জ্ঞান প্রারম্ভ, অনুভবপ্রসূত জ্ঞান সমাপ্তি; বুদ্ধিজ জ্ঞান পরোক্ষ, অনুভবজ জ্ঞান প্রত্যক্ষ। পরোক্ষ হইতে প্রত্যক্ষে, শ্রবণ ও মনন হইতে নিদিধ্যাসনে উপনীত হওয়াই মুমুক্ষুর চরম লক্ষ্য। অতএব সূফীগণ ও শঙ্কর উভয়েই একতত্ত্ববাদী হইলেও, একতত্ত্ব উপলব্ধি বিষয়ে তাঁহাদের প্রভেদ মূলগত। শঙ্করের মতে, ঈদৃশ উপলব্ধি মস্তিষ্কজাত, চিন্তাপ্রসূত, হৃদয়ের সহিত লেশমাত্র সম্বন্ধ ইহার নাই। সূফীগণের মতে, ঈদৃশ উপলব্ধি হৃদয়জাত, প্রেম-প্রসূত, মস্তিষ্কের সহিত লেশমাত্র সম্বন্ধ ইহার নাই।

(৪) শঙ্করের মতে একত্বোপলব্ধি সম্পূর্ণরূপে স্বপ্রচেষ্টালভ্য, কাহারও অনুগ্রহের ফল নহে। সূফীগণের মতে, ইহা একমাত্র ঈশ্বরানুগ্রহেরই ফল। হৃদয়ে ঈশ্বরের আলোক প্রতিফলিত হইলেই অতীন্দ্রিয় জ্ঞান, প্রেম ও সমাধির উদয় হয়, স্বপ্রচেষ্টায় নহে।

(৫) শঙ্করের একত্বোপলব্ধি জ্ঞানজ বলিয়া শাশ্বত, একবার উদিত হইলে

ইহার আর বিলয় নাই। কিন্তু সূফীগণের একত্বোপলব্ধি উন্মাদনাজাত বলিয়া চিরস্থায়ী নহে (পৃঃ ১০২)। ভাবোন্মত্ত সাধক ঈশ্বরের সহিত একত্ব কিছুক্ষণের জন্য উপলব্ধি করিয়া, সমাধি অবস্থার সমাপ্তি ঘটিলে অধিকাংশ সময় পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় ভেদ প্রত্যক্ষ করেন এবং ঈশ্বরের সহিত তাঁহার মিলনের অবসানও ঘটে। কিংবা অতি অল্পক্ষেত্রে, তিনি ঈশ্বরের সহিত সম্মিলিত থাকেন বটে, কিন্তু অভেদোপলব্ধির অবসান ঘটে, এবং তিনি তৎপরে নিজেকে ঈশ্বর হইতে ভিন্নাভিন্ন রূপে উপলব্ধি করেন (পৃঃ ১৩৭)। অতএব শঙ্করের জীবন্মুক্ত স্বয়ং ব্রহ্ম, সূফীগণের জীবন্মুক্ত স্বয়ং ঈশ্বর নহেন, ঈশ্বরসম্মিলিত ও ঈশ্বর হইতে ভিন্নাভিন্ন (পৃঃ ৩৭)।

(৬) বস্তুতঃ সূফীমতবাদে দর্শন, ধর্ম্ম ও মরমিয়াবাদের এক অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ দৃষ্ট হয়। দর্শনের দিক্ হইতে ঈশ্বর ও মানব অভিন্ন, ধর্ম্মের দিক্ হইতে তাঁহারা ভিন্ন, মরমিয়া অনুভূতির দিক্ হইতে তাঁহারা পুনরায় অভিন্ন (পৃঃ ১৬৬)। অতএব, সূফীগণের মতে ঈশ্বর ও মানব সম্পূর্ণ অভিন্ন হইলেও ভিন্ন। বৃষ্টিবিন্দু যেরূপ সমুদ্রে অবলুপ্ত হইয়া যায়, তদ্রূপ ঈশ্বরের স্বরূপেও ভক্তের পৃথক্ সত্তার সম্পূর্ণ বিলোপ হয়, তথাপি ভক্ত ঈশ্বরের সেবক, ঈশ্বরের প্রেমিক এবং ঈশ্বরের সহিত ঘনিষ্ঠ কথোপকথনে রত—অর্থাৎ ঈশ্বরভিন্ন ও পৃথক্ সত্তাবান্। অতএব প্রধানতঃ ধর্ম্মমূলক বলিয়া সূফীমতবাদ একতত্ত্ববাদ হইলেও দ্বৈতবাদ বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদ। কিন্তু বলা বাহুল্য, শঙ্করের মতবাদ শুদ্ধ অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতের নামগন্ধও ইহাতে নাই।

সুতরাং শঙ্করের একত্ববাদ ও সূফীগণের একত্ববাদ আপাততঃ এক বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে বহুলাংশে পৃথক্।

শঙ্করের অতীন্দ্রিয়বাদ ও সূফী অতীন্দ্রিয়বাদও এক নহে। 'অতীন্দ্রিয়বাদ' (Mysticism) শব্দের অর্থ কি? অর্থ এই যে, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি দ্বারা (Reason) পার্থিব তত্ত্বজ্ঞান সম্ভব হইলেও লোকোত্তর, চরমতত্ত্ব, ঈশ্বর বা ব্রহ্মজ্ঞান ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিলভ্য নহে। ইহাই 'অতীন্দ্রিয়বাদ'। এস্থলে প্রশ্ন এই যে, যদি ঈশ্বর

বা ব্রহ্ম বুদ্ধিলভ্য না হন, তাঁহাকে জানিবার উপায় কি? এই সম্বন্ধে দুইটী মত আছে। প্রথম মতানুসারে, ঈশ্বরোপলব্ধি বুদ্ধিপ্রসূত না হইলেও জ্ঞানমূলক (intellectual)। সাধারণ "বুদ্ধিশক্তি" (Reason) ব্যতীত মানবের অপর একটী শ্রেয়ঃ শক্তি আছে, যাহাকে "প্রজ্ঞা শক্তি" (Intuition) বলা হয়। এই প্রজ্ঞাশক্তি দ্বারাই অতীন্দ্রিয়, লোকোত্তর তত্ত্বসম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হয়। প্রজ্ঞা কিন্তু বুদ্ধি হইতে ভিন্ন হইলেও, বুদ্ধিবিরোধী নহে, বুদ্ধির নিরোধকারীও নহে, উপরন্তু বুদ্ধির চরমোৎকর্ষ, শ্রেষ্ঠ অবস্থা মাত্র। দ্বিতীয় মতানুসারে, ঈশ্বরোপলব্ধি বুদ্ধিপ্রসূতও নহে, জ্ঞানমূলকও নহে, সম্পূর্ণ আবেগমূলক (emotional)। ইহা হৃদয় দ্বারা অনুভূতি, মস্তিষ্ক দ্বারা উপলব্ধি নহে এবং ঈদৃশ হৃদয়জ অনুভব বুদ্ধিজ জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বুদ্ধিশক্তি সম্পূর্ণ এবং শাশ্বতভাবে বিলুপ্ত হইবার পরে,—পূর্ব্বে নহে—হৃদয় ঈশ্বরালোক দ্বারা আলোকিত হইয়া তাঁহাকে সাক্ষাৎ অনুভব করে। অতএব, 'ঈশ্বরকে বুদ্ধি দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না', এই বিষয়েই কেবল উক্ত দ্বিবিধ অতীন্দ্রিয়বাদ একমত। কিন্তু 'কি প্রকারে তাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়', সে বিষয়ে ইহারা সম্পূর্ণ ভিন্নমত। তজ্জন্য উভয় মতবাদকেই কেবল 'অতীন্দ্রিয়বাদ' নামে অভিহিত করিলে অর্থবোধের দিক্ হইতে অসুবিধা হইতে পারে। তজ্জন্য জ্ঞানমূলক অতীন্দ্রিয়বাদকে (Intellectual Mysticism) "প্রজ্ঞাবাদ", এবং আবেগমূলক অতীন্দ্রিয়বাদকে (Emotional Mysticism) "মরমিয়াবাদ" নামে অভিহিত করিলে ভ্রমপ্রমাদের সম্ভাবনা থাকে না। \

উপরি লিখিত বিবরণী (পৃঃ ৫১-৫৪) হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, শঙ্করের অতীন্দ্রিয়বাদ "প্রজ্ঞাবাদ" ও সূফীগণের অতীন্দ্রিয়বাদ "মরমিয়াবাদ"। অতএব, এই বিষয়েও শঙ্করের সহিত সূফীগণের মতভেদ আছে।

সুতরাং শঙ্করের অদ্বৈতবাদ ও সূফী অদ্বৈতবাদ বহুলাংশে পৃথক্।

বরং রামানুজ-প্রমুখ বৈষ্ণব বৈদান্তিকগণের সহিত সূফীমতবাদের কিয়দংশে সাদৃশ্য আছে।

(১) অবশ্য রামানুজ প্রভৃতি দর্শন বা মরমিয়াবাদ কোন দিক্ হইতেই অদ্বৈতবাদী নহেন, সকল দিক্ হইতেই দ্বৈতাদ্বৈত বা দ্বৈতবাদী।

(২) রামানুজ অতীন্দ্রিয়বাদী হইলেও প্রজ্ঞাবাদী, মরমিয়াবাদী নহেন। তাঁহার মতে, ব্রহ্ম ভক্তিলভ্য। 'ভক্তি' অর্থ ধ্যান বা উপাস্য বিষয়ের অনবরত চিন্তা ও স্মরণ। ইহাকে রামানুজ তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্না স্মৃতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব, প্রথমতঃ ঈদৃশ ভক্তি স্মৃতি বা চিন্তামাত্র—জ্ঞানবিশেষ, জ্ঞানের প্রগাঢ় অবস্থা ও চরমোৎকর্ষ, ভাবাবেশ নহে। অতএব ইহাকেই আমরা 'প্রজ্ঞা' নামে অভিহিত করিতে পারি। দ্বিতীয়তঃ, ভক্তি ব্রহ্মজ্ঞান-মূলক। জ্ঞান হইতেই ভক্তির উৎপত্তি, এবং ভক্তি জ্ঞানের শেষ অবস্থা। 'ব্রহ্মজ্ঞান' পরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান, 'ব্রহ্মভক্তি' অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান, বা ব্রহ্মোপলব্ধি—এইমাত্র প্রভেদ। অতএব রামানুজের অতীন্দ্রিয়বাদ সূফী অতীন্দ্রিয়বাদ হইতে ভিন্ন।

নিম্বার্কের অতীন্দ্রিয়বাদও সূফী অতীন্দ্রিয়বাদ হইতে পৃথক্। নিম্বার্কের মতে অবশ্য 'ভক্তি' স্মৃতি বা জ্ঞানবিশেষ নহে, "প্রেমবিশেষলক্ষণা" প্রগাঢ় ভগবৎপ্রীতি। জ্ঞানজা ভক্তি ও উপাসনা হইতে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ও ব্রহ্মোপ-লব্ধি হয়, এবং ঈদৃশ উপলব্ধি সাধারণ জ্ঞান না হইলেও, অতীন্দ্রিয় জ্ঞান, ভাব নহে।

কিন্তু রামানুজ প্রভৃতির মতবাদ মরমিয়াবাদ না হইলেও, সূফীমতেরই ন্যায় ধর্ম্মমূলক। তাঁহাদের মতে, ঈশ্বর ও জীবের নিত্যসম্বন্ধ উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধ। এস্থলে রামানুজ ও মধ্ব শ্রদ্ধা এবং নিম্বার্ক ও বলদেব প্রীতির উপর জোর দিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, সূফীগণের ন্যায় বৈষ্ণব বৈদান্তিকগণও ঈশ্বরের অনুগ্রহকেই ব্রহ্মোপলব্ধির প্রধান কারণ বলিয়াছেন।

নবম পরিচ্ছেদ

সূফীমতবাদে সনাতনপন্থী ইসলামধর্ম্মিগণের কতিপয় প্রধান আপত্তি।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, সনাতনপন্থী ইস্‌লামধর্ম্মিগণ নবসূফীধর্ম্মের বিরোধী ছিলেন (পৃঃ ১৭)। তাঁহাদের আপত্তির বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইতেছে।

(১) ঈশ্বরের জগদ্‌বহির্ভূতত্ব অপেক্ষা তাঁহার জগল্লীনত্বই সূফীগণ সজোরে প্রচার করেন। কোনোও কোনোও সূফীসম্প্রদায়ের মতে, ঈশ্বর সম্পূর্ণ ভাবেই জগল্লীন, জগদতিরিক্ত নহেন। কিন্তু সনাতনপন্থিগণের মতে, ঈশ্বর জগদ্‌বহির্ভূত স্রষ্টা, শাসক, বিচারক ও উপদেষ্টা; এবং মানবের স্বীয় গ্রীবা-দেশস্থ ধমনী অপেক্ষাও তিনি তাহার নিকটতর হইলেও (কোরাণ ২০-১৫২) তিনি বিশ্বচরাচর হইতে সম্পূর্ণ এবং সর্ব্বদাই ভিন্ন। তজ্জন্য ঈশ্বরের জগল্লীনত্ব ও বিশ্বাত্মবাদ তাঁহারা সমর্থন করেন না।

(২) অধিকাংশ সূফীমতে, ঈশ্বরকে "একমেবাদ্বিতীয়" বলার অর্থ কেবল ইহাই নহে যে, ঈশ্বর ভিন্ন অন্য ঈশ্বর নাই, কিন্তু ইহাও যে ঈশ্বর ভিন্ন অপর তত্ত্বও নাই। অতএব ঈশ্বরই একমাত্র ঈশ্বর, ঈশ্বরই একমাত্র তত্ত্ব। জগৎ মিথ্যা মরীচিকা মাত্র, অথবা মতান্তরে, ঈশ্বরের মূর্ত্ত অভিব্যক্তিরূপে স্বয়ং ঈশ্বর, ঈশ্বরভিন্ন দ্বিতীয় তত্ত্ব নহে। কিন্তু সনাতন ইস্‌লামমতে, জগৎ মিথ্যা নহে, সত্য; এবং ঈশ্বর হইতে সম্পূর্ণ এবং সর্ব্বকালে ভিন্ন। অতএব ঈশ্বরকে "একমেবাদ্বিতীয়" বলার অর্থ এই নহে যে, ঈশ্বর ভিন্ন দ্বিতীয় তত্ত্ব নাই। ঈশ্বরই একমাত্র ঈশ্বর, একমাত্র প্রভু, কিন্তু একমাত্র তত্ত্ব নহেন, কারণ জগৎ ঈশ্বরভিন্ন দ্বিতীয় তত্ত্ব। অতএব সূফীমত একতত্ত্ববাদ (Monism), সনাতন ইস্‌লাম মত একেশ্বরবাদ (Monotheism)। অতএব ধর্ম্মের দিক্ হইতে একেশ্বরবাদী

হইলেও সনাতন ইস্‌লাম দর্শনের দিক্ হইতে দ্বৈতবাদী। সুফীগণ কিন্তু ধর্ম্মের দিক্ হইতে একেশ্বরবাদী, এবং দর্শনের দিক্ হইতেও একতত্ত্ববাদী।

(৩) সুফীমতবাদের, বিশেষরূপে পরবর্ত্তী সুফীমতবাদের, মূলকথা ঈশ্বরের প্রেমস্বরূপত্ব। এই মতে, ঈশ্বর ও মানবের সম্বন্ধ প্রেমিক-প্রেমিকার সম্বন্ধের অনুরূপ, এবং ঈশ্বর প্রেম ও প্রীতিরই পাত্র,ভয়ের পাত্র একেবারেই নহেন। কিন্তু সনাতন ইস্‌লামে ঈশ্বর পরমকরুণাময় পরিত্রাতা ও কঠোর শাসনকর্ত্তা উভয়রূপেই পরিগৃহীত হইয়াছেন। এই মতে, ঈশ্বর ও মানবের শাশ্বত সম্বন্ধ প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ, প্রেমিক-প্রেমিকার সম্বন্ধ নহে। সুফীগণ ঈশ্বরের সহিত যে ঘনিষ্ঠ প্রেমমূলক, উচ্ছ্বাস ও উন্মাদনাময় সম্বন্ধের দাবী করেন, সনাতনপন্থী ইস্‌লামধর্ম্মিগণের মতে তাহা অনুমোদনযোগ্য নহে। কারণ, মানব সর্ব্বদাই এবং সর্ব্বাবস্থাতেই ঈশ্বরের দাসানুদাস মাত্র, এবং প্রভুর প্রতি প্রেম দাসের কর্ত্তব্য হইলেও, এস্থলে প্রেম, প্রীতি ও অত্যধিক ঘনিষ্ঠতা অপেক্ষা সম্ভ্রম ও ভয়ই অধিক শোভনীয় ও কর্ত্তব্য। বিখ্যাত সুফী গাজালী ঈশ্বর ও মানবের ভয়মূলক সম্বন্ধ সুফীমতবাদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন।

(৪) সনাতন ইস্‌লামপন্থিগণের মতে, মুসলমান (বিশ্বাসী) ও কাফেরের (অবিশ্বাসী) মধ্যে প্রভেদ নিত্য ও অপরিহার্য্য। তাঁহাদের মতে যিনি এক ঈশ্বর আল্লাহ্, মহম্মদ ও কোরাণে বিশ্বাসশীল তিনিই 'বিশ্বাসী'; এবং 'অবিশ্বাসী'কে সত্য ধর্ম্মে (ইস্‌লামে) দীক্ষিত, ও স্বীয় সত্যধর্ম্মের প্রাণপণ সংরক্ষণ করাই প্রত্যেক 'বিশ্বাসী'র অবশ্য কর্ত্তব্য। ঈদৃশ ধর্ম্মসংরক্ষণ ও ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য প্রয়োজন হইলে "ধর্ম্ম-যুদ্ধে"র (জিহাদ্) সাহায্যও গ্রহণে পশ্চাৎপদ হওয়া উচিত নহে। কিন্তু ঈশ্বরের একত্ব ও সকল মানবের ঈশ্বর-স্বরূপত্ব প্রচারক সুফীগণ মুসলমান ও অমুসলমানের পার্থক্য প্রায় বাতিল করিয়া দিয়াছিলেন। যথা, সাবিস্তরি তাঁহার "গুল্‌সান্ ই রাজ্" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, খৃষ্টধর্ম্ম, প্রাচীন পারসিক ধর্ম্ম, এমন কি পৌত্তলিকতা পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ দূষণীয় নহে; এবং এই সকল ধর্ম্মের

প্রশংসার্হ অংশ সূফীগণের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। তিনি বলিয়াছেন: "অবিশ্বাসের মধ্যেও সত্য বিশ্বাস লুক্কায়িত হইয়া আছে।" আবুল খেয়র্ বলিয়াছেন: "যতদিন পর্য্যন্ত না বিশ্বাস ও অবিশ্বাস এক হইয়া যায়, ততদিন প্রকৃত মুসলমানের আবির্ভাব হইবে না।" রূমীও ভাবোন্মত্ত হইয়া বলিয়াছেন: "বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী সাধু যদি কেহ থাকেন—তাঁহারা সকলই আমিই।" তিনি ইহাও বলিয়াছেন: "সকল ধর্ম্মমত বৃথা বলিয়া চীৎকার করিও না। তাহাদের মধ্যে কিছু না কিছু সত্য আছে।" কিন্তু সনাতন পন্থিগণ সূফীগণের ন্যায় সকল ধর্ম্মের সত্যতা স্বীকার করেন না। সূফীগণের মতে "ধর্ম্মযুদ্ধ" (জিহাদ্) অর্থ বিধর্ম্মী বিনাশ নহে, কামনা বাসনা ধ্বংস মাত্র। কিন্তু সনাতনপন্থিগণ "ধর্ম্মযুদ্ধ" শব্দের ঈদৃশ রূপক অর্থ গ্রহণে আপত্তি করেন, ইহা বিধর্ম্মিগণের বিরুদ্ধে অভিযান, এই আক্ষরিক অর্থই গ্রহণ করেন। তাঁহারা বলেন যে, এই রূপক অর্থ গ্রহণের ফলে মুসলমানগণ যুদ্ধবিমুখ হইয়া পড়েন, এবং তজ্জন্য ইস্‌লামধর্ম্ম প্রচারে বাধার সৃষ্টি হয়।(১)

(৫) সূফীগণ কোরাণ ও সুন্নার (২) সাহায্য ব্যতীতই ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসেন বলিয়া দাবী করেন। তাঁহাদের মতে, প্রত্যেক মানবই সাক্ষাৎ ঈশ্বরের নিকট হইতে বাণী, প্রত্যাদেশ ও আলোক প্রাপ্ত হইতে পারেন, এবং সাধু বা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক হইতে পারেন। কিন্তু সনাতন ইস্‌লাম মতে, মহম্মদই শেষ ঈশ্বর হইতে সাক্ষাৎভাবে বাণী প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং তিনিই শেষ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক (পয়গম্বর)। তৎপরে, কেহই সাক্ষাৎ ঈশ্বরের নিকট বাণী প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক হইতে পারেন না। কেহ যদি ঈশ্বরের সহিত মিলিত হইতে চান, তাহা হইলে তাঁহাকে কোরাণ ও সুন্নার সাহায্যেই অগ্রসর হইতে হইবে, স্বতন্ত্রভাবে নহে।

(৬) সনাতনপন্থিগণ সূফী সন্ন্যাসবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী। যদিও

---

(১) Mystic Tendencies in Islam by M. M. Zuhurd Din Ahmad P. 26.

(২) পৃঃ ৭ ফুটনোট্ (১) দেখুন।

মহম্মদ নিজে অতীব সরল আড়ম্বরহীন জীবন যাপন করিতেন, এবং যদিও তিনি উপবাস, তীর্থযাত্রা, প্রাত্যহিক প্রার্থনা, মদ্যত্যাগ প্রভৃতি অবশ্য কর্ত্তব্যরূপে বিধান করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি সন্ন্যাসধর্ম্ম ও সংসার ত্যাগের বিরোধী ছিলেন, এবং প্রত্যেক সুস্থ সবল ব্যক্তিরই বিবাহ করিয়া সংসার-ধর্ম্ম পালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু বহু সূফী সন্ন্যাস ও চিরকৌমার্য্য ব্রত বরণ করিতেন।

(৭) সূফীগণের গুরুবাদও সনাতনধর্ম্মিগণ অনুমোদন করেন না। তাঁহাদের মতে, ঈশ্বরের সহিত সম্মিলিত হইতে হইলে গুরুর সাহায্য অত্যাবশ্যক—ইহা মনে করা ভুল। উপরন্তু ঈশ্বরের আদেশানুবর্ত্তী হইয়াই ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হওয়া যায়। মহম্মদই ঈশ্বরের আদেশ সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং উহা একমাত্র কোরাণেই লিপিবদ্ধ আছে। অতএব কোরাণ ও সুন্নার সাহায্যেই ঈশ্বরের নিকট অগ্রসর হইতে হইবে, গুরুর সাহায্যে নহে। কিন্তু বহু সূফী গুরুর সেবা ও পূজাকে ধর্ম্মসাধনার অন্যতম অঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। কিন্তু সনাতন ইস্‌লামের মতে, একমাত্র ঈশ্বরই পূজনীয়, অন্য কেহই নহে।

(৮) 'দিক্‌র্', ভিক্ষা প্রভৃতি সূফী আচারানুষ্ঠান ইস্‌লাম অনুমোদিত নহে।

(৯) সূফী নিষ্ক্রিয়াবাদ (Quietism) সনাতন ইস্‌লামের অনুমোদিত ক্রিয়াবাদের (**Activism**) বিরোধী। ইস্‌লামে দর্শন অপেক্ষা ধর্ম্ম ও নীতির প্রাবল্যই সমধিক। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্বালোচনা অপেক্ষা ঈশ্বরের উপাসনা ও কোরাণোপদিষ্ট আচারানুষ্ঠানই ইহা অধিক প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচনা করে।

(১০) কোরাণোপদিষ্ট বাহ্যিক আচারানুষ্ঠান বিষয়েও সূফীগণের সহিত সনাতনপন্থিদের মতদ্বৈধ আছে। সনাতনপন্থিগণের মতে, প্রাত্যহিক প্রার্থনা, উপবাস, তীর্থযাত্রা, প্রভৃতি ধর্ম্মাচার বাধ্যতামূলক, এবং বাহ্যিক ধর্ম্মাচারে অবহেলা অতি গুরুতর অপরাধ। কিন্তু বহু সূফীর মতে, ঈশ্বরভক্ত

সাধুর পক্ষে ইহা অত্যাবশ্যক অথবা বাধ্যতামূলক নহে, এবং বাহ্যিক আচারানুষ্ঠান অপেক্ষা আন্তরিক পবিত্রতাই সমধিক কাম্য। কোনও কোনও স্ফী ইহা পর্য্যন্ত বলিয়াছেন যে, 'অবিশ্বাসী'র প্রকৃত ধর্ম্মপরায়ণতা বাহ্যাড়ম্বর-প্রিয় কলুষমনা 'মুসলমানের' আচারানুষ্ঠান অপেক্ষা শতগুণে প্রশংসার্হ।

(১১) কোনও কোনও স্ফী অবতারবাদের প্রপঞ্চনা করেন। কিন্তু ইহা সনাতন ইস্‌লামমতের সম্পূর্ণ বিরোধী। এই মতানুসারে, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণও ঈশ্বরের অবতার নহেন, ঈশ্বরের বার্ত্তাবহ ও ঈশ্বরের দাস মাত্র। তজ্জন্য তাঁহারা শ্রদ্ধার পাত্র নিশ্চয়ই, এবং তাঁহাদের উপদেশানুসারেই সাধনমার্গে অগ্রসর হইতে হয়; কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহারা ঈশ্বরের ন্যায় উপাস্য নহেন।

(১২) কোনো কোনো স্ফী আত্মার নিত্যতা স্বীকার করেন। কিন্তু সনাতন ইস্‌লাম মতে, মানব সৃষ্টির চরমোৎকর্ষ সন্দেহ নাই, এবং দেবদূতগণও ঈশ্বরাজ্ঞানুসারে তাহাকে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি আত্মা সৃষ্ট পদার্থ মাত্র, এবং ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন নহে, ঈশ্বরের ন্যায় নিত্যও নহে।

(১৩) স্ফী মরমিয়াবাদের ভাবাবেগ, উন্মাদনা, উচ্ছ্বাস, সমাধি প্রভৃতির সহিত সনাতন ইস্‌লাম প্রবর্ত্তিত স্থির, ধীর ঈশ্বরোপাসনার কোনোরূপ সাদৃশ্য নাই।

দশম পরিচ্ছেদ

উপসংহার

স্ফীমতের সহিত বেদান্তের সংক্ষেপে তুলনা করা হইল। 'বেদান্ত' বলিতে যেরূপ 'স্ফীমত' বলিতেও সেইরূপ, কেবল একটী মাত্র মতবাদই বুঝায় না, কিন্তু উভয়েই বহু বিভিন্ন মতের সমাহার। বেদান্তে কেবলাদ্বৈতবাদ (শঙ্কর), বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ (রামানুজ), দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, (নিম্বার্ক), দ্বৈতবাদ (মধ্ব), শুদ্ধাদ্বৈতবাদ (বল্লভ), ঔপাধিক ভেদাভেদবাদ (ভাস্কর), অচিন্ত্য ভেদা-

ভেদবাদ (বলদেব) এবং বৈষ্ণব মরমিয়াবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন মতবাদ দৃষ্ট হয়। সমভাবে, স্থফীমতেও, কেবলাদ্বৈতবাদ (সাবিস্তরি প্রভৃতি), বিশ্বাত্মবাদ (ইবন্ আরবী প্রভৃতি), দ্বৈতাদ্বৈতবাদ (রূমী প্রভৃতি), দ্বৈতবাদ (কালাবাধী প্রভৃতি) প্রভৃতি বিভিন্ন মতবাদের প্রপঞ্চনা আছে। অতএব স্থফী মতবাদের সহিত বেদান্ত মতবাদের তুলনাকালে এই সকল বিভিন্ন মতবাদকে পৃথগ্রূপে গ্রহণ করিয়া তুলনা করাই কর্ত্তব্য, নতুবা বিপত্তি ও ভ্রমের উদ্ভব হইতে পারে। উপরে সেই প্রচেষ্টাই করা হইয়াছে।

সাধারণভাবে অদ্বৈতবাদ ব্যতীত বিভিন্ন বেদান্ত সম্প্রদায় নিম্নলিখিত বিষয়ে একমত :—

(১) ব্রহ্মই সর্ব্বোচ্চ সত্য, এবং অনাদি, অনন্ত সচ্চিদানন্দস্বরূপ ও অশেষ কল্যাণগুণমণ্ডিত। (২) জীবজগৎ ব্রহ্মের কার্য্য ও পরিণাম এবং ব্রহ্ম তাহাদের অভিন্ন নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। (৩) ব্রহ্ম স্বপ্রয়োজন ব্যতীতই জীবের কর্ম্মানুসারে লীলাভরে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। (৪) ব্রহ্ম জগল্লীন হইলেও জগদতিরিক্ত। (৫) জীবজগৎ ব্রহ্মাশ্রিত ও ব্রহ্মান্তর্গত হইলেও ব্রহ্মেরই ন্যায় সত্য ও নিত্য। (৬) জীব কর্ম্মানুসারে বারংবার জন্মগ্রহণ করিয়া বিভিন্ন আকার ও অবস্থা প্রাপ্ত হয়, এবং ইহাই বন্ধ। (৭) অনাদি সংসার চক্র অর্থাৎ জন্মজন্মান্তর হইতে মুক্তিই মোক্ষ, স্বর্গ নহে, কারণ স্বর্গও অনিত্য মাত্র। (৮) জীব বন্ধ ও মোক্ষ উভয় অবস্থাতেই ব্রহ্ম হইতে ভিন্নাভিন্ন, ব্রহ্মের দাস, অণু ও সৃষ্ট্যাদিশক্তিহীন। (৯) জীবন্মুক্তি নাই, বিদেহ মুক্তিই একমাত্র মুক্তি। (১০) অজ্ঞান বা অবিদ্যাই বন্ধের মূল কারণ। (১১) নিষ্কাম কর্ম্ম, সদ্গুরুর নিকট শাস্ত্রপাঠ, মনন, জ্ঞান, ধ্যান, ভক্তি, ভগবৎ প্রসাদ ও সাক্ষাৎকার মোক্ষের সাধনাবলী (১২) জীবের হিতার্থে, ব্রহ্ম অবতাররূপে ধরাতলে অবতীর্ণ হন। (১৩) ব্রহ্ম অতীন্দ্রিয় জ্ঞানলভ্য, ইন্দ্রিয় বা বুদ্ধি লভ্য নহেন। (১৪) ব্রহ্ম ও ঈশ্বর অভিন্ন।

শঙ্কর মতে, (১) ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জীবজগৎ মিথ্যা, মায়া মাত্র

(২) ব্রহ্ম নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় সচ্চিদানন্দস্বরূপ। (৩) ব্রহ্ম মায়াশক্তি সাহায্যে মিথ্যা জগৎ সৃষ্টি করেন, অর্থাৎ মায়াপোহিত সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর জগৎস্রষ্টা, জগতের অভিন্ন উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। (৪) জীবের ন্যায় ঈশ্বরও পারমার্থিক স্তরে মিথ্যা। (৫) সৃষ্টি জীবের কর্ম্মানুসারী। (৬) অনাদি সংসার চক্র বা জন্মজন্মান্তরই বন্ধ। (৭) জন্মজন্মান্তর হইতে চিরমুক্তি মোক্ষ, স্বর্গ নহে। (৮) জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন, অর্থাৎ ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। (৯) জীবন্মুক্তি সম্ভব। (১০) অজ্ঞান বা অবিদ্যাই বন্ধের মূল কারণ। (১১) ব্রহ্মজ্ঞান মোক্ষের একমাত্র উপায় (১২) ব্রহ্ম অতীন্দ্রিয় জ্ঞান লভ্য।

সংক্ষেপে ও সাধারণভাবে, বেদান্তের ন্যায় সূফীমতেও, (১) ঈশ্বরই সর্ব্বোচ্চ সত্য। মতভেদে, তিনিই একমাত্র সত্য। (২) ঈশ্বরই সর্ব্বগুণোপেত। মতভেদে, তিনি পূর্ব্বে নির্গুণ, পরে সগুণ। (৩) তিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ। (৪) তিনি জগল্লীন হইলেও জগদতিরিক্ত। মতভেদে, তিনি সম্পূর্ণ জগল্লীন, অথবা সম্পূর্ণ জগদতিরিক্ত। (৫) তিনি জগৎস্রষ্টা। জগৎ তাঁহার স্বরূপ বা গুণাবলীর বাহ্যিক অভিব্যক্তি। মতভেদে, অসতে সতের প্রতিবিম্বই জগৎ। ৬) প্রেম ও আনন্দ হইতে জগৎসৃষ্টি এবং জগৎ তাঁহার প্রেম ও আনন্দের মূর্ত্ত বিকাশ। (৭) জীবজগৎ ব্রহ্মের অভিব্যক্তিরূপে ব্রহ্মেরই ন্যায় সত্য। মতভেদে, জীবজগৎ মিথ্যা স্বপ্নমাত্র। (৮) বিভিন্ন মতে, জীবজগৎ ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন, ভিন্নাভিন্ন; বা সম্পূর্ণ ভিন্ন। (৯) ঈশ্বরের সহিত একত্ব বা মিলনই মুক্তি। মতভেদে, ঈশ্বরের দাসত্বই চরম কাম্য। (১০) সকল মতেই, জীবেশ্বরের নিত্য সম্বন্ধ উপাসক-উপাস্য সম্বন্ধ। দর্শনের দিক হইতে জীব ঈশ্বর হইতে অভিন্ন হইলেও ধর্ম্মের দিক্ হইতে জীব ঈশ্বরভিন্ন ও ঈশ্বরোপাসক। (১১) অধিকাংশ সূফীমতে, ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধ ব্যতীত প্রেমিক-প্রেমিকার সম্বন্ধও বিদ্যমান। মতভেদে, ইহাদের সম্বন্ধ প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ। (১২) দারিদ্র্য, সন্ন্যাস, সংযম প্রভৃতি মুক্তির উপায় হইলেও, ঈশ্বরানুগ্রহই ইহার প্রকৃত কারণ। (১৩) নামজপ, প্রাণায়াম, ধ্যান প্রভৃতি মুক্তির

সহকারী অঙ্গ। (১৪) জীবন্মুক্তি সম্ভব। (১৫) ঈশ্বর ইন্দ্রিয় বা বুদ্ধিলভ্য নহেন, অতীন্দ্রিয় অনুভব লভ্য। (১৬) মুমুক্ষু গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া নিগূঢ় সাধনমার্গ তাঁহার নিকট হইতেই প্রথম শিক্ষা করেন। (১৭) তৎসত্ত্বেও প্রতি মানব পরিশেষে সাক্ষাৎ ঈশ্বর হইতে বাণী ও আলোক প্রাপ্ত হইতে পারে। (১৮) ভগবৎসম্মেলিত সাধুর পক্ষে বাহ্যিক ধর্ম্মাচার নিষ্প্রয়োজন হইলেও, তিনি লোকশিক্ষার জন্য স্বেচ্ছায় উহা পালন করেন। (১৯) বাহ্যিক ধর্ম্মাচার অপেক্ষা আন্তর নিষ্কলতাই অধিক প্রয়োজন। (২০) প্রত্যেক জীব ঈশ্বরস্বরূপ বলিয়া মুসলমানে অমুসলমানে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ভেদ নাই। পরমতসহিষ্ণুতা ও বিশ্বপ্রেম প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য।

সংক্ষেপে ও সাধারণভাবে বেদান্ত ও সুফী মতের প্রভেদ নিম্নলিখিত-রূপ :—(১) সুফীগণ কর্ম্মবাদী নহেন এবং তাঁহারা জন্মজন্মান্তর স্বীকার করেন না। (২) অধিকাংশ সুফীর মতে জীবজগৎ অনিত্য। (৩) অধিকাংশ সুফী অবতারবাদবিরোধী। (৪) শঙ্কর প্রভৃতির ন্যায় তাঁহারা প্রজ্ঞাবাদী নহেন, মরমিয়াবাদী।

উপরি লিখিত বিবরণী হইতেই স্পষ্ট হইবে যে বেদান্তের সহিত সুফীমতের সাধারণভাবে বহুলাংশে সাদৃশ্য বর্ত্তমান। কিন্তু যদি কোনও বিশেষ বেদান্ত সম্প্রদায়ের সহিত কোনো বিশেষ সুফী সম্প্রদায়ের তুলনা করা যায়, তাহা হইলে সর্ব্বাঙ্গীন সৌসাদৃশ্য আবিষ্কার করা অসম্ভব; এবং বৈসাদৃশ্যও যথেষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়। সাধারণ ধারণা এই যে সুফীমত সর্ব্বাংশে অদ্বৈতমতানুরূপ কিন্তু ইহা যে ভ্রমমাত্র তাহা পূর্ব্বেই দর্শিত হইয়াছে। যথা, কেহ কেহ বলিয়াছেন: "রূমী যাহা ইরাণে প্রচার করেন, শঙ্কর তাহাই ভারতে প্রপঞ্চনা করেন;" (১) "বৈদান্তিকগণের সহিত সুফীগণের এরূপ অধিক

(১) "What Rumi said in Iran, Sankara expounded in India and the same was reflected in the European mind". See Outlines of Islamic Culture. By A. M. A. Shushtery, p 450.

সাদৃশ্য বর্ত্তমান যে সময়ে সময়ে তাঁহাদের প্রধান মতবাদগুলির ভিতর প্রভেদ করা কঠিন হইয়া পড়ে" (২)। প্রথমতঃ, রুমীর সহিত শঙ্করের পার্থক্য মূলগত। কারণ, রুমীর মতে, জীব ঈশ্বর হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন, মাত্র ধর্ম্মতঃ অভিন্ন; এবং ঈশ্বরের সহিত জীবের মিলন ভাবোন্মত্ত সমাধি অবস্থাতেই কেবল সম্ভব। শঙ্করের কেবলাদ্বৈতবাদ ও শুদ্ধ জ্ঞানবাদের সহিত উক্ত মতবাদের সাদৃশ্য কোথায়? এসম্বন্ধে উপরে বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, সাধারণভাবে গ্রহণ করিলে অবশ্য সাদৃশ্যের অভাব নাই, কিন্তু মতবিশেষ গ্রহণ করিলে বৈসাদৃশ্যই সমধিক। যথা, সাবিস্তরি শঙ্করের ন্যায় জগতের মিথ্যাত্ব প্রপঞ্চনা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে উভয়ের বহুল পার্থক্য বিদ্যমান (পৃঃ ১১০)। রুমী ও হাল্লাজ্ রামানুজ্ ও নিম্বার্কের ন্যায় দ্বৈতাদ্বৈতবাদ প্রচার করিলেও, তাঁহাদের পরস্পর প্রভেদেরও অভাব নাই (পৃঃ ১১২)। কালাবাধী ও হুজ্যিরি মধ্বের ন্যায় দ্বৈতবাদী, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে ভিন্নমত (পৃঃ ১০৮)। ইবন্ আরবী প্রমুখ বিশ্বাত্মবাদিগণ বল্লভের ন্যায় জগতের সত্যত্বে বিশ্বাসী হইলেও ঈশ্বরের জগদ্-বহির্ভূতত্বে বিশ্বাসী নহেন (পৃঃ ১০৯)। পরিশেষে, সূফী মরমিয়াবাদ বহুলাংশে বৈষ্ণব মরমিয়াবাদের সমতুল হইলেও, অধিকাংশ সূফী মরমীগণ দর্শনের দিক্ হইতে অদ্বৈতবাদী ও বিশ্বাত্মবাদী, কিন্তু বৈষ্ণব মরমিয়াগণ অচিন্ত্য ভেদাভেদ-বাদী ও ঈশ্বরাধিকত্ববাদী। অতএব বেদান্ত মতবিশেষের সহিত সূফী মত-বিশেষের সর্ব্বাংশে সাদৃশ্য স্থাপনের প্রচেষ্টা বৃথা। সাধারণ সাদৃশ্যই গ্রহণীয়।

বস্তুতঃ, সূফীমতে বিভিন্ন বেদান্ত সম্প্রদায়, বৌদ্ধমত এবং যোগদর্শনের

(২) "The Mystics of Islam, known as Sufis, have so much in common with the Vedantists among the Hindus that some—times it is difficult to distinguish their main doctrines from one another"—The Cultural Problem. Oxford Pamphlets. Article by Sir Abdul Qudir, p. 23.

বিভিন্ন তত্ত্বাবলীর সমাবেশ দৃষ্ট হয়। সুফীগণ সাধারণতঃ অদ্বৈত বৈদান্তিকের ন্যায় দর্শনের দিক হইতে ঈশ্বরের একত্ব এবং জীবেশ্বরের অভিন্নত্ব; তৎসত্ত্বেও বৈষ্ণব বৈদান্তিকের ন্যায় ধর্ম্মের দিক হইতে জীবেশ্বরের ভিন্নত্ব ও উপাসক-উপাস্য সম্বন্ধ; এবং তৎসত্ত্বেও পুনরায়, বৈষ্ণব মরমিয়াবাদীর ন্যায় অতীন্দ্রিয় অনুভূতির দিক হইতে জীবেশ্বরের ভাবারূঢ় সমাধি অবস্থায় একত্ব স্বীকার করিয়াছেন (পৃঃ ১৫৪)। কোনও কোনও সুফী সম্প্রদায় বৌদ্ধক্ষণবাদও প্রপঞ্চনা করিয়াছেন (পৃঃ ৭২)। যোগপ্রপঞ্চিত প্রাণায়াম, আসন, ধ্যান প্রভৃতিও সুফীগণ সাধারণভাবে গ্রহণ করেন, অবশ্য প্রক্রিয়া বিশেষের পদ্ধতি সম্বন্ধে বৈশিষ্ট্যেরও অভাব নাই।

পৃথিবীর কোনও দার্শনিক মতবাদই সম্পূর্ণ দোষত্রুটী শূন্য নহে। বিশেষ-ভাবে, দর্শনের সহিত ধর্ম্মের, ধর্ম্মের সহিত মরমিয়া অনুভূতির সামঞ্জস্য স্থাপন কঠিন কার্য্য, সন্দেহ নাই। সুফী মতবাদেও স্থলে স্থলে অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়, এবং সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা উপরে করা হইয়াছে। কিন্তু তত্ত্বের দিক্ হইতে ঈদৃশ অসামঞ্জস্য ও অস্পষ্টতা বিদ্যমান থাকিলেও, সুফী সাধকগণের মর্ম্মোত্থিত বাণী গভীরভাবে আমাদের হৃদয় স্পর্শ ও সঞ্জীবিত করে। দর্শনের দিক্ হইতে ঈশ্বরের একত্ব, জগতের ঈশ্বরময়ত্ব ও প্রতি মানবের ঈশ্বরস্বরূপত্ব; ধর্ম্মের দিক্ হইতে ঈশ্বর ও মানবের সুমধুর প্রেম ও প্রীতির বন্ধন; নীতির দিক্ হইতে অর্থশূন্য বাহ্যাড়ম্বর ও আচারানুষ্ঠান অপেক্ষা আন্তর পবিত্রতার উপরই গুরুত্ব আরোপ, উদারতা, পরমতসহিষ্ণুতা অহিংসা ও বিশ্বপ্রেমই সুফী মতবাদের মর্ম্মের কথা। প্রথমতঃ, দার্শনিক মতবাদের মধ্যে একতত্ত্ববাদই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহা এরূপ স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে, এই সম্বন্ধে বাগ্‌বিতণ্ডা বা ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, ধর্ম্মের দিক্ হইতেও, ঈশ্বর ও মানবের ঘনিষ্ঠ প্রীতির সম্পর্কই ধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ সোপান। ঈশ্বরের অনন্ত, অচিন্ত্য শক্তি ও অপার মহিমা স্বতঃই ভক্তের প্রাণে ভয়, শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সৃষ্টি করে। কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্ম ভয়জ নহে, প্রেমজ। ভয় হইতে শ্রদ্ধায়,

শ্রদ্ধা হইতে প্রীতির স্তরে উন্নীত হওয়াই ধর্ম্মজীবনের মূল কথা। ভক্ত যতই সাধনমার্গে অগ্রসর হইতে থাকেন, ততই তিনি ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হন, এবং তাঁহার মনে ভয়ের স্থলে প্রেম, ও দাস্যের স্থলে সখ্যের উদয় হয়। কেবল প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধমূলক ভয়জ ধর্ম্ম ধর্ম্মের নিকৃষ্ট অবস্থা মাত্র। সূফীগণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট সখ্যমূলক প্রেমজ ধর্ম্মের কথাই সগৌরবে প্রচার করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ, নীতির দিক হইতেও, পবিত্রতা, উদারতা, অহিংসা প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। সুতরাং দর্শন, ধর্ম্ম ও নীতি সকল দিক হইতেই সূফী মতবাদের অবদান অল্প নহে। বস্তুতঃ, সূফী সাধকগণ দর্শন, ধর্ম ও নীতির চরম শীর্ষে আরোহণ করিয়াছিলেন। এই তিন দিক হইতেই সূফী মতের সহিত ভারতীয় মতের পূর্ণ সাদৃশ্য বিদ্যমান, এবং সূফী ভক্তগণের বাণী ভারতীয় ঋষিগণেরই সাম্য ও মৈত্রীর বাণী।

গ্রন্থে ব্যবহৃত দার্শনিক নাম ও শব্দের পরিভাষা

আকার কারণ—Formal Cause.

অতীন্দ্রিয়বাদ—Mysticism.

আত্মতান্ত্রিক—Subjective.

আদর্শ—Pattern.

আদিরূপ—Prototype

অনুভব—Feeling.

আন্তর অথবা আন্তরিক—Internal.

ঈশ, ঈশ্বর, দেবতা—God, The Divinity.

ঈশ্বরবহির্ভূতত্ত্ববাদ বা ঈশ্বরব্যতিরিক্তত্ত্ববাদ—Transcendentalism or Deism.

শ্বরবাদঈ—Theism.

ঈশ্বরাধিকত্ববাদ বা ঈশ্বরাতিরিক্তত্ববাদ—Panentheism.

ঈশ্বরেচ্ছাবাদ—Determinism.

উপাদান কারণ—Material cause.

উভয় সঙ্কট—Dilemma

একতত্ত্ববাদ—Monism.

একত্ব—Unity.

একেশ্বরবাদ—Monotheism.

ঐশ্বরিক—Divine.

কারণ—Cause.

কার্য্য—Effect.

কেবল, নিরপেক্ষ—Absolute.

ক্রম—Serial order.

ক্রমবিবর্ত্তন—Evolution.

গতিবাদ—Dynamic Conception of God.

গতিশীল—Dynamic

গুণ—Quality.

ঘটনশীলতা—Becoming.

জগদতিরিক্ততা অথবা জগদ্‌বহির্ভূততা—Transcendence.

জগল্লীনতা—Immanence.

জনশ্রুতি—Tradition.

তত্ত্ব—Reality.

তত্ত্ব—Category or Principle.

তত্ত্ববিদ্যা—Ontology.

তাত্ত্বিক—Theoretical.

দেশ—Space

দ্রব্য—Substance.

ধর্ম্মতত্ত্ব—Theology

নঞর্থক বা অভাববোধক—Negative

নিষ্ক্রিয়াবাদ—Quietism
নীতিশাস্ত্র—Ethics
ন্যায়শাস্ত্র—Logic
পরমসত্তা, কেবলাত্মা, পরমাত্মা, ব্রহ্ম—The Absolute
পরমোৎকর্ষ—Perfection
পরাবিজ্ঞানবাদ—Objective Idealism
পূর্ণমানব—Perfect Man
প্রজ্ঞা—Intuition
প্রজ্ঞাবাদ—Intellectual Mysticism
ভাব, আবেগ—Emotion
ভূত—Element
মরমিয়াবাদ—Emotional Mysticism
রূপ অথবা দিক্—Aspect
লক্ষণ বা সংজ্ঞা—Definition
বস্তুতান্ত্রিক—Objective
বহুতত্ত্ববাদ—Pluralism
বাহ্যিক—External
বিজ্ঞান, চিন্তা, ভাবনা—Idea, Thought
বিজ্ঞানবাদ—Idealism
বিরোধসামঞ্জস্যিক ক্রমবিবর্ত্তনবাদ—Dialectical Evolution
বিশেষ—Particular
বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্ব—Cosmology
বিশ্বাত্মবাদ—Pantheism
ব্যক্তিবিজ্ঞানবাদ—Subjective Idealism
ব্যবহারিক—Practical
সংকল্প—Will
সংবেদন —Sensation
সত্তা—Being
সদর্থক বা ভাববোধক—Positive
সনাতনপন্থী ইস্‌লামধর্ম্মী—Orthodox Islam
সন্ন্যাসবাদ—Asceticism
সাপেক্ষ, আপেক্ষিক অথবা সম্বন্ধবোধক—Relative
সামান্য—Universal
স্থিতিবাদ—Static Conception of God
স্থিতিশীল – Static
স্বগতভেদবান্ সত্তা অথবা সাংশসত্তা—Concrete Unity
স্বগতভেদরহিত সত্তা, বা নিরংশসত্তা—Abstract Unity
স্বতঃ সংঘটিত—Involuntary
স্বরূপ—Essence, Nature
স্বাধীনেচ্ছাবাদ—Free Will
স্বেচ্ছাকৃত—Voluntary

Some Other Works of the Same Author

1. TRANSLATION OF THE VEDĀNTA-PĀRIJATA-SAURABHA OF NIMBĀRKA AND THE VEDĀNTA-KAUSTUBHA OF ŚRĪNIVĀSA—Published by the Royal Asiatic Society of Bengal in two Volumes 1940—41. Price: Rs. 12-8-0

2. THE DOCTRINES OF NIMBĀRKA AND HIS FOLLOWERS.—Published by the Royal Asiatic Society of Bengal. 1943. Price: Rs. 5

3. বেদান্ত-দর্শন—Published by the Vsśva-Bhāratī, 1944. Price: As. 8.

4. নিম্বার্ক-দর্শন—Published by the Prācyavāṇi-Mandira 1944. Price: Rs. 1-8 0

5. SŪFĪSM AND VEDĀNTA.—In the Press.

6. FNGLISH TRANSLATION OF THE BHĀSYA OF BHĀṢKARA ON THE BRAHMA-SŪTRAS.—In the Press.